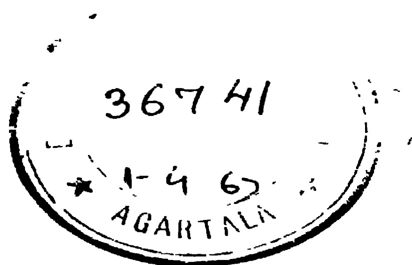
বল পড়ে ব্যাট নড়ে

শঙ্করীপ্রসাদ বসু



করুণা প্রকাশনী
১১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
মহালয়া ১১ই আশ্বিন, ১৩৬৭



প্রকাশক
শ্রীবামাচরণ মুখোপাধ্যায়
১১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদশিল্পী
শ্রীগণেশ বসু

মুদ্রাকর
শ্রীরতিকান্ত ঘোষ
দি অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৭।১, বিন্দু পালিত লেন,
কলিকাতা-৬

এই লেখকের ক্রিকেট বই—
ইডেনে শীতের দুপুর
রমণীয় ক্রিকেট (২য় সংস্করণ)

পাঁচ টাকা পঞ্চাশ ন. প.

উৎসর্গ

শ্রীসন্তোষকুমার বসু
শ্রীমতী মায়া বসু

অর্থাৎ

মধুদা ও মায়া বৌদিকে

ভূমিকা

বল পড়ে ব্যাট নড়ে। ক্রিকেটের এই বর্ণ পরিচয়ের জন্য বর্ণ
অনেকগুলি চরিত্রকে হাজির করেছি। তাঁদের মধ্যে আছেন সুমঃ
'বুড়ো শয়তান' ডব্লিউ জি গ্রেস, অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটের 'নটি ব
সিড বার্ণস, ক্রিকেটের শ্যামল রাজকুমার ফ্রাঙ্কি ওরেল, ব্যাট-হা
চেঙ্গিজ্ খাঁ এভার্টন উইকস, আরব্য উপন্যাসের বাধ্য দানব ক্লাই
ওয়ালকট। বিশ্ব-ক্রিকেটের নতুন ব্যক্তিত্ব টেড ডেক্সটার, কিং
ভারতীয় ক্রিকেটের বিদায়ী ব্যক্তিত্ব পলি উমরিগর—এঁদেরও পাও
যাবে,—পাওয়া যাবেই ক্রিকেটের অপরিহার্য পুরুষ ডন ব্রাডম্যানকে
তাছাড়া অনেকখানি অংশ জুড়ে বর্ণনা করবার চেষ্টা করেছি এদেশী
ক্রিকেটের বর্ণোচ্ছ্বাস ও বর্ণনাশের সুখ-দুঃখের কাহিনী—ইংলণ্ডের
বিরুদ্ধে রাবার লাভের পরেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কাছে সাবাড় হার।

সাহায্য করেছেন অনেকে, বিশেষত দেশী বিদেশী লেখকেরা
ক্রিকেট-বিষয়ে সুন্দর সব গ্রন্থ রচনা করে। তাছাড়া বন্ধু 'শঙ্কর'
তাঁর দাদাকে দেখেছেন সর্বসময়, এবং নানা সময়ে উৎসাহ দিয়েছেন
সাহিত্যিক শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ, শ্রীরাখাল ভট্টাচার্য, শ্রীকৃষ্ণদাস ঘোষ,
শ্রীমুকুল দত্ত প্রমুখ ক্রীড়ারসিকেরা। প্রয়োজনীয় গ্রন্থ সংগ্রহ করে
দিয়েছেন শ্রীগুণেন্দ্রনাথ মিত্র ও শ্রীসুনীলবিহারী ঘোষ। শ্রীঅজয়
বসু দু'খানি ছবি দিয়েছেন। শ্রীবিমল ঘোষ ও শ্রীরণেন্দ্রনাথ বসু
প্রুফ দেখায় সাহায্য করেছেন। এঁদের সকলকে প্রীতি ও ধন্যবাদ।

গ্রন্থকার

পর্বতের মধ্যে হিমালয়

[ডব্লিউ. জি. গ্রেস]

সেই বৃদ্ধ লোকটির বিষয়ে লেখা সুরু করতেই কয়েকটি দৃশ্য পর পর ভেসে উঠল চোখের উপর।

ইংলণ্ডের কবি, পণ্ডিত, শিক্ষক, পাদরী, রাজনীতিবিদ সকলে ব্যস্ত এবং চিন্তিত, কি লেখা যায়? কবিরা কবিতা লিখে পাঠালেন, পণ্ডিতেরা গ্রীক ল্যাটিনের শোককাব্য উদ্ধৃত করলেন, রাজনীতিবিদ ধারালো উক্তি সংগ্রহ করলেন, এবং শিক্ষকেরা চয়ন করলেন মহান বচনরাজি। কিন্তু কিছুতে কিছু হল না। সবই মনে হল 'দুঃখজনকভাবে অপর্যাপ্ত।' ঠিক কথাটি আবিষ্কার করলেন অবশেষে স্যার স্টানলি জ্যাকসন।

লর্ডসে ডাঃ গ্রেসের নামে তোরণ হবে। তাতে লেখা হবে কি?

স্যার স্টানলির উপলব্ধ মহান সরল বাক্যটি লেখা আছে তোরণের উপর:

To the memory of
WILLIAM GILBERT GRACE
THE GREAT CRICKETER.

এ হল ১৯৪৮ সালের কথা। পেছিয়ে যেতে হবে কয়েক বছর।

১৯১৫ সালের ২৩শে অক্টোবর। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঢেকে রেখেছে পৃথিবীর আলো। অন্ধকারময় ইংলণ্ডের পথে হাঁটছিলেন গার্ডিনার। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়লেন যুদ্ধের সংবাদ পড়বার জন্য। ধূমাচ্ছন্ন তেলের আলোর সামনে যুদ্ধের সদ্য সংবাদ টাঙানো আছে। গার্ডিনার নীচু হয়ে পড়বার চেষ্টা করছেন, এমন সময় পিছন থেকে কে বলল—

ডব্লিউ জি মারা গেছেন। অচিরে যেন দৃশ্যপট পালটে গেল। ভয়াবহ যুদ্ধ, অন্ধকার পারিপার্শ্বিক সব কিছু বিস্মৃত হয়ে গার্ডিনার ফিরে গেলেন জীবনোচ্ছল পুরাতন পৃথিবীতে, যেখানে তিনি খোলা মনে সূর্যোদয়কে অভ্যর্থনা করতেন, সূর্যাস্তে নির্ভয়ে ঘরে ফিরতেন, যে আনন্দভুবনে শ্মশ্রুল একটি বিরাট মানুষ তাঁর প্রতিদিনের প্রাণের রাজা ছিলেন।

যিনি 'সারাজীবন নূতন বলের সম্মুখীন' হয়ে জিতে গেছেন, তিনি একবার হেরে গেলেন—একজন 'চরম বোলারের' হাতে—যার নাম মৃত্যু। শবানুগামীদের একজনের মনে পড়ল, টেনিসনের কবিতা—মর্টে ডি আর্থার। বিষাদাচ্ছন্ন মনে তিনি যুদ্ধের বীভৎসতার কথা ভাবতে লাগলেন। মনে হল, শান্তির, সুখের, বিশ্রামের পুরাতন দিনগুলি বুঝি আর ফিরবে না। কবিতাটি তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করে রাখল, রাজা আর্থারের সুমহান মূর্তি, টেনিসনের ছায়াময় স্বপ্নের স্মৃতি আবিষ্ট করে রাখল চেতনাকে। আর মনে জাগল অন্য পৃথিবীর অন্য একটি আর্থারের কথা, যিনি খোলা কবরে এখন মাত্র কয়েক গজ দূরে শায়িত আছেন, যিনি কাব্যে নন—বাস্তবে ঐশ্বর্যবান; যিনি শক্তিপূর্ণ, রক্তমাংসময়, জীবন্ত নরপতি ছিলেন ক্রীড়াক্ষেত্ররূপ নিজের বৃহৎ সভাগৃহে।

আমরা আরো কয়েক বছর পিছনে হাঁটব। ১৮৯৫ সালের মে মাস। সমস্ত ইংলণ্ড উত্তেজনায় মথিত। হবে কি—ব্যাপারটা কি হবে? পারবেন কি—পারবেন তো? সলজ্জ কৌতুকের সঙ্গে ইংরেজ কথাশিল্পী এ এ টমসন লিখেছেন, আচ্ছা, কি করে একজন বিদেশীকে বোঝাই বলুন তো যে, যে-দেশের জাতীয় জীবনে সমস্যার অন্ত নেই, সেখানকার অধিবাসীরা জনৈক মধ্যবয়সী দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক উইলো কাঠের তক্তা দিয়ে একটা চামড়ার শক্ত বলকে কতবার পেটালেন, কিভাবে পেটালেন, এমন কি যদি পেটাতে না পারেন তো কেন

পারলেন না, তার হিসেব নিয়ে সত্যই ক্ষেপে থাকতে পারে সঙ্গতভাবে।

ডব্লিউ জি শততম শতরান করবেন কি না এই নিয়ে সমস্ত ইংলণ্ড মাতোয়ারা।

ক্রিকেটের নবব‍ুইয়ের ধাক্কা ডব্লিউ জি-কেও লেগেছিল। বড় বিস্ময়কর! সেঞ্চুরীকে কি তিনি কোনোদিন কেয়ার করেছেন? হাতে যথেষ্ট সময় থাকতেও একবার নিজের ৯৩ রানের মাথায় ইনিংস ডিক্লেয়ার করে দিয়েছিলেন—একমাত্র এই কারণে যে, শূন্য থেকে সেঞ্চুরীর মধ্যে ৯৩ ছাড়া সব কয় সংখ্যার রানই তিনি করেছেন।

সেই ডব্লিউ জি কাঁপতে লাগলেন ৯৮ রান করে। তাঁর বিখ্যাত শত্রু স্যাম উডসেরও হাত থরথর করতে লাগল। যদি কিছু গোলমাল হয়? যদি ভয়াবহ সর্বনাশটি ঘটে! যদি—দু'রান বাকি থাকতে লোকটি আউট হয়ে যায়! ফাস্ট বোলার উডস লেগের দিকে ধীরতম ফুলটস দিলেন।

একটা চীৎকার উঠল। যা বোধ হয় কান পাতলে এখনো শোনা যাবে।

সেঞ্চুরী করেই ডাঃ গ্রেস থামেননি, ২৮৮ রান করে তবে ফিরেছিলেন।

সি এল টাউনসেণ্ড বলেছেন, 'এই একটিমাত্র ক্ষেত্রেই সেঞ্চুরীর আগে বৃদ্ধ লোকটিকে বিভ্রান্ত হতে দেখেছি। হতভাগ্য স্যাম উড়স বল করতেই পারছিল না, ডব্লিউ জি ব্যাট নিয়ে তথৈবচ।'

আরো কয়েক বছর পিছনে হাঁটব?—না। মহাদেশের মধ্যে পৌঁছে গেছি। ইংরেজের খেলার মহাদেশ—ডব্লিউ জি গ্রেস। পাঠকগণ আমাকে ক্ষমা করবেন যদি ক্লান্ত হয়ে পড়ি, যদি ভূখণ্ডের ভূগোলটুকুও না জানাতে পারি। ইতিহাস? সে তো অসম্ভব। জন আর্লট লিখেছেন, রান করেছেন বলে ইংরেজরা ডাক্তার গ্রেসকে

ভালবাসেনি, ভালবেসেছে যে-মানুষ ছিলেন তার জন্য। একজন বিদেশী হয়ে ইংরেজ-চরিত্র সম্বন্ধে শুধু পুঁথিগত জ্ঞান সম্বল করে তাদের একজন 'প্রতীক' মানুষ সম্বন্ধে ঠিক কথা লিখতে পারব, এ অভিমান আমার নেই।

ডাঃ জনসন সম্বন্ধে একজন লিখেছেন, বিলেতের খবরের কাগজে শেক্সপীয়ারের চেয়ে বেশীবার উল্লিখিত হয় ডাঃ জনসনের নাম। শেক্সপীয়ার বিস্ময়ের স্বর্গবাসী, ডাঃ জনসন গৃহপথবর্তী। ডাঃ গ্রেসের জীবনীকারও সেই কথা বলেছেন, ডাঃ গ্রেস সাদা মাঠা ইংরেজের প্রাণের রাজা। তিনি খেলার মধ্য দিয়ে ইংরেজ স্বভাবকেই প্রকাশ করেছেন: যে ইংরেজ বেশী সূক্ষ্ম নয়, কিন্তু চতুর, দয়ালু ও রসিক, অথচ তলে তলে কঠিন ও একগুঁয়ে। ডাঃ গ্রেস খেলার জগতের সেরা ইংরেজ।

বাঙালা পাঠকরূপে এইখানে আমি বিস্মিত হচ্ছি। আমরা শুনেছি 'ক্রিকেট একটা মর্যাদাপূর্ণ আচরণ'। সেই সুপরিচ্ছন্ন সুকঠিন ভব্যতা ইংরেজ-স্বভাবের বিশিষ্ট রূপ। ম'লেও সে স্বভাব যায় না ইংরেজের। অথচ ডব্লিউ জি কি ঠিক তাই? তিনি 'গ্রেটম্যান' কিন্তু 'ওল্ড ডেভিল'ও তো বটে। জিতবার জন্য সকলের মতই তাঁর আগ্রহ ও পরিশ্রম ছিল কিন্তু অন্য সকলের অতিরিক্ত ছিল দু'চারটি চালাকি, যা কোনোমতে মহৎ নয়। 'বুড়ো কচ্ছপটি' সেই চালাকির জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন, তার মহত্ত্বের সঙ্গেই। এই লোক ইংরেজী ক্রিকেটের ব্রহ্মাবিষ্ণু! তাহলে সাদা ফ্লানেলের সুশুভ্র আদিখ্যেতা রইল কোথায়?

সুপরিচিত কিংবদন্তীর কয়েকটিকে স্মরণ করছি।

ডাঃ গ্রেস বল করছেন, এক কলেজের ছোকরা ব্যাটসম্যান। বল করতে করতে হঠাৎ থেমে ডাঃ গ্রেস বললেন, দেখ দেখ আকাশে কি রকম বকের পাল। ছোকরা উপরে তাকাল, সূর্যে ধাঁধিয়ে গেল চোখ।

পরের বলে বোল্ড।

ডাঃ গ্রেস ব্যাট করছেন। বল তাঁর বেল ফেলে দিয়ে গেল। নির্বিকারভাবে বেলটিকে তুলে যথাস্থানে রেখে আম্পায়ারের দিকে ফিরে বললেন,—খুব হাওয়া—নয় ?

একটা গ্রাম্য খেলা। আম্পায়ার ডাঃ গ্রেসকে আউট দিলেন। ডাঃ গ্রেস আম্পায়ারকে ধমকে বললেন, পাঁচখানা গ্রাম থেকে দশ মাইল পথ ভেঙে লোক এসেছে 'আমার' খেলা দেখতে, তোমার মেলা 'উজবুকি' দেখতে নয়।

চমৎকার আরো একটি ঘটনা। পারিবারিক ম্যাচ, রবিনসন-পরিবার ও গ্রেস-পরিবারের মধ্যে। রবিনসন-পরিবার আত্মীয় ছাড়া কাউকে খেলায় না. গ্রেসদের অতটা বাঁধাবাঁধি নেই, বাইরেরও দু'একজন খেলে। এক বছরের খেলা ; বড় ভাই ডাঃ হেনরি গ্রেসের বয়স হয়েছে, শরীর আগেকার মত সমর্থ নয়, ফিল্ডিং করতে পারেন না ভালোভাবে। ব্যাটিং করার পরেই জরুরী টেলিগ্রাম পেয়ে ডাঃ হেনরী রোগী দেখতে চলে গেলেন এবং পাড়ার সবচেয়ে চটপটে ছোকরা তাঁর বদলে ফিল্ডিং করতে লাগল। ফিল্ডিং করলও অদ্ভুত, কত যে রান বাঁচাল এবং ক্যাচ ধরল ! ডাঃ হেনরি গ্রেস সময়মত ফিরে এলেন তাঁর কাল্পনিক রোগীর কাল্পনিক শয্যাপার্শ্ব থেকে, এবং পরমানন্দে দেখতে লাগলেন নিজের পারিবারিক দলের আর একটি জয়, যার পিছনে তাঁর বদলী ছোকরাটির ফিল্ডিং-এর দাম কম নয়। এটি গ্রেস-পরিবারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যৌথ চালাকি। সকলে নিতান্ত নিরীহ, তার মধ্যে নিরীহতম ডব্লিউ জি।

এমন অজস্র ঘটনা গ্রেস-পুরাণ থেকে সঞ্চয় করে দেওয়া যায়— গ্রেসের নাতি-ক্রিকেটের দৃষ্টান্ত। এই ব্যক্তিই ক্রিকেটের প্রতীক !

তাহলে একটা পার্থক্য আছে ক্রিকেট-নীতি সম্বন্ধে আধুনিক ধারণা ও পূর্ব ধারণার মধ্যে। সাধারণ ইংরেজ ক্রিকেটের ক্ষেত্রে ডাঃ গ্রেসকেই পূজো করেছে। সে পুরোনো প্রাণেরই পক্ষপাতী।

এইখানে আমরা মানুষ ডাঃ গ্রেসের কাছাকাছি এসে পৌঁছচ্ছি। ক্রিকেট ডাঃ গ্রেসের কাছে ক্রীড়ামাত্র ছিল না, ছিল জীবনের অঙ্গ। ক্রিকেট এবং জীবনবোধ—একই কথা। এবং জীবন যেহেতু সাজানো ড্রইংরুম নয়, তাতে কৌতুক আছে, কৌশল আছে, ভদ্রতা এবং পরিমিত মাত্রায় ইতরতা—সবই আছে,—ডাঃ গ্রেসের ক্রিকেটেও তাই ছিল। আনন্দোচ্ছল দুর্বৃত্ততার গুণে জিতে গিয়েছিলেন ডাঃ গ্রেস। তাঁর চরিত্রও ঐ রকমই ছিল। সাধারণ ইংরেজের চরিত্রও তাই। সহানুভূতি, সহৃদয়তা, সঙ্কীর্ণতা ও রক্ষণশীলতার বিচিত্র সমন্বয়। অন্য বিখ্যাত খেলোয়াড়রাও অনেকে খেলার মধ্যে নিজেকে ব্যক্ত করেছেন, কিন্তু তাঁদের সেই ব্যক্তিরূপ জাতিরূপের একাংশকে মাত্র প্রকাশ করেছে। অপরপক্ষে ডাঃ গ্রেস ছিলেন সকল সাধারণ ইরেজের প্রতিনিধি। সুতরাং সাধারণের স্বভাব অনুযায়ী তিনি খেলা থেকে কৌতুকময় দুষ্টামি বা ভদ্র স্বার্থপরতা বাদ দিতে পারেন নি।

ব্যাডম্যানের ছিল জয়লিপ্সা, যশোলিপ্সা, কম্পটনের আনন্দসাধনা, অমরনাথের প্রমত্ত কামনা, রণজির সৌন্দর্যস্পৃহা—এঁদের জীবনের একটা দিককে প্রকাশ করেছে ক্রিকেট—ক্রিকেট সর্বাত্মকভাবে উদ্ঘাটিত করেছে ডাঃ ডব্লিউ জি গ্রেসকে।

বিনিময়ে কি পেয়েছেন ?

বলা হয়েছে, ব্রিস্টল থেকে ম্যাঞ্চেস্টারের মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে কুইন ভিক্টোরিয়া কিংবা মিঃ গ্ল্যাডস্টোন ছাড়া যে চেহারাটি জনসাধারণ একনজরে চিনে নিত, তিনি ডাঃ গ্রেস। বলা হয়েছে শেক্সপীয়ার ও বার্নাড শ-এর মধ্যবর্তী সর্বাধিক বিখ্যাত দাড়ি তাঁরই। সে দাড়ি ছিল চল্লিশ বছরের উপর 'ইংলণ্ডের ল্যাণ্ডস্কেপের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ'। স্টেশনে দাঁড়িয়ে বন্ধুর সঙ্গে কথা বললে ইঞ্জিন ড্রাইভার ট্রেন থামিয়ে তাঁর জন্য

অপেক্ষা করত, রেলের কুলীরা মাল নামিয়ে ছুটে আসত করমর্দন করবার জন্য এবং ঘোড়ার গাড়ীর কোচম্যান যদি তাঁকে গাড়ীতে তুলতে না চেয়ে থাকে, সে তাঁর সতেরো স্টোন ওজনের জন্য, কিন্তু একবার তোলার পর তাঁর কাছ থেকে ভাড়া নেওয়ার মত পাতকে পড়তে চায়নি। এবং—

'কেমন আছেন ডাঃ গ্রেস, ভালো তো?'—রেলের কুলি একজন দাড়িওয়ালা লম্বা লোকের সঙ্গে করমর্দন করল সাগ্রহে।

ডাঃ গ্রেস নন, লোকটি সি বি ফ্রাইয়ের হাউস মাস্টার।

"It was a proud moment in a modest life."

ক্রিকেটার ডাঃ গ্রেসকে ধারণা করতে হলে তাই গোটা জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে দেখতে হবে। তা যদি করতে চাই, দেখব, তাঁর গোটা জীবনটাই ক্রিকেট। জন্মেছিলেন ১৮ই জুলাই ১৮৪৮ সালে একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে। পিতা হেনরি মিলস গ্রেস ছিলেন ডাক্তার। তাঁর পাঁচ ছেলের চারজন হল ডাক্তার, অন্য একজনও ডাক্তার হোত, হয়নি শেষ পর্যন্ত, ডিগ্রি পাবার মুখে মৃত্যু তা ছিনিয়ে নিয়েছিল বলে।

এক-কথায় বলা যায়, ডাক্তারী এবং 'ক্রিকেটারি'র আবহাওয়ায় ডব্লিউ জি পালিত।

কিন্তু আসল হচ্ছে মা। এমন একটি মা না থাকলে গিলবার্ট গ্রেস ডাক্তার হতে পারতেন, ক্রিকেটারও হতে পারতেন, কিন্তু যা হয়েছেন তা কি হতে পারতেন?

ডাক্তার হেনরি মিলস গ্রেস বিয়ে করেছিলেন মার্থা পিককে।

তিনি সৌভাগ্যবান, অমন একটি স্ত্রী পেয়েছিলেন। মার্থা পিকক দৃঢ় চরিত্রের সম্ভ্রান্ত মহিলা। গর্ভে ধরেছিলেন ইংলণ্ডের ক্রিকেট-ভবিষ্যৎকে।

নিজে ক্রিকেট বুঝতেন অদ্ভুত, ছেলেদের প্রতিভার যাতে বিকাশ হয়, সেদিকে খর দৃষ্টি ছিল, বাইরে ভঙ্গি ছিল কঠিন ও নিরপেক্ষ।

প্রয়োজনীয় শোধন এবং শাসনের মধ্য দিয়ে তাঁর স্নেহ প্রকাশ পেত। ইংলণ্ড একাদশের সেক্রেটারীর কাছে লেখা তাঁর চিঠি বিখ্যাত হয়ে আছে। ঐ চিঠিতে ইংলণ্ড দলে নিজের অন্যতম সন্তান ই এম গ্রেসের স্থান পাওয়ার পক্ষে সুপারিশ করেছিলেন। সেই সঙ্গে যোগ করে দিয়েছিলেন, তাঁর একটি ছোট ছেলে আছে, যে এখনো ম্যাচ খেলবার অবস্থায় আসেনি, কিন্তু সে স্বরূপত তার মেজ ভায়ের চেয়ে অনেক বড় খেলোয়াড়—তার ডিফেন্স এত নিখুঁত। বলা বাহুল্য সে ছেলে গিলবার্ট গ্রেস।

গৃহে যিনি এমন মাতৃরূপে সংস্থিতা—তাঁর ছেলেরা যে তাঁকে নিরন্তর নমস্কার করবে আশ্চর্য কি! মায়ের উপর ছেলেদের যেমন ভালবাসা, তেমনি বিশ্বাস। মায়ের পরামর্শ সব সময় শিরোধার্য। ছেলেরা ভালো স্কোর করলে মার্থা গ্রেস এ-ধরনের টেলিগ্রাম পেতেনই—

ডাবলিন থেকে ডব্লিউ জি: ডাউন এণ্ড মিসেস গ্রেসের কাছে: আমি নিজে ১৪০ নট আউট। ফ্রেড—১০৩। চার উইকেটে ২৯০।

শ্রীমতী গ্রেস একটা গোটা ক্রিকেট-পরিবারকে পেটে ধরেছিলেন। তাঁর পাঁচ ছেলের চতুর্থ ছেলে হলেন ডব্লিউ জি। বড় ছেলে হেনরী খেলতেন খুব উৎসাহের সঙ্গে এবং ছোট ছেলে ফ্রেডের থেকে প্রাণবন্ত মানুষ কম হয়। কিন্তু ক্রিকেট-প্রতিভায় বাড়ীতে দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন—দ্বিতীয় পুত্র ই এম গ্রেস। অফুরন্ত শক্তির উৎস। বড় ঝাঁঝালো একটি মানুষ। বিয়ে করেছিলেন চারবার, তার মধ্যে একবার মৃত কনিষ্ঠ ভ্রাতার বাগ্‌দত্তাকে। কিছুতে সন্তুষ্ট থাকতে পারতেন না, সব সময় ছটফট করছেনই। এমন সব ভায়েরা মিললে যে অবিরত হুটোপাটি হৈ-চৈ হবে, তা বলাই বাহুল্য। এদের যেমন বিবাদ তেমন ভাব। যখন ভায়েরা একসঙ্গে খেলছে, তখন বিপক্ষ ব্যাটসম্যানের প্রাণান্ত। লংফিল্ডে হিংস্র ভাবে ঘোরাফেরা করছে ফ্রেড গ্রেস,

পয়েন্টে গুঁড়ি মেরে ওৎ পেতে বসে আছে ই এম গ্রেস এবং বল দেওয়ার পরেই নিজের বোলিং-এর বিরুদ্ধে মার ধরবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ছেন স্বয়ং ডব্লিউ জি—এ খেলায় ব্যাটসম্যানের জীবন পদ্মপত্রে নীরবিন্দু।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট ম্যাচে চার ভাই এক সঙ্গে খেলেছিলেন। ক্রিকেটের একটি রেকর্ড।

কিন্তু যা রেকর্ড বুকে লেখা নেই, সেই প্রাণপূর্ণ কাহিনীগুলো—

একেবারে গোড়ার একটা ঘটনা ধরা যাক। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ডব্লিউ জি যার জন্য আফশোষ করেছেন।

১৮৫৮ সাল। ডব্লিউ জি-র বয়স দশ। রেডল্যাণ্ড ও ওয়েস্ট গ্লস্টর্সশায়ারের মধ্যে খেলা। খেলা আরম্ভের আগে দেখা গেল একটা মাতাল মাঠের মাঝখানে শুয়ে। যখন মিষ্টি অনুরোধে কিছু হল না তখন পরিবারের ডানপিটে ছেলে অ্যালফ্রেডের ডাক পড়ল। সে সুনিশ্চিত পদ্ধতিতে দু' মিনিটের মধ্যে মাঠ পরিষ্কার করে দিলে। খেলা জমে উঠেছে। স্থানীয় দল, গ্রেসরা যাদের পক্ষে খেলছেন, ১০১ রান করলেই জিততে পারবে এমন অবস্থায় ৫ উইকেটে তারা ৮৪ রান করেছে—মাঠে হঠাৎ তুমুল হট্টগোল। বিতাড়িত মাতাল মাঠে তার শয্যাস্বত্ব প্রতিষ্ঠায় দলবলকে নিয়ে এসেছে। অ্যালফ্রেড দ্বিতীয়বার কর্তব্যপালন করল—আর এক ঘুষিতে মাতালকে শুইয়ে দিলে। অতএব মারামারি। তুমুল কাণ্ড চলল বহুক্ষণ। তা থামল যখন গ্রেসদের বুড়ো কর্তা ম্যাজিস্ট্রেটকে ডেকে আনলেন এবং ম্যাজিস্ট্রেট চেঁচিয়ে রায়ট অ্যাক্টের বিধিবিধান পড়তে লাগলেন। মাতালপক্ষ অন্তর্ধান করল বটে, কিন্তু খেলাটিও পরিত্যক্ত হল। সেই আপসোস। ডব্লিউ জি ভুলতে পারেনি, তাঁদের জিতবার পক্ষে বাকি ছিল মাত্র সতেরো রান।

অন্যদিকে ই এম-এর পক্ষে ভোলা সম্ভব হয়নি একটি ঘটনা।

অদম্য ই এম'কে মিইয়ে দেবার পক্ষে চুপি চুপি 'বিটন' এই কথাটি উচ্চারণ করাই যথেষ্ট ছিল।

পাশের গ্রাম বিটনের সঙ্গে খেলা। হেনরি এবং ডব্লিউ জি ক্রিকেটের সরঞ্জাম চাপিয়ে দিয়ে ছোট গাড়িটায় উঠতে যাচ্ছেন, হেলতে দুলতে ই এম এসে হাজির। নিজের ব্যাগটাও চাপিয়ে দিলেন গাড়ির উপর।

—না না, ওসব চলবে না, তিন জনকে গাড়ীতে ধরবে না, —ডব্লিউ জি বাধা দিয়ে বললেন।

—কি যে বল, এ সপ্তাহে চাকা একদম ফাটেনি। একটু ঝুঁকি না নিলে চলবে কেন ?—ই এম নাছোড়বান্দা।

যাবে কোথায় শুনি ?

তোমরা যেখানে নামবে, সেখানে নামিয়ে দিলেই চলবে।

মাঠে পৌঁছে মাথা চাপড়াতে লাগলেন হেনরি এবং ডব্লিউ জি। অ্যাঁ—বিটনের পক্ষে খেলবে ই এম! তাকেই খাতির করে গাড়িতে এনেছেন! যদি জানতাম—দাঁতে দাঁত চেপে দুজনে বললেন—তাহলে সারা রাস্তা তোমাকে ব্যাগ বইয়ে আর হাঁটিয়ে মারতাম।

তীব্র রেশারেশির মধ্যে খেলা সুরু হল। শেষকালে বিটনের অবস্থা খুবই ভালো দাঁড়ালো। তারা এগারো জন মিলে মাত্র দশ রান করতে পারলেই জিততে পারবে। মাঠের বাইরে থেকে একজন দর্শক চেঁচিয়ে উঠল—বাছারা জোরসে একটা হাঁকড়াও দেখি। সারাক্ষণ একটা ভালো মারও দেখিনি।

দেখবে দেখবে! পরমানন্দে ব্যাট দোলাতে দোলাতে নামলেন ই এম।

সোজা ...লা বল দিলেন হেনরি। ছক্কা মারের ব্যাট চালালেন ই এম। ব্যাটকে ফাঁকি দিয়ে বল বেল তুলে নিয়ে চলে গেল। মুখ লাল করে বিজবিজ করে বকতে বকতে টেন্টে ফিরে গেলেন ই এম।

বিটনের যে আট জন খেলোয়াড় কোট পরে বাড়ী যাবার জন্য

তৈরী হয়েছিল, তাদের কোট খুলে প্যাড পরতে বলা হোল একে একে। কিন্তু হবে কি! প্রথম চারটে উইকেট পড়ল শূন্য রানে। তারপর একজন চোখ বুজে হাঁকড়ে তিন রান করলে। উত্তেজনায় হাত ফস্কে আরো তিনটে বাই রান হোল। সেই শেষ রান। বাকি উইকেটগুলো বিনা রানে খসে পড়ল ডব্লিউ জি-র হাতে। বিধ্বস্ত উপহাসাস্পদ বিটন ৬ রানে সমাপ্ত।

খ্রীস্টীয় উদারতা দেখালেন হেনরি এবং ডব্লিউ জি। ফিরবার সময় একবারের জন্যও ই এমকে নিজেদের ছোট গাড়ীতে ঠাঁই দিতে আপত্তি করেননি, বিন্দুমাত্রও নয়।

ই এম'কে নিভিয়ে দিতে একটি কথাই যথেষ্ট—বিটন।

অথচ ই এম কি চরিত্রের না লোক ছিলেন! কোনদিন কেউ তাঁকে দমাতে পেরেছে? ফাস্ট বোলার স্যাম উডসের প্রচণ্ড বল হাতে লাগতে ব্যাট ফেলে দিয়ে মাঠের উপর যন্ত্রণায় ছোটাছুটি করছেন,—একজন দর্শক তামাসা করে বলল—আর বেশী দেরী নেই, করোনার বসাতে হবে। তখন, সেই অবস্থাতে, অধিনায়কের অনুমতি নিয়ে লোকটিকে ই এম এমন তাড়া করেছিলেন যে, সে পালিয়ে তবে প্রাণ বাঁচায়। কিংবা ধরা যাক, যখন বোলারের সঙ্গে বাজি ধরেছিলেন; আউট করতে পারলে—টাকা দেব। ই এম হাঁকড়াতে সুরু করলেন, কিন্তু দেখলেন একটা উঁচু মার বাউণ্ডারী না পেরিয়ে লঙ অনের হাতের উপর সোজা নেমে আসছে, ই এম চেঁচিয়ে বললেন—আমি ডিক্লেয়ার করছি। বলেই প্যাভেলিয়ানে গিয়ে স্কোরারের কাছে দাবী জানালেন তাঁকে নট আউট লিখতে হবে।

ই এম এবং ডব্লিউ জি থাকলে একটা গণ্ডগোল হবেই।

সারের সঙ্গে গ্লস্টার্সের খেলা। ভাগ্যলক্ষ্মী খুবই চঞ্চলা। শেষকালে অবস্থা দাঁড়াল গ্লস্টার্স ৪৫ মিনিটে ৫২ রান করলে জিতবে। ফ্রেড গ্রেস দুষ্টুমিতে কম যায় না। নিজের দল গ্লস্টার্সের জয়ের

বিরুদ্ধে বাজি ধরল ৫ : ১। ফ্রেডকে শিক্ষা দেবার জন্য ই এম প্যাড পরতে সুরু করলেন। কিন্তু বেজায় চটে উঠে দেখলেন তাঁর সম্পর্কের ভাই গিলবার্ট এবং ডব্লিউ জি প্যাড পরে হাঁটতে সুরু করে দিয়েছে উইকেটের দিকে।

—আহা দেখ দেখ, যাচ্ছে কারা। ঠুকঠাকের শিরোমণি দুটি খেলোয়াড়! রাগে মুখ ভেঙালেন ই এম।

পঁচিশ মিনিটের মধ্যে প্রয়োজনীয় রান সংগৃহীত হল। ই এম-এর সামনে অট্টহাস্যে ফেটে পড়ে ফ্রেড বাজির টাকা দিয়ে দিলে।

বিবাদটি যে সব সময় ই এম-এর সঙ্গেই বাধত তা নয়, বড়ভাই হেনরিও ভালমানুষি দেখাতে প্রস্তুত ছিলেন না।

ডব্লিউ জি ব্যাট করছিলেন, বল করছিলেন হেনরি। ডব্লিউ জি-র ওভার বাউণ্ডারী বেড়ার উপর হেলে পড়ে ফিল্ডার লুফল। আম্পায়ার হাত তুলতে যাচ্ছেন। ডব্লিউ জি তাঁর ঐতিহাসিক নির্ঘোষ তুলে আম্পায়ারের উদ্দেশ্যে চেঁচালেন—কতবার তোমাকে বলেছি অলিভার—! চীৎকারে ভড়কে গেল আম্পায়ার। তখন হতভম্ব আম্পায়ারের মুখের সামনে ঘুষি তুলিয়ে সমান জোরে প্রতিনির্ঘোষ তুলে হেনরি বলেছিলেন - তুমি পুরুষ মানুষ অলিভার—ওকে আউট দাও।

গ্রেট ডব্লিউ জি-কে ফিরে যেতে হয়েছিল।

দেখলাম গ্রেসের পরিবার, পরিবেশ এবং রক্ত। মানুষের জীবনে হেরিডিটি এবং এনভায়রনমেণ্টের সমান মূল্য। এনভায়রনমেণ্টের মধ্যে কেবল মিত্রপক্ষকে ধরলেই চলবে না, শত্রুদেরও ধরতে হবে। গ্রেসের ক্রিকেট-শত্রুদের মধ্য দিয়ে গ্রেসকে চিনব।

প্রথমে ধরা যাক কর্টরাইটের বচন-শেল। সে যুগের বিখ্যাত ফাস্ট-বোলার কর্টরাইট। বিখ্যাততম—দ্রুতগতির হিসাবে।

বিখ্যাততম ব্যাটসম্যান ডাঃ গ্রেস। তাঁর খ্যাতির মতই বি-খ্যাতি আউট-কুণ্ঠায়। কর্টরাইট কয়েকবার আবেদন জানিয়েছেন, গ্রেসও স্বভাবমত অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। শেষে কর্টরাইট এক বলে দুটো স্টাম্প একেবারে উপড়ে দিলেন। গ্রেস চলে যাচ্ছেন, কর্টরাইট হাঁকলেন—সে কি ডাক্তার, যাচ্ছ যে? এখনো তো একটা স্টাম্প দাঁড়িয়ে।

প্রশ্নের উত্তরে কর্টরাইট বললেন, ডাঃ গ্রেস? অদ্বিতীয়, সর্বোত্তম! যে কোনো বলই দেওয়া যাক চূর্ণ করতে দ্বিধা করেন না। আমাদের পরিত্রাণ ছিল না তাঁর হাতে।

সে যুগের আর এক ফাস্ট বোলার টম এমেটের সঙ্গে পথে দেখা হল ডব্লিউ জি-র। গ্রেস ডাক্তারীর ডিপ্লোমা পেয়েছেন, নিয়ে আসছেন।

এমেট। মশাই, ব্যাপারটা চুকে গেছে তো?

গ্রেস। হাঁ টম, আমি ডিপ্লোমা পেয়েছি।

এই কথাবার্তার অল্প পরেই এম সি সি-র সঙ্গে ইয়র্কশায়ারের খেলা। গ্রেস খেলছেন এম সি সি-র হয়ে, এমেট ইয়র্কশায়ারের পক্ষে। গ্রেসের ব্যাট করার সময়ে খুব কাছে দাঁড়িয়ে ফিল্ডিং করছেন এমেট। জোরালো একটা বলে প্রচণ্ড ব্যাট চালালেন গ্রেস। বলটা সোজা গিয়ে লাগল এমেটের তলপেটে। এমেট লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। কিন্তু বলটি তখনো হাতে ধরা।

লেগেছে নাকি?—গ্রেস শুধালেন।

কোনোক্রমে উঠে দাঁড়ালেন এমেট। তারপর ক্ষীণকণ্ঠে বললেন—হাঁ—, তারপরেই বলশুদ্ধ হাতটা উঁচু করে দ্রুতকণ্ঠে,—আমি কিন্তু আমার ডিপ্লোমা পেয়ে গেছি।

ডব্লিউ এল মার্ডক ছিলেন তখনকার দিনে সেরা অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়। কেউ কেউ গ্রেসের সঙ্গে সমস্তরে ফেলতে চেয়েছিল

মার্ডককে। তাতে আলেক ব্যানারম্যান, আর একজন বিশিষ্ট অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়, ঘৃণার সঙ্গে বলেছিলেন,—কি মার্ডক? বেলি (মার্ডক) সারাজীবনে যা শিখেছে, ডব্লিউ জি সেটাই, বা তার থেকে বেশী, কালক্রমে ভুলেছেন।

মার্ডক নিজে বলেছেন,—ডব্লিউ জি সম্বন্ধে আমার ধারণা কি? তাঁর মত আমি দেখিনি, দেখবার আশাও করি না। আমার একটা অনুরোধ রইল। মারা যাবার পরে তাঁর দেহটাকে যেন পুঁতে ফেলা না হয়। ওটাকে চিরদিন রেখে দেওয়া উচিত বৃটিশ মিউজিয়ামে, সর্বযুগের বিরাটতম ক্রিকেটারের দেহ বলে।

টম এমেটের মতই টিচ্ ফ্রিম্যান ডাঃ গ্রেসের আর এক শত্রু। বৃদ্ধ বয়সে এমেট ও ফ্রিম্যান কথা বলছেন মাঠের ধারে বসে।

এমেট। কাণ্ড দেখলে? ঐ আস্তে বলটা হাতে লাগতে অমন ধড়পড় করছে ছোকরাটি?

ফ্রিম্যান। ছ্যা ছ্যা! এরা আবার ইয়ংম্যান! এত যদি প্রাণের মায়া তো ক্রিকেট খেলতে আসে কেন?

এমেট। তা যা বলেছ। হাঃ হাঃ আমরা কী সব গোলা ছাড়তুম ডাক্তারের বিরুদ্ধে মনে আছে? ডাক্তারের কী বরাতই গেছে! পাঁজরে, কাঁধে, মাথায় কী ভাবে বলগুলো ধাক্কা দিত—!

ফ্রিম্যান। মনে পড়ে টম, কর্টরাইটের জোর বলে একবার ডাক্তার কিভাবে ঘুষি মেরে রান করেছিল?

এমেট। হাঃ হাঃ হাঃ বুড়ো শয়তান! মনে নেই আবার! কিন্তু আস্‌লি মরদ ছিল। সেবার ক্রেসল্যাণ্ডের বল গায়ে লাগল, ডাক্তার কাতরাচ্ছে দেখে দর্শকরা চেঁচিয়ে প্রতিবাদ জানাতে লাগল। তখন ডাক্তার কি করেছিল মনে পড়ে?

ফ্রিম্যান। বাপ্‌রে—দর্শকদের ধমকেছিল বটে!—ওহে আমার কথা ভাবতে হবে না, নিজের চরকায় তেল দাও। আর তারপর

ক্রসল্যাণ্ডকে ঠ্যাঙানি। আহা চোখের সামনে ভাসছে সেঞ্চুরীটা। সে সব কথা ভোলোনি তো ?

এমেট। টিচ্, সে সব দিন কি কেউ ভুলতে পারে? কী দিনই গেছে। প্রাণ ছিল খেলায়। এখন তো এরা বিলিয়ার্ড টেবিলের উপর ক্রিকেট খেলছে, আমরা খেলতুম চষা ক্ষেতে।…কিন্তু প্রাণ ছিল খেলায় প্রাণ ছিল…।

সত্যি প্রাণ ছিল! সে প্রাণ আমরা এখন নিতান্তই হারিয়েছি। ডব্লিউ জি-র কাছে যাই কেন—সেই প্রাণসন্ধানেই তো! ড্রইংরুমের সাহিত্যের মত চালু হয়েছে ড্রেসিংরুমের ক্রিকেট। ডাঃ গ্রেসের সরল ঘৃণা এই কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেছিল। তিনি ভণ্ডামীকে সইতে পারতেন না কিছুতে, আর বাজে চালবাজিকে। তাঁর নিজের অহঙ্কার ছিল যথেষ্ট, যদি আত্মমূল্য সম্বন্ধে বিনয়ের অভাবকে অহঙ্কার বলা যায়। ‘অমুক আমার পরেই ইংলণ্ডের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান’ একথা বলতে তাঁর দ্বিধা হয়নি কারণ কথাটা যে যথার্থ তা তিনি যথার্থই জানতেন। এই অবিনীত সত্যবোধ থাকার জন্য আবার বিনা কুণ্ঠায় তিনি নিজ ত্রুটি স্বীকার করতেন। পরিণত বয়সে যখন শরীর অতিরিক্ত ভারী হয়ে যাবার জন্য নীচু হয়ে ফিল্ডিং করতে পারছিলেন না, এবং তাতে দর্শকেরা যখন বিদ্রূপ করেছিল, তখন ডাঃ গ্রেস কিন্তু কিছুমাত্র রাগ করেন নি। কারণ তিনি জানতেন ঐ বিদ্রূপের যথেষ্ট কারণ ছিল। তিনি রেগে যেতেন ওস্তাদী দেখলে। যেমন একটি ছোকরার ব্যাপার—।

ওয়েস্ট কাউন্টিতে গ্রেস খেলতে গেছেন। সেখানে এক অজানা বোল্যারের দ্বারা বেদম বোল্ড হয়ে গেলেন। পরবর্তী ছোকরা ব্যাটস-ম্যানটিও পরের বলে বোল্ড হয়ে ফিরে এল। এসেই গজ্‌গজ্ করতে সুরু করল…বড্ড কম আলো…কম আলোর জন্যই বলটা দেখতে পাইনি…নইলে…

ডব্লিউ জি বাধা দিয়ে কড়া গলায় বললেন,—আমি কিন্তু বলটা পরিষ্কার আলোয় ঠিকই দেখতে পেয়েছিলুম—তবে খেলতে পারিনি।

আর একবার এক ছোকরা এসেছে লণ্ডন কাউন্টিতে খেলবার জন্য। ডাঃ গ্রেস জিজ্ঞাসা করলেন,—তুমি কত নম্বরে ব্যাটিং কর?

সগর্বে বলল ছোকরাটি,—যেখানে ইচ্ছে দেবেন আমাকে, আমি কখনো গোল্লা করিনি।

ও—হোঃ। গো-ল্-লা ক-র-নি। তবে তো যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হয়নি। তুমি তাহলে সব শেষে নেমো,—চোখ কুঁচকে ধারালো গলায় ডাঃ গ্রেস বললেন।

'গোল্লা করিনি'—এই দম্ভোক্তি সহ্য করা সম্ভব ছিল না গ্রেসের পক্ষে, কারণ তিনি নিজে গোল্লা যথেষ্ট করেছেন। কিন্তু বোলারদের পক্ষে কী দুষ্পাচ্য সেই সব গোল্লা! ১৮৭১ থেকে ১৮৭৬—ডাঃ গ্রেসের অপরিমিত লোলুপতার কয়েকটি বছর। সেই সময়ে কম রানে তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া আর মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিয়ে বাঘকে খোঁচা দেওয়া একই কথা। গ্রেসকে শূন্য রানে ফিরিয়ে দেবার দুর্ভাগ্য জেমস্ শ-এর কয়েকবার জুটেছিল। একটি বেনিফিট ম্যাচে ডাঃ গ্রেসের বিরুদ্ধে শ'-এর এল বি আবেদন গৃহীত হতে জেমস শ' বোধহয় শিউরে উঠেছিলেন নিজ সাফল্যে। দ্বিতীয় ইনিংসে বহুগুণ ক্ষুধা নিয়ে ডাক্তার ভোজনপর্ব সুরু করলেন। দলের প্রথম ১০০ রানের মধ্যে করলেন ৭০, ২০০ রানের মধ্যে ১৫০; দলের রান যখন ৩০০ তখন নিজে ২০০ পেরিয়ে গেছেন, যখন আউট হলেন ২৬৮ করে তখন দলের রান ৪২৬। পার্টনারদের মধ্যে যে সবচেয়ে সুন্দর খেলেছিল তার রান—৩৬!!

ঐ বছরই জেণ্টলম্যান-প্লেয়ার্সদের খেলায় জেমস শ' আর একবার গ্রেসকে প্রথম ইনিংসে দিলেন শূন্য, দ্বিতীয় ইনিংসে ফেরৎ পেলেন দ্বিশতাধিক অগ্নিরাণ।

মানুষ গ্রেস থেকে খেলোয়াড় গ্রেসের মধ্যে এসে পড়েছি। আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে সংখ্যার সার বসানো একটি বিরাট গ্রন্থ। ডাঃ গ্রেস কত রান করেছেন, কত উইকেট নিয়েছেন, ক্যাচ ধরেছেন কত—ইত্যাদি নানা তথ্য। তাতে দেখব ১৮৬৪ থেকে ১৯০৮ পর্যন্ত চুয়াল্লিশ বছরে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে ৫০,৮৯৬ রান করেছেন ১২৬টি সেঞ্চুরী শুদ্ধ। উইকেট নিয়েছেন ২৮৭৫, গড়ে ১৮ রানে একটি। ১৮৬০ থেকে ১৯১৪ পর্যন্ত সর্বশ্রেণীর খেলায় তাঁর রানসংখ্যা ৮০,০০০ এবং উইকেটের সংখ্যা ৭,০০০।

কিন্তু তবু ডাঃ গ্রেস বিচ্ছিন্ন রেকর্ডে অতিক্রান্ত হয়েছেন কখনো কখনো। সংখ্যার মধ্যে অনেক কথাই লেখা থাকে না; স্কোরবোর্ড নামক গাধাটি স্বজাতির স্বভাবে ভারবাহী অথচ মূল্যজ্ঞানহীন। স্কোর বোর্ডে কি লেখা আছে ডাঃ গ্রেস কি ধরনের মাঠে খেলেছিলেন, কিংবা তাঁর বিপক্ষের বোলারদের সামর্থ্যের পরিমাণ ছিল কতখানি? তাতে কি লেখা আছে বা থাকতে পারে—ডাঃ গ্রেসের পূর্বে ক্রিকেট কোন্ অবস্থায় ছিল এবং পরবর্তী ক্রিকেটকে অগ্রবর্তী করতে তাঁর দান কি পরিমাণ? ডাঃ গ্রেসের ভূমিকার রূপ বোঝাবার জন্য আমি সাহিত্যের জগৎ থেকে দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করতে পারি, যদিও তাতে সাহিত্যের অনন্যনিষ্ঠ পাঠক হয়ত ক্ষুণ্ণ হবেন। বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের তাৎপর্য বোঝাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—"পূর্বে কি ছিল এবং পরে কি পাইলাম, তাহা দুই কালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা এক মুহূর্তে অনুভব করিতে পারিলাম।...বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।" ঠিক এই ব্যাপারটিই ঘটেছিল ক্রিকেটে ডাঃ গ্রেসের আবির্ভাবে। রণজিৎ সিংজী তাই বোঝাতে চেয়েছেন। ক্রিকেটের রোমান্টিক মহাকবি রণজি বঙ্কিমতুল্য ডব্লিউ জি গ্রেস সম্বন্ধে লিখেছেন—

> পুরাতন ও নূতন ব্যাটিং-পদ্ধতির মধ্যে প্রধান পার্থক্যের রেখা টানিয়াছে ডাঃ ডব্লিউ জি গ্রেসের আবির্ভাব। তিনি ব্যাটিং-এ

আমূল বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন আনিয়াছেন। ব্যাটিংয়ের ব্যক্তিজ্ঞানকে বিজ্ঞানে উন্নীত করিয়াছেন। ডব্লিউ জি-র পূর্বে দুই ধরনের মাত্র ব্যাটসম্যানই ছিল—ব্যাটসম্যান আগাইয়া খেলে বা পিছাইয়া খেলে। এবং প্রত্যেক খেলোয়াড়েরই পক্ষপাত ছিল কোনো একটি বিশেষ মারের প্রতি। ডব্লিউ জি যাহা করিলেন,—তাঁহার বিশাল প্রতিভায় প্রত্যেক ভালো খেলোয়াড়ের শ্রেষ্ঠ অংশটুকু সম্মিলিত করিয়া উপযোগিতাকেই স্টাইলের ভিত্তিরূপে স্থাপন করিলেন। কোনো একটি বিশেষ ধরনের মারের প্রতি পক্ষপাত নহে, উইকেটের সর্বদিকের মারের উপর সমমূল্য আরোপ করিয়া আধুনিক ব্যাটিং-পদ্ধতির তিনিই প্রবর্তক। সামান্য মাত্র চিন্তা করিলেও যে-কোনো ক্রিকেটার ডব্লিউ জি-কৃত বিপুল পরিবর্তনের রূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। আমি তাঁহাকে যে কেবল জাত ও অজাত সর্বকালের খেলোয়াড়দের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করি, তাহাই নহে, তাঁহাকে আধুনিক ব্যাটিং-এর স্রষ্টারূপেও গ্রহণ করি। তিনি পুরাতন একতারাকে বহুতন্ত্রী বীণায় রূপান্তরিত করিয়াছেন। এবং এতদতিরিক্ত, তিনি প্রয়োগকেও আবিষ্কারের অনুরূপ মূল্যবান করিয়াছেন। আমাদের সকলের হাতেই যন্ত্রটি আছে, কিন্তু আমরা বাজাইতে অসমর্থ। আমরা সবই জানি, কিন্তু করিতে পারি না। ডব্লিউ জি-র পূর্বে ব্যাটসম্যান জানিতইনা ব্যাটিংয়ে কী করা সম্ভব। বোলিং-এর বিবর্তন ক্রমিক ও স্বাভাবিক। প্রত্যেক বড় বোলারের দান আছে সে ব্যাপারে। কিন্তু ডব্লিউ জি এককভাবে আধুনিক ব্যাটিং আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি ইহার বহুসংখ্যক ঋজু প্রণালীকে আকর্ষণ করিয়া আবর্তিতগতি বিশাল নদীধারায় রূপান্তরিত করিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহাকে অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন বা করিবেন, তাঁহারা তাঁহার যথাসম্ভব নৈকট্যে পৌঁছিতে পারেন বা নাও পারেন, কিন্তু একথা

চিরদিন সত্য থাকিবে, তিনিই এ পথের মহাজন—দ্রষ্টা ও স্রষ্টা উভয়ই।

রবীন্দ্রনাথকে কি আবার স্মরণ করতে হবে? অন্তত একবার করা দরকার রণজির প্রত্যক্ষ ঋজু বক্তব্য রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাস্পর্শে কি রকম রূপালঙ্কৃত হতে পারে, তার দৃষ্টান্ত দেবার জন্য।—

"এতদিন আমাদের বঙ্গভাষা কেবল একতারা যন্ত্রের মতো একতারে বাঁধা ছিল,…বঙ্কিম স্বহস্তে তাহাতে এক-একটি করিয়া তার চড়াইয়া আজ তাহাকে বীণাযন্ত্রে পরিণত করিয়া তুলিয়াছেন। পূর্বে যাহাতে কেবল স্থানীয় গ্রাম্য সুর বাজিত, আজ তাহা বিশ্বসভায় শুনাইবার উপযুক্ত ধ্রুপদ অঙ্গের কলাবতী রাগিণী আলাপ করিবার যোগ্য হইয়া উঠিয়াছে।"

আঙ্গিকের আলোচনায় পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে চাই না, কেবল মনে রাখবেন রবীন্দ্রনাথ-কথিত একতারার বহুতারবিশিষ্ট বীণাযন্ত্রে রূপান্তর এবং রণজি-কথিত He turned the old one-stringed instrument into a many-charted lyre—একই কথা। ঐ কথাগুলি এবং রবীন্দ্রোক্ত 'ধ্রুপদ অঙ্গের কলাবতী রাগিণী'—এগুলি ডাঃ গ্রেসের ব্যাটিং-চরিত্র সম্বন্ধে প্রায় শেষ কথা। আরো একটি কথা আছে, রণজি যা বলেছেন,—ডাঃ গ্রেস উপযোগিতাকেই স্টাইলের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেছিলেন। আমরা বলতে পারি সেটা হল ক্রিকেটের হিতবাদ। বেশী রান কেবল নিজের গৌরবের জন্যই নয়, দলের জয়ের পক্ষেও অতিমূল্য। গ্রেসের পরে ক্রিকেটের প্রধান পুরুষ ডন ব্র্যাডমানের অন্যতম অপ্রশংসা তাঁর অপরিমিত রান-ক্ষুধার জন্য। গ্রেসের দিকে আঙুল দেখিয়ে ব্রাডম্যান অব্যাহতি পেতে পারেন। রাক্ষুসে রান সত্ত্বেও ইংরেজের কাছে গ্রেস বিদ্বেষভাজন হননি দুটি কারণে, এক, গ্রেস ইংলণ্ডের লোক, দুই, ব্রাডম্যান তাঁর মানবিক ব্যক্তিত্বকে যথাসম্ভব গোপন রাখতেন খেলার মাঠে, সেইটাকে প্রকাশ না করে একমুহূর্ত কাটাতে পারতেন না ডাঃ গ্রেস।

ব্যাটিং-যাত্রা শুরু করার আগে ডাঃ গ্রেস যেন নিতান্ত নিরুপায়ে বিড় বিড় করে বকতে লাগলেন—যখন অমুক ভদ্রলোক সেঞ্চুরী ক'রে আমাকে পথ দেখিয়ে গেছেন, তখন—

—ডবল সেঞ্চুরী করায় তখন গ্রেসের ন্যায্য অধিকার।

ডাঃ ডব্লিউ জি গ্রেসের ক্রিকেট-জীবনের মধ্যে স্যার ডমের ছুটো ক্রিকেট-জীবন পুরে দেওয়া যায় স্বচ্ছন্দে, বৃদ্ধ লোকটি এতদিন খেলেছেন। খেলতে খেলতে তাঁর দাড়িতে পাক ধরে গিয়েছিল। তবু ঐ বৃদ্ধ জীবনের একদিন যৌবন ছিল। ডাঃ গ্রেসের বাসন্তী উচ্ছ্বাসের বছরগুলো—১৮৭১ থেকে ১৮৭৬। এ ছাড়া ১৮৯৫ সালও বিশেষ-ভাবে স্মরণীয়, তখন অকাল বসন্তের বিপরীত ডাঃ গ্রেসের বিকাল বসন্ত। সন্ধ্যাসূর্য ক্রিকেট-দিগন্তে অমন অস্তোজ্জ্বল রূপে কখনো দেখা যায়নি। ১৮৯৫ সালে ৪৭ বৎসর বয়সের গ্রেস-কীর্তির কথা স্মরণ করব পরে, এখন ১৮৭৬।

সেরা বছর। কিন্তু ব্যর্থ চেষ্টা করে লাভ নেই। তাঁর সমস্ত বড় খেলার বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। কয়েকটি খণ্ডকে নির্বাচন করে নেওয়া যাক। যেমন, স্মরণীয় আট দিনের কাহিনী, ডাঃ গ্রেস স্বয়ং যা নিয়ে গর্ব করতেন। ১৮৭৬ সালের ১১ই আগস্ট থেকে ১৮ই আগস্ট।

১০ই আগস্ট এম সি সি'র হয়ে কেণ্টের বিরুদ্ধে খেলতে শুরু করলেন। সেদিন কেণ্ট বিরাট রান তুলল, তার মধ্যে আছে লর্ড হ্যারিসের সুন্দর দেড়শো। দিনটা কাটল বল খোঁজাখুঁজির প্রাণান্ত পরিশ্রমে। পরদিন ১১ই। এম সি সি ধ্বসে পড়ল ক্লান্তিভরে প্রথম ইনিংসে। চা-পানের পর ফলো-অন করে এম সি সি যখন দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামল তখন ইনিংসে পরাজয় এড়াতে হলে অন্তত তিনশো রানের দরকার। বলাবাহুল্য সেটা অসম্ভব কাজ এবং ডব্লিউ জি শনিবার রাত্রে বাড়ি ফিরতে উৎসুক ছিলেন। সুতরাং যথেচ্ছ পেটাতে শুরু করলেন। কিন্তু পূর্ব ইচ্ছানুযায়ী কাজ হলো না,



অবহেলায় সেঞ্চুরী হয়ে গেল পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে—দিনের শেষে নট আউট রইলেন ১৩৩ রান করে।

পরদিনও বাড়ি যাবার কথা ভাববার অবসর পেলেন না,—এত ব্যস্ত থাকতে হোল। পার্টনার এল গেল, ডব্লিউ জি খেলে গেলেন। যখন ক্যাচে ধরা পড়লেন, তখন তাঁর নিজস্ব রান ৩৪৪—প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটের রেকর্ড।

ঐ রবিবার সন্ধ্যার পর ডাঃ গ্রেসকে কাটাতে হল দম বন্ধ করা ট্রেন ভ্রমণে। সোমবার গ্লস্টার্সশায়ারের হয়ে খেলতে নেমে টসে জিতলেন। হাতা গুটোলেন এবং কড়া রোদের মধ্যে তাঁর নটিংহ্যাম-নিবাসী বন্ধুবর্গের বিরুদ্ধে ১৭৭ রানের গদাযুদ্ধ করলেন।

তৃতীয় খেলাটি বাড়ির কাছাকাছিই হয়েছিল, ইয়র্কশায়ারের সঙ্গে। নটিংহ্যামের বিদায়ী খেলোয়াড়দের সঙ্গে ট্রেনপথে দেখা হোল ইয়র্ক-শায়ারের। নটিংহ্যাম যথাসাধ্য বর্ণনা করল ডব্লিউ জি-র কাণ্ড। ইয়র্ক-শায়ার উপেক্ষার হাসি হাসল। হাসি চেপে টম এমেট বললেন, যা বলেছ তা হয়ত ঠিক, কিন্তু খুড়োকে তিনবার ও জিনিস দেখাতে হচ্ছে না, আমরা আছি।

কিন্তু ঐ আট দিনে খুড়োর যা খুসী করবার অধিকার। সুতরাং তিনি আবার টসে জিতবেন, ব্যাট হাতে উইকেটে গিয়ে উক্ত টম এমেটকে বলবেন, আমি নিজে নিজেকে আউট হতে দিচ্ছি না, তোমাদেরই আমাকে আউট করতে হবে, এবং অবিলম্বে পেটাতে শুরু করবেন। দু দিন ধরে বীভৎস অত্যাচার চলবে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বল করবে বোলার, মুখে রক্ত তুলে ছোটাছুটি করবে ফিল্ডার। অবশেষে তারা বিদ্রোহ করবে। একজন বোলার বিনীতভাবে অব্যাহতি চাইবে ক্যাপ্টেনের কাছে বল করা থেকে। সেই বল যখন টম এমেটের হাতে তুলে দেওয়া হবে, তখন এমেট পর পর এমন তিনটি বল দেবেন—যেগুলির সম্বন্ধে বলা হয়েছে—ওয়াইডেস্ট ওয়াইড।

টম এমেট সে যুগের একজন সেরা বোলার।

ডব্লিউ জি ৩১৮ নট আউট রইলেন।

আট দিনের খেলায় রান করেছিলেন ৮৩৯। অ্যাভারেজ নিয়ে ডাঃ গ্রেস গর্ব করতেন—চারশো সাড়ে উনিশ।

(ভারতশ্রেষ্ঠ ক্রিকেট প্রসঙ্গ)

কিন্তু বয়সের হিসাবে অলৌকিক ঘটালেন ডাঃ গ্রেস ১৮৯৫ সালে। বয়স তখন সাতচল্লিশ। ঐ বয়সের একজন লোক কঠিন শীতের মধ্যে মে মাসের ভিতরেই হাজার রান করে ফেলছেন—অবিশ্বাস্য! শততম শত রান ঐ বছরেরই কীর্তি। ঐ বছরই তাঁর ছেলে ভার্সিটি ম্যাচে ভাল রান করল এবং তিনি দেখে গেলেন প্রাচ্য-তারকার অভ্যুদয়,—অব্যবহিত পরযুগের শ্রেষ্ঠ ক্রিকেটার রণজিৎ সিংজীকে।

রানের হিসেব নিতে গিয়ে গ্রেস মানুষটির কাছ থেকে আমরা যেন সরে যাচ্ছি। বড় রানের বদলে ছোট রানের মধ্যে গ্রেসকে আমরা যেন আরো বেশী খুঁজে পাব। সুতরাং আমরা বাদ দেব এমনকি ১৮৯৬ সালে ৪৮ বছর বয়সে করা তৃতীয় ত্রিশতাধিক রানকে। কিংবা তারো পরে করা অন্য বড় স্কোরকে। ধরব কম রানের হিসেব।

দু'রকম কম রান তিনি করতেন। এক ধরণের কথা আগে বলেছি ঃ হঠাৎ আউট হয়ে যাওয়া,—যখন তাঁকে আউট করে ফেলে বোলার ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ত ভাবী শাস্তির ভাবনায়। যৌবনে তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে 'তরুণ দৈত্যদের মধ্যে সবচেয়ে সুমেজাজী ও সুরসিক,' তবু ডব্লিউ জি একবার তৃতীয় বলে শূন্য রানে আউট হয়ে যেতে সংবাদপত্রের কলম যেন চীৎকার করে উঠেছিল—অ্যাঁ—! ভাবো একবার—গ্লাডস্টোনের ব্যাকরণ ভুল!

এছাড়া আরো এক ধরনের কম রান করা তাঁর অভ্যাস ছিল, যেমন একবার করেছিলেন ৯ রান, যেবার গ্লস্টার্স দল ব্রিস্টলে গিয়ে আউট হয়েছিল মোট ১৭ রানে। কিংবা স্মরণ করতে পারি ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে একটি বে-সরকারী অস্ট্রেলিয়ান দলের বিরুদ্ধে ইংলণ্ড একাদশের

উদ্দীপনার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। তাঁর বিশাল চেহারা, প্রাণশক্তি, অনবদ্য ছেলেমানুষি, কথাকাটাকাটিতে উদ্ধত অথচ দায়ক স্ফূর্তি—সমস্ত মিলিয়ে তিনি বিচিত্র, বহুবর্ণ ও ব্যাপক। হারা দিয়ে ডব্লিউ জি প্রথমেই সকলকে দমিয়ে দিতেন। া স্টোনের উপর ওজন ; বুক ছাপিয়ে পড়ছে দাড়ি। লোকটি বড় অপরিচ্ছন্ন। তাঁর সঙ্গে একঘরে রাত কাটাবার পরে একজন য়াড় একদা প্রভাতেই স্নান করতে ছুটেছিলেন। এবং একজন ়ট-কীপার তাঁর বিষয়ে বলেছেন, আমি যে-সব নোংরা ঘাড়ের ন দাঁড়িয়েছি, এঁরটি তাদের মধ্যে নিঃসন্দেহে নোংরাতম। অথচ দুটি ছিল অপূর্ব। তেমন চোখ দেখতে মাইলের পর মাইল যায়—বলেছেন একজন পুরুষ খেলোয়াড়। এবং মেয়েরা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত নাচের আসরে তাঁর পদের স্পর্শসুখ পাবার আশায়।

এমন একটি মানুষ সম্বন্ধে গল্প সৃষ্টি হবে, সে আর আশ্চর্য কি! সে গল্পের সবগুলোই কি 'সদা সত্য কথা কহিবে'র মধ্যে পড়ে? ব কেন? লোকগাথা কি একজন লোকের লেখা? ডব্লিউ জি ণ্ডের ক্রিকেটগাথার নায়ক। এই কাহিনীগুলি সম্বন্ধে চমৎকার ধ্য করেছেন ইংরেজ সাহিত্যিক এ এ টমসন :

"কোনো কাহিনী শূন্য থেকে সৃষ্টি হয় না। ডব্লিউ জি গ্রেসের কাহিনী ক্রিকেটের সেরা গল্প, খেলার সেরা গল্প এবং তার নিজস্ব অজটিল রূপে উনিশ শতকের ইংলণ্ডের সেরা গল্পও বটে। এ কাহিনী প্রায় অবিচ্ছিন্ন সাফল্যের কাহিনী, অথচ অন্যান্য অনেক পরিচিত সাফল্য কাহিনীর মত ভোঁতা বা বোদা নয়। কাহিনীগুলি যে চরিত্রের চতুর্দিকে গড়ে উঠেছে, সেই চরিত্রের উজ্জ্বল আলোকে এগুলি প্রদীপ্ত। এদের দীপ্তি এমন যে, সেইকালের, এমন কি পরবর্তী কালের যে কোনো লোকমান্য চরিত্রের অপেক্ষাও তা স্পষ্ট ও স্বচ্ছ।...গ্রেসের কিংবদন্তীগুলির পটভূমিকায় তার নিজস্ব

ধরনের কড়া তুলির আঁচড় আছে। ...খেলার জগতে নিয়ম মেনে গ্রেস যে সমস্ত চালাকি করতেন, সেগুলোর হাসির দিকটা কাহিনীগুলো থেকে পাই। এসব থেকে তাঁর যে ছবি গড়ে উঠেছে তা নিত্য ছেলেমানুষি, আবেগোচ্ছ্বাস এবং ব্যক্তিগত দয়ার্দ্রতার।

"কাহিনীগুলোর উজ্জ্বলতা এবং বর্ণবহুলতা যেন অনেক সময় মানুষটিকে ঢেকে ফেলেছে। তাঁর সম্বন্ধে গল্প এত প্রচুর যে, একালের যুবকেরা মনে করে তিনি একটি বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক চরিত্র—ঐতিহাসিক এবং ছায়াছন্ন। কিন্তু একথা জোর করে বলা যায়, কিংবদন্তীগুলোর চেয়ে আসল মানুষটি ছিলেন অনেক বড়।

"ডব্লিউ জি গ্রেস ছিলেন ইংরেজী উপন্যাসের বিখ্যাত কমিক চরিত্রের মতই—জীবনের বৃহতীকৃত রূপ। সেই সঙ্গে সহজরূপও বটে। তাঁর ব্যক্তিত্বের আতিশয্যপূর্ণ রূপায়ণ তাঁকে মিস্টার পিকউইকের সমতুল করেছে।"

যথেচ্ছ কতকগুলো ঘটনা উল্লেখ করা যায়।

সেবার অক্সফোর্ডে চাঞ্চল্য পড়ে গেছে—ডাঃ গ্রেস আসছেন। অক্সফোর্ডের সঙ্গে এম সি সি-র খেলা। সকলের মহাভয়, ডাঃ গ্রেসকে আউট করা যাবে কি করে? অধিকাংশই ভেঙে পড়ে হতাশায়। তখন একজন মতলব দিলে, ডাক্তারের শ্যাম্পেনে দারুণ আসক্তি, প্রথম দিন সন্ধ্যেয় তাঁকে মদে চুবিয়ে বেসামাল করে ফেলতে হবে।

প্রথম দিনে ১৪২ রানে অক্সফোর্ড আউট। এম সি সি খেলতে নেমে করল প্রথম জুটিতে ৯০। গ্রেস নট আউট ৫০। সন্ধ্যেয় হল ভোজ। ছাত্রদের বাসনামত গ্রেস একটু বেশী রকম টানলেন।

পরদিন খেলার আগে গ্রেস নেট প্রাকটিসের সময় সোজা বোল্ড। দাবানলের মত সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল—গতকাল বাড়াবাড়ির পর দাদু আজ আর বল 'গ্যাখসেন' না।

বল রীতিমত দেখতে পেয়ে আসল খেলার সময় গ্রেস করলেন

১০৪। এম সি সি-র মোট ২৬০। ভরসা এখনো যায় নি। অক্সফোর্ড নামল। এবং ফিরে গেল ১৩২ রান করে সেদিনই। দশটা উইকেটই পকেটে পুরলেন ডাক্তার গ্রেস।

সন্ধ্যেয় দেখা গেল অক্সফোর্ডের ক্যাপ্টেন করুণভাবে ডাঃ গ্রেসের দিকে তাকিয়ে আছেন, শ্যাম্পেনের গ্লাসে একটা লম্বা চুমুক দিয়ে ভরাট গলায় হেসে উঠলেন বুড়ো দাদু,—কেমন—হেহ্ঃ হেহ্ঃ হেহ্ঃ—।

কিংবা ১৮৮৫ সালে মিডলসেক্সের সঙ্গে খেলার ঘটনাটি। দুপুরে সতর্ক ভাবে খেলা সুরু করে প্রথম ৬০ রান পৌনে তিনঘণ্টায় করলেও পরে আক্রমণ চালিয়ে দিনের শেষে রইলেন ১৬৩ নট আউট। রাত্রে বিশ্রাম মিলল না, ডাক্তারীর কল এল। সমস্ত রাত্রি প্রসব করানোর কাজে ব্যাপৃত রইলেন এবং পরদিন সকালে যেন কিছুই হয়নি এমন ভঙ্গিতে ব্যাটিং সুরু করে অপূর্ব 'প্রহারময়' ২২১ রানে শেষ করলেন ইনিংস। বোলিং করেছিলেন। মিডলসেক্সের দু ইনিংসে ৬৩ ওভার বল দিয়ে উইকেট নিয়েছিলেন ১১টি।

সন্ধ্যেয় ডাঃ গ্রেসের চতুর্দিকে মিডলসেক্সের খেলোয়াড়েরা ঘিরে দাঁড়ালো। মিডিলসেক্সের ক্যাপ্টেন সহাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন, গতকাল রাত্রের প্রসবের খবর কি?

—ব্যাপারটা মোটামুটি সন্তোষজনক। বাচ্ছাটা মরেছে, তার মাও মরেছে, তবে বাপটাকে বাঁচিয়েছি।

জেমস শ-এর অফ-ব্রেক বল কেউ খেলতে পারছে না, ডাঃ গ্রেসকে উপায় জিজ্ঞাসা করা হল। গ্রেস বললেন—কিভাবে খেলবে? এই ব্যাটটাকে দেবে ব-লে-র সামনে—এই আর কি।

এমন যাঁর ক্রীড়ারীতি তাঁর মুখে কী স্বাভাবিক এই উক্তি—ডিফেনসিভ স্ট্রোক মেরো না, ওতে তিন রানের বেশী পাওয়া যায় না। কিংবা,—আরে আরে কি করছ? বই পড়ছ? চোখ নষ্ট করা কেন বাপু? কিংবা ধরা যাক, সেই রোগীটির রোগ সম্বন্ধে তাঁর সত্বর বিধান—

মাথায় ছিট এক বুড়ো ভদ্রলোক এসেছেন। ডাঃ গ্রেস, পাগলাটে লোককে যেমন করতে হয়, তেমনি নানা প্রকার জিজ্ঞাসাবাদ সুরু করলেন।

আচ্ছা মশাই, আপনি এমন কোনো ক্যানারি পাখী দেখেছেন, যে কথা কয়?

না তো!

আচ্ছা দেখুন আমি ঠিক বলছি কি না—আপনি নিশ্চয় ক্রিকেটার নন, কি বলেন?

রোগী উত্তর করল—না, একেবারেই নয়।

হেহ্ঃ হেহ্ঃ হেহ্ঃ—ডাঃ গ্রেস আনন্দের সঙ্গে গম্‌গমে হাসলেন। —তাহলে ঠিক বলেছি।

রোগী বলল—হাঁ। তবে আমি কিন্তু খেলা দেখে থাকি। আপনাকে গোল্লা করে আউট হয়ে যেতে দেখেছি।

গম্ভীর মুখে প্যাড টেনে নিয়ে ডাঃ গ্রেস দ্রুত রোগের নাম লিখে দিলেন—'মতিভ্রম।'

এ মানুষকে নিয়ে কি করা যায়? ভালবাসা যায়। রাগই করি আর যাই করি, ভালো না বেসে উপায় নেই। গ্রেসের কাহিনী যখন পড়তে শুরু করেছিলাম, তখন ধারণা ছিল একজন বড় ক্রিকেটারের জীবনীর সঙ্গে পরিচিত হচ্ছি। কিন্তু দু'চার পাতার পরেই সেই ভিক্টোরীয় মানুষটিকে ঘরের লোকের মত মনে হল। শুধু ক্রিকেট খেলে এমন অন্তরঙ্গতা বিস্তার করতে আর কে পেরেছেন? তিনি একই মানুষ,—খেলার মাঠে, ডাক্তারখানায়, সামাজিক সম্মেলনে—সর্বত্র। উদার বদমাইসি এবং মহৎ ছেলেমানুষি মেশানো লোকটি। সেই চোর ধরার ঘটনাটি।

তখন গ্রেস ডাক্তারী পড়েন। চেস্টনাট-এ আছেন। মাঝরাতে জেগে উঠলেন কাতরোক্তি শুনে। কি ব্যাপার? হন্তদন্ত হয়ে গিয়ে

দেখেন—মজা! একটি চোর ধরা পড়েছে বিচিত্রভাবে। জানালা সরিয়ে ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল, ভারী পাল্লাটি তার হাতের উপর পড়ে আঙুল থেঁতলে দিয়ে বন্দী করে রেখেছে। যন্ত্রণায় তস্কর মহারাজ পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছেন।

ঘটনা শুনে ডব্লিউ জি-র ভাই জিজ্ঞাসা করলেন, চোরটাকে নিয়ে কি করলি?

কি আবার করব, ভালো করে মলম লাগিয়ে তার হাতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলুম। তারপর বাইরে টেনে নিয়ে গিয়ে ইয়েতে লাথি লাগিয়ে বিদেয় করে দিলুম।

সে কি, পুলিসে দিলি না?

না। মেডিকেল এটিকেট। রোগীকে পুলিশে দেওয়া যায় না।

কিন্তু রোগী যদি শুশ্রূষা পাবার পরেও বিশ্বাসঘাতকতা করে? তখন ডাঃ গ্রেসের চটে যাবার ষোল আনা অধিকার।

গ্রেস খেলছেন; পিছনে প্রবীণ উইকেটকীপার পামার। একটি ভয়াবহ বাম্পার লাফিয়ে উঠল। ডব্লিউ জি মাথা নামিয়ে সামলালেন। উইকেটকীপার মুখরক্ষা করতে পারলেন না। বল গিয়ে চোখের পাশে লাগল এবং গভীরভাবে কেটে গেল। ক্ষত স্থান সেলাইয়ের কষ্টকর কাজটা ডব্লিউ জি-কেই করতে হোল।

কপালে সেলাই নিয়ে প্রবীণ উইকেটকীপার পামার আবার খেলতে নামলেন।

উইকেটকীপারের দিকে একবার তাকিয়ে মুচকে হেসে একটা ধীর বল মারতে অনেকখানি এগিয়ে গিয়ে বলটি ফসকালেন গ্রেস। সঙ্গে সঙ্গে স্টাম্পড্।

ক্ষুব্ধ ভ্রূকুটি করে গ্রেস বললেন—অ্যাঁ, এই প্রতিদান!

'কিংবদন্তীর চেয়ে মানুষটা অনেক বড়' তার প্রমাণ ডাক্তাররূপে

তিনি দিয়েছেন। তিনি নিশ্চয় চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিরাট পুরুষ ছিলেন না; খেলার মাঠে দিনের অনেকটা সময় কাটত, তাও সত্য। তবু প্রাকটিশে অবহেলা করতেন না। রোগী ছিল ব্রিস্টলের আশপাশের মজুর শ্রেণীর মানুষ। এদের সঙ্গে সহজে মিশতে পারতেন তিনি। তাঁর অমসৃণ সহৃদয়তা তারা বুঝত। এ লোকটা কড়া কথা বলে, কিন্তু লোক ভালো। ধূসর টুইডের স্যুট পরা দাড়িওয়ালা ছড়ি হাতে বিশালাকার লোকটিকে তারা পর মনে করত না। ডাঃ গ্রেস তাদের বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে পড়তেন। দেখতেন কি আছে না আছে। যদি কয়লার অভাবে চুল্লী না জ্বলে তারা কয়লা পেয়ে যেত; যদি বাড়ীতে অনেকগুলো বেকার থাকে, একটার চাকরির জন্য পরিচিত লোকের কাছে সুপারিশ করতেন। আবার পথে যেতে যেতে রান্নার সুগন্ধ যদি পেলেন, লম্বা একটা শ্বাস টেনে বলতেন, বাঃ খাসা গন্ধ তো! তারপর কড়া নেড়ে ঘরে ঢুকে খাবার টেবিলের পাশে চেয়ার টেনে বসে যেতেন এবং বড় ভাগটি আত্মসাৎ করতে বিলম্ব করতেন না।

এমন একটি মানুষ, ক্রিকেটে যদি যুগন্ধর পুরুষ নাও হতেন—যা অবশ্য তিনি ছিলেন—তবু কি স্মরণীয় হতেন না? অন্ততঃ আশপাশের মানুষগুলি তাঁর বিষয়ে অচেতন থাকতে পারত না। জীবনের সুস্থ উচ্ছল সহাস্য রূপকে এমনভাবে গ্রহণ করেছিলেন যে, তাঁকে অস্বীকার করা সম্ভব ছিল না কারো পক্ষেই। শুধু তাই নয়, অপরের মধ্যে নিজের সচঞ্চল খুশীকে সংক্রামিত করতে পারতেন। যৌবনে ভালো অ্যাথলেট ছিলেন। স্পোর্টসে একবার যখন প্রায় সব কটি পুরস্কার হস্তগত করেছেন, ব্রিস্টলের পৌরপ্রধান তখন পরাজিত প্রতিযোগীদের সমবেদনা জানিয়ে বলেছিলেন, ভদ্রমহোদয়গণ নিরাশ হবেন না, এই ব্যক্তি একদিন বুড়ো হবেন। বয়সের মাপে একদিন তিনি সত্যই বুড়ো হয়েছিলেন, কিন্তু মনে বুড়োলেন না কখনো। প্রৌঢ় বয়সেও নিজের ছেলের সঙ্গে কয়েক মাইল দৌড়েছেন পাল্লা দিয়ে। তরুণদের প্রতি তাঁর ছিল বিশেষ প্রীতি ও পক্ষপাত। তাদের পছন্দ

করতেন কিন্তু আস্কারা দিতেন না। অহেতুক মিঠে বচনে আর পিঠ-চাপড়ানিতে ছোকরাদের শিরদাঁড়া নরম হয়ে যায়, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। নতুন ছোকরা হয়ত ব্যাট করতে নামছে তাঁর বিরুদ্ধে,—তাকে ভড়কে দেবার জন্য বল হাতে নিয়ে বললেন, খোকা বেশীক্ষণ তোমায় খেলতে হবে না, শীগগীর নিয়ে নিচ্ছি। এবং 'নিয়ে নেবার পরে' সে যখন চলে যাচ্ছে হেঁকে বলতেন, ওহে শোন শোন, আগামী-কাল সকালে নেটে এসো, দেখিয়ে দেব কেমন করে খেলতে হয়। যদি কোনো ছোকবা হঠাৎ-গড়ানো বলে আউট হয়ে গেল, গ্রেস উৎসাহ দিয়ে বলতেন, ভাগ্যে আমার বরাতে অমন বল জোটেনি। ভুল হলে ধমকও দিতেন প্রচণ্ড। পরে যদি বুঝতেন বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন, ক্ষমা প্রার্থনার চিঠি পাঠাতে বিন্দুমাত্র দেরী করতেন না। যেমন একটি চিঠি—'প্রিয় জ্যাক, অমন ক্যাচ মিস্ আমরা সকলেই করি, আমাদের মধ্যে তুমি সবচেয়ে কম কর।'

গ্রাম্য ছোকরার প্রতি তাঁর সহানুভূতির ছবিটি কী স্নিগ্ধ।

আর্নেস্ট নিতান্ত গেঁয়ো ছোকরা। তার উপর তোতলা। বন্ধুদের পরিহাসের সাধারণ লক্ষ্য। একবার তারা আর্নেস্টকে নিয়ে বড় নিষ্ঠুর কৌতুকের আয়োজন করল। আর্নেস্ট ডব্লিউ জি-র সই করা এক চিঠি পেল, তিনি ইয়র্কশায়ারের বিরুদ্ধে খেলবার জন্য আর্নেস্টকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

আর্নেস্ট নাচতে নাচতে মাঠে পৌঁছল। উত্তেজনায় আনন্দে তার তোতলামি এত বেড়ে গেল যে, তার বক্তব্য বোঝা অসম্ভব। তাকে হাজির করা হোল ডব্লিউ জি-র কাছে। ডব্লিউ জি গম্ভীরভাবে পোষ্ট-কার্ডটি পড়লেন। তারপর বললেন, বড় মুশকিল, এবারকার মত দল যে তৈরী হয়ে গেছে। যা হোক, তুমি কোট খুলে আমাকে দু'একটা বল দাও।

নেটে ডব্লিউ জি বোল্ড হয়ে গেলেন ছোকরার এলোপাথাড়ি ফুলটস বলে।

আর্নেস্ট গ্রামে ফিরে গেল পরমানন্দে। এর পর সারাজীবন সে গর্বের সঙ্গে বলেছে, পা—পা—প্রায় সে গ্লস্টার্সশায়ারের হয়ে খেলেছিল এবং ডব্লিউ জি-কে বো—বো—বোল্ড করে দিয়েছে।

এ হেন মানুষ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তাই ইংরেজের উচ্ছ্বাসের সীমা থাকে না। তাঁকে প্রধান ভিক্টোরীয়দের মধ্যে ফেলা হয়, বলা হয় সাহিত্যের ডাঃ জনসনের মতই খেলার ডাঃ গ্রেস; ডিকেন্সের চরিত্র রক্তমাংস ধরে নাকি আবির্ভূত তাঁর মধ্যে; কুইন ভিক্টোরিয়া ও মিঃ গ্লাডস্টোন ছাড়া লোকখ্যাতিতে 'ইউনিক মেথড'-পূর্ণ শার্লক হোমসই মাত্র তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী। এ সব বড় তুলনাও শেষ পর্যন্ত টেকে না, জনসাধারণ অতবড় মানুষটিকে সমস্তরের লোক বলেই ভাবতে চায়। কারণ তিনি "খেলার, ফন্দীর, মজাদার নাচ গানের ইংলণ্ডের অধিবাসী। তাঁর অনেক ইনিংস স্বভাবে হাসির গান। আত্মসচেতনতা, থেকে এমনভাবে মুক্ত ছিলেন, যা আজকের দিনে ভাবতেও পারি না। …যারা প্রতি বছর ক্রমোচ্চ সংখ্যায় তাঁর খেলা দেখতে আসত, তারা তাঁকে খেলার জাতীয় প্রতীক মনে করত,—তিনি যেন তাদের সাধারণ সম্পত্তি। তাঁর বিষয়ে তাদের এমন গর্ব যে, তাঁর সাফল্য নিয়ে তারা পরস্পরকে অভিনন্দিত করত, যেন ডব্লিউ জি-র নয়, এ তাদের নিজেদেরই কীর্তি। ডব্লিউ জি-র চালাকিতে তারা মজা করে চাপা হাসি হাসত, যেমন লোকে নিজের চালাকিতে হেসে থাকে।"

মানুষ এবং খেলোয়াড় দুজনেই আমাদের সামনে উপস্থিত। দুজনের মধ্যে কোনো চরিত্রগত ভেদ নেই। ব্যক্তিত্বের এই অখণ্ডতায় ডব্লিউ জি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যখন তাঁর বিষয়ে বলা হয়েছে—অন্যতম প্রধান ভিক্টোরীয়, তখন খেলোয়াড়রূপেও তিনি ভিক্টোরীয় যুগস্বভাবের অন্তর্গত। ভিক্টোরীয় যুগের প্রধান গুণ 'রেসপেক্টিবিলিটি'। সে যুগে "আচরণে অধিকতর ভব্যতা, জীবনে অনুরূপ স্ফূর্তি, পথে ঘাটে নিরাপত্তা এবং সাধারণ মানুষের অবস্থা—যদিও যথেষ্ট মন্দ—তবু পূর্বাপেক্ষা স্বচ্ছল।" তখন বার্ণাড শ বা অস্কার ওয়াইল্ডের বাগবৈদগ্ধ্য

ছিল না, ছিল না ড্যান লেনো বা জেরোম-কে-জেরোমের হিউমার, তবু একটি বড় জিনিস ছিল যার নাম আচরণে মর্যাদা। ডব্লিউ জি-র জীবনীকার ব্যঙ্গ করে বলেছেন, আমাদের এ যুগের কাছে ভিক্টোরীয় সদ্‌গুণ জর্জীয় বদগুণের চেয়ে ক্লান্তিকর।

ভিক্টোরীয় যুগের খেলোয়াড় ডব্লিউ জি-র খেলা সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে—খেলায় সোজা ব্যাটের নীতিমহিমা। যে বৈদগ্ধ্য এবং নৈপুণ্য পরের যুগে দেখা গিয়েছে, ডব্লিউ জি সেই রসাবিষ্টতা থেকে মুক্ত ছিলেন। তাঁর ছিল মহাকাব্যিক বাহুবল। অস্ত্রকৌশল আয়ত্তে থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজনমত শত্রুকে শায়েস্তা করতে মুষ্টিবদ্ধ দুটি হাতই যথেষ্ট। সেই প্রবল ও অনিবার্য শক্তির আকারে ডাঃ গ্রেস অনতিক্রান্ত। নচেৎ খেলার 'স্বর্ণযুগ' এসেছে তাঁর ঠিক পরের কালে, যে কালের ফসল ডব্লিউ জি-র একক কর্ষণের উৎপাদন। পরবর্তী সোনার সংসারে ছিল 'রণজির যাদু, ট্রাম্পারের অসিদীপ্তি, প্যালাইরেটের রমণীয়তা, জেসপের উৎফুল্ল উৎপীড়ন, ফ্রাইয়ের শীতল দক্ষতা এবং হার্স্ট, রোডস, জ্যাকসন, ব্রণ্ড, লকউডের মত অলরাউণ্ডারদের সাহস ও কৌশলের অজস্র গুণভূষণ।' সে জিনিস গ্রেসের থাক বা না থাক, স্পুনারের মত সৌন্দর্য, হবসের মার্জনা, কম্পটনের লাবণ্য তিনি বিস্তার করতে পারুন বা না পারুন, তাঁর মত ঐশ্বর্যবান আর কাউকে কল্পনা করা যায় না। এইখানে তিনি চিরজয়ী, অনতিক্রম্য। ঐশ্বর্য সঞ্চয়েও তাঁর পরিশ্রমের অবধি ছিল না। খেলার মাঠে তিনি কোথাও হেরে যাবেন, ভাবতেই পারেন নি। ব্যাটিং-এ অন্য কারো চেয়ে ন্যূন না হয়েও তিনি টেস্ট খেলা থেকে অবসর নিয়ে নিলেন শরীরের ভারে ফিল্ডিং করতে পারছিলেন না বলে। ডব্লিউ জি মাঠে থাকলে অধিনায়করূপেই থাকতেন, এবং ব্যাট করতে নামতেন সর্ব প্রথম। প্রথম স্ট্রাইক তাঁর। ফিল্ডিং-এর সময় তাঁর হাতের ভল্লুক থাবায় বল সম্মোহিত হয়ে আটকে যেত। কিন্তু তিনি বল করতে পারবেন না এও কি হয়? ব্যাটিং-এ ছিল স্বাভাবিক প্রতিভা, আত্ম-

গঠন করে বেলার হলেন। তাঁর মনঃসংযমের শক্তির সবচেয়ে বড় প্রমাণ বোধ হয় তাঁর বোলিংসাফল্য। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে প্রায় তিন হাজার উইকেট ছেলেখেলা করে পাওয়া যায় না। তাঁর বোলিং-ভঙ্গি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ অনুসরণ করলেই বুঝতে পারব, খেলায় ডাঃ গ্রেসের বুদ্ধিপ্রয়োগের পরিমাণ :—"একজন অতিকায় দৈত্যবৎ মানুষ, দু'হাত ছড়িয়ে দিয়ে উইকেটের দিকে ছুটে আসছে, বিশাল দাড়ি উড়ছে, ঘন রঙ মুখের উপর বিরাট মাথা এবং তার উপর লাল-হলদে ডোরাকাটা টুপি……এই বস্তুর সম্মুখীন হয়ে ব্যাটসম্যান একটা কিছু ভয়ঙ্করের প্রত্যাশা করে। তার পরিবর্তে সে যখন অত্যন্ত আস্তে ছোঁড়া একটি নরম ধরনের ভোল্লা বল পায়, বিশ্বাসই করতে পারে না, এই বলের নাড়ুটি উক্ত বিরাট পুরুষের হাত থেকেই খসেছে। সে এমন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে যে, উইকেট খোয়াতে দেরী করে না।"

আমরা জানি, এর পরেই একটি পরিচিত হাসি আছে, ভারী গলায় পূর্ণ তৃপ্তির নির্ঘোষ—হেহ্ঃ হেহ্ঃ হেহ্ঃ…।

সেই হাসিই শুনতে পাচ্ছি। তাঁর ক্রীড়া-জীবনের শেষ বড় হাসি। অতবড় জীবন্ত মানুষটিও যেন সেই হাসির মধ্যে ঢাকা পড়ে গেছেন। ঈষৎ বেদনাসিক্ত অথচ আক্ষেপহীন তৃপ্তিময় বিদায়বাণী একটি হাসির মধ্যে এমনভাবে আর কখনো ফুটেছে কি না সন্দেহ।

১৮৯৯ সালে ট্রেন্টব্রিজের টেস্ট ম্যাচ অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে। প্রথম ইনিংসে ডব্লিউ জি মোটামুটি খেললেন, ফ্রাই ও রণজি ছাড়া উল্লেখ-যোগ্য রান তাঁরই। দ্বিতীয় ইনিংসে একটা ব্রেক বলে আউট হয়ে গেলেন শূন্য রানে।

খেলার শেষে সিলেকসন কমিটির সভা। সি বি ফ্রাই নির্বাচক সভার সদস্য। সভায় প্রবেশ করতে যাচ্ছেন, ডাঃ গ্রেস ডাকলেন : —চার্লি, শোন শোন, ম্যাকলারেন তো বেশ খেলছে, ওকে পরের

টেস্টে খেলালে কিরকম হয়? ফ্রাই স্বীকার করলেন, সত্যি, ম্যাকলারেন টেস্টে স্থান পাবার যোগ্য।

গ্রেস ও ফ্রাই একসঙ্গে সভায় প্রবেশ করলেন। সভা বসল। সকলেই একমত হল, ম্যাকলারেন টেস্টে স্থান পাবার যোগ্য। তাঁকে স্থান দেওয়া হোক। একটু যা সন্দেহ ছিল তা দূর হয়ে গেছে ফ্রাইয়ের সিদ্ধান্তে। ফ্রাই ডাঃ গ্রেসকে জানিয়েছেন,—ম্যাকলারেন টেস্টে স্থান পান এই তাঁর কাম্য।

কিন্তু কার স্থানে স্থান পাবেন,—যাবেন কে?—ডাঃ ডব্লিউ জি গ্রেস। অসহায়ের মত তাকিয়ে রইলেন ফ্রাই। নিজের অজান্তে তিনি পরোয়ানায় স্বাক্ষর করেছেন। ডাঃ গ্রেসই তা আদায় করে নিয়েছেন। কুরুবৃদ্ধের কাছে তাঁর মৃত্যুর উপায় জানতে যেতে হয়েছিল, ক্রিকেটের বৃদ্ধ পিতামহ আরো বেশী উদারতা দেখিয়েছেন।

দান ফেলা হয়ে গেছে—ফ্রাই দেখলেন—ম্যাকলারেনের পক্ষে তাঁর সমর্থন উঠিয়ে নেবার চেষ্টা করা বৃথা।

সভা শেষ। সকলে উঠল। মাথা নামিয়ে বেরিয়ে এলেন সি বি ফ্রাই। আত্মগ্লানিতে সমস্ত মন পূর্ণ। টেস্টে স্থান পেয়েছিলেন তাঁর উপর ডাঃ গ্রেসের আস্থার জন্য। আজ ফ্রাইয়ের কাস্টিং ভোট ডাঃ গ্রেসের ক্রিকেট-জীবন শেষ করে দিল। নাটকীয় আয়রনির চমৎকার দৃষ্টান্ত। ফ্রাইয়ের দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল।

চমকে উঠলেন। পিঠের উপর সিংহের থাবার মত দুটি হাত পড়েছে, কিন্তু স্পর্শে কোমল। ভারী গলা গমগম করে উঠল—বৎস, দুঃখ কোরো না। আমি চলে যেতে চাইছিলুম। জ্যাকসনকে আগেই বলেছিলুম, আর আমি খেলছি না।

সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন ফ্রাই।

হেহ্ঃ হেহ্ঃ হেহ্ঃ…কাজটা কিন্তু তোমাকে দিয়ে করিয়ে নিলুম। হেহ্ঃ হেহ্ঃ হেহ্ঃ। ভরাট হাসি গমকে গমকে উঠতে পড়তে লাগল।

ফ্রাই আবার তাকালেন ডব্লিউ জি-র দিকে। বিরাট মুখ, ধূসর কালো এক মুখ দাড়ি, বড়ো বড়ো উজ্জ্বল গভীর দুটি চোখ এবং চোখে মুখে মাখানো কৌতুক-দুষ্টুমি-সহানুভূতি-করুণার বিচিত্র বর্ণ।

ফ্রাই চেয়ে রইলেন। মূর্তিটা অন্ধকারের মধ্যে সরে গেল। কেবল বিশাল হাসি বাজতে লাগল প্লাবনতরঙ্গের মত চতুর্দিকে।

হাসির পলিমাটিতে ভরা চরের উপর আগামী কালের সোনার ধানের শীষ ইতিমধ্যে জাগতে সুরু করে দিয়েছে।

শেরউড বনের ক্রিকেটার

[সিড বার্ণস]

ক্রিকেট যে শুধু একটা খেলা নয়, একটা জীবনবোধ, একথা জানাতে ক্রিকেট-পক্ষীয়েরা দেরী করেন না। তাই 'ইট ইজ নট ক্রিকেট' যে বইয়ের নাম, নামেই প্রকাশ, সে বইখানি ক্রিকেট-ধর্মাধিকরণে নীতি-লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদলিপি।

গ্রন্থের লেখক সিড বার্ণস, অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটের 'নটি বয়'।

একটি দুরন্ত অশিষ্ট বালক শীতল শিষ্টতার সামনে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে প্রতিবাদ করছে। 'এটাই হল ক্রিকেট'-রূপী অচলায়তনের মালিকদের ভেবে দেখার সময় হয়েছে—ক্রিকেট যদি জীবন-নীতি হয় তাহলে তা পাথরের দেওয়ালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, তার বাইরেও আছে, বাইরেই বেশী, গুরুর বাস সেইখানেই।

ক্রিকেটের অচলায়তন কতবার ভাঙল! ইয়র্কশায়ার ক্রিকেটের বাস্তুদেবতা লর্ড হক চমকে ও শিউরে বলেছিলেন—পেশাদার অধিনায়ক? হে ঈশ্বর, ইংলণ্ডের সে দুর্ভাগ্য যেন কোনো দিন না হয়! লর্ড হকের নিজের কাউন্টির খেলোয়াড়, ইংলণ্ডের প্রথম পেশাদার ক্যাপ্টেন লেন হাটন দীর্ঘ ২০ বছর পরে অস্ট্রেলিয়ার কাছ থেকে এসেজ পুনরুদ্ধার করলেন।—ক্রিকেটারের বউ সফরের সময় ধারে-কাছে থাকবে?—সর্বনাশ! কিন্তু ব্রাডম্যানের স্ত্রী কাছাকাছি থাকবার অনুমতি পেলেন। কারণ তিনি ব্রাডম্যান।

ভারতবর্ষ ক্রিকেট-ব্যাপারে সমাদরের সঙ্গে পুরোপুরি বিলায়েতী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। ক্রিকেট রাজার খেলা আর ভারতবর্ষ সাপ, সন্ন্যাসী ও রাজার দেশ। সুতরাং ভারতে 'প্রজা' ক্যাপ্টেন হয় কি করে? একজন রাজাকে (বড়, মেজ, ছোট, যে রাজাই হোক)

অতএব বিপক্ষ অধিনায়কের পাণিগ্রহণ করে সান্ধ্যভোজে কেক কাটবার সুযোগ দাও।

এদেশে ছেলের জন্য মেয়ে দেখতে গিয়ে পছন্দ হলে (পছন্দ যদি প্রগাঢ় হয়) বাপ তাকে বিয়ে করে ঘরে ফিরে আসে। ভিজিয়ানা-গ্রামের কুলীন জমিদার ভিজি ১৯৩৬ সালে ছিলেন নির্বাচক, সুযোগ বুঝে উঠে বসলেন বরাসনে অর্থাৎ অধিনায়কের আসনে। পাছে কেউ বরের হাত ধরে টানাটানি করে পেয়াদা রাখলেন জবরদস্ত। তাঁর নাম মেজর ব্রিটন জোন্স। যে যুগে মহামান্য ভারত-সম্রাটের রাজত্বে সিলভার জুবিলিতে ভারতের আঁধার ঘরে ডায়নামো বসিয়ে বিজলী জ্বলত, সে যুগে ভাইসরয়ের নিকট কর্মচারীর মত মাননীয় ব্যক্তি হলেন ভিজির রাজমন্ত্রী অর্থাৎ ১৯৩৬ সালে ইংলণ্ড সফরকারী ভারতীয় দলের কর্মাধ্যক্ষ!

অমরনাথকে সেবার গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হল ইংলণ্ড থেকে। ধাক্কা বলে ধাক্কা! অমরনাথ সেই ধাক্কায় এসে পৌঁছলেন সাত সমুদ্দুর তের নদী পেরিয়ে ভারতের উপকূলে। একমাত্র উপকথায় এমনটি পড়া যায়, যে উপকথা আরব দেশের নিজস্ব সম্পদ। আরব্য রজনীর আবুহোসেন আর দৈত্যেরা অঘটন ঘটাবার প্রতিভায় অনতিক্রান্ত ছিলেন। সেবার লজ্জা পেলেন।

অমরনাথকে আমি সমর্থন করছি না। কেউই করেন না। অমরনাথ অবশ্যই কিছু অন্যায় করেছিলেন। তাঁর ব্যবহার 'ইহাই ক্রিকেটের' নীতিকথামালার সঙ্গে অক্ষরে অক্ষরে মিলছিল না। অমরনাথ দোষ করেছিলেন। তিনি, গরীব কেরাণী যেমন করে চারদিন পরা সার্ট সযত্নে আলনায় টাঙিয়ে রাখে পঞ্চম দিন চালাবার বাসনায়, তেমনি করে হাতের ব্যাট ড্রেসিংরুমে সসম্ভ্রমে ঠেকিয়ে না রেখে রাজা মহারাজার কায়দায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন; তাও আবার রাজকুমার, রাজমন্ত্রীর চোখের সামনে। জঘন্য।

অমরনাথ দোষী। অমরনাথ দণ্ডনীয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের মার্জারী মহাশয়া এই সময় বলে উঠলেন—"চোরকে ফাঁসী দাও তাহাতেও আমার আপত্তি নাই, কিন্তু তাহার সঙ্গে আর একটি নিয়ম কর। যে বিচারক চোরকে সাজা দিবেন, তিনি আগে তিনদিন উপবাস করিবেন। তাহাতে যদি তাঁহার চুরি করিয়া খাইতে ইচ্ছা না করে, তিনি স্বচ্ছন্দে চোরকে ফাঁসী দিবেন।"

প্যারিসের প্রমোদশালা থেকে ফিরে এসে ভারতীয় দলের অধিনায়ক তাঁর পার্ষদসঙ্গে চমৎকৃত হয়ে শুনলেন, যে-সব অবাঞ্ছিত খেলোয়াড়দের মসীবর্ণ কুয়াসাচ্ছন্ন ইংলণ্ডের নিরানন্দ পথে ফেলে গিয়েছিলেন, তাদের কেউ কেউ সেখানেই যথাসম্ভব আনন্দ সংগ্রহে ব্যস্ত হয়েছিল।

আনন্দের স্বত্বাধিকার নিয়েই জগতে যত বিবাদ। ক্রন্দন কোলাহলে উৎকণ্ঠিত রাণী সুমিত্রাকে সান্ত্বনা দিয়ে বিদূষক দেবদত্ত বললেন—"শোন কেন মাতঃ? শুনিলেই কোলাহল।"

ভাগ্যে ভিজিগণ বাংলা জানেন না (জানেন নাক?), তাই বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ তাঁদের ব্যস্ত করেন না।

ব্রাডম্যান অস্ট্রেলিয়া-সফরে অধিনায়করূপে অমরনাথের আচরণের প্রভূত প্রশংসা করে বললেন, অমরনাথের মত লোকেরা যে কোনো দেশের শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রদূত। অমরনাথের মত দর্শনীয় খেলোয়াড় এবং আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের বিচিত্র ব্যবহারে ব্রাডম্যান বিস্মিত হয়েছেন। ১৯৩৬ সালে বিদায়-ধাক্কার পূর্বে অমরনাথ ৬১৩ রাণ (দলের সর্বাধিক) এবং ৩২টি উইকেট নিয়েছিলেন। এ রকম একজন মূল্যবান খেলোয়াড়কে কোনো অবস্থাতেই বাদ দেওয়া যায় কি না সন্দেহ, অন্ততঃ স্যার ডনের তাই বক্তব্য।

তাও বাদ দেওয়া হোক। ধন্য হোক ন্যায়ের মহিমা। কিন্তু শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের যদি যথেষ্ট 'বিশ্বাসযোগ্য কারণ' না থাকে?

ব্যাপার দেখে ক্রিকেটের বামন অবতার ব্রাডম্যান বিস্মিত।

চন্দ্রগুপ্ত নাটকে আছে—'সত্য সেলুকস, কি বিচিত্র এই দেশ!'

হায়, ব্রাডম্যানও যে বাংলা জানেন না।

ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড কর্তৃক দ্বিতীয়বার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের বিরুদ্ধে অমরনাথ মামলা দায়ের করলেন কলকাতা হাইকোর্টে। সব দেশেই হাইকোর্টের চূড়া মাটি ছাড়িয়ে অনেক উপরে উঠে ঈশ্বরের সিংহাসনের সিঁড়ি স্পর্শ করে রয়েছে। ধর্মাধিকারই মানুষের শেষ অধিকার। ধর্মাধিকরণ সেই ধর্মাধিকারের বারাণসী। সেখানে নত শির সকলে।

ক্রিকেটার কিন্তু ধর্মাধিকরণে দাবি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যেতে চায় না, তার নিজস্ব ধর্মবোধ এমনই প্রখর। ক্রিকেটারদের মহান সম্পদ 'ক্রিকেট আচরণ।' এই আচরণের দায়িত্ব খেলোয়াড় ও কর্তৃপক্ষ উভয় পক্ষেরই। যদি তা না হয়? অমরনাথ মামলা দায়ের করায় ভারতীয় ক্রিকেট-বোর্ড শান্তিবাদী ও আপোষমুখী হয়ে উঠল অবিলম্বে, ভারতীয় ট্রাডিশান মেনে।

অস্ট্রেলিয়ান সিড বার্ণসকে কিন্তু যথার্থই আদালতের ন্যায়বিচারের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়েছিল। সেই ইতিহাসই বলতে সুরু করেছিলাম।

সিড বার্ণসের প্রতি আমার পক্ষপাতের কারণ কি? প্রথম শ্রেণীর ব্যাটসম্যান হলেও তিনি নিশ্চয় সর্বযুগের প্রথমদের মধ্যে পড়েন না। তবে কি সেনসেসনের প্রতি আমার লোভ আছে?

আছে। কিন্তু সে উত্তেজনা একটি বিশেষ জাতের। ছেলে বয়স থেকে আমি রবিনহুডের ভক্ত। কুলদারঞ্জন রায়কে প্রণাম। যাঁরা আমার বাল্যকালকে মধুময় করে রেখেছিলেন, তিনি তাঁদেরই একজন। লেখক হিসেবে তাঁরা ক্রমিকভাবে—কৃত্তিবাস, কাশীরাম ও কুলদারঞ্জন। গ্রন্থরূপে রামায়ণ, মহাভারত ও রবিনহুড।

রবিনহুডের একজন অনুচরের নাম সিড বার্ণস। কোন জন? ঠিক জানি না। যদি আপনি রবিনহুডের ভক্ত পাঠক হন, জানলেও জানতে পারেন।

গল্প সুরু করা যাক।

পনের বছরের একটি ছেলে। ওরিলির বিরুদ্ধে ব্যাট করছে। ১৯৩৪ সালে ইংলণ্ড সফর করে ওরিলি অস্ট্রেলিয়ায় ফিরেছেন। ক্রিকেট-জগৎ মেনে নিয়েছে অবিসংবাদিতভাবে—ওরিলি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বোলার।

ছোকরা ব্যাটসম্যানটিকে বিশেষ কেউ চেনে না। তবে নিজের পল্লীতে খেলায় নাম আছে। বয়স অল্প হলে হবে কি, দারুণ আত্মবিশ্বাস। চলাফেরায় সেটা ফুটে ওঠে। নিজেকে জাহির করার দিকে ঝোঁক আছে। আত্মবিশ্বাসের পরিমাণ বয়সের পক্ষে অতিরিক্ত, সামান্য হাস্যকরও বটে।

ছেলেটি খেলল মন্দ নয়।

ওরিলি ড্রেসিংরুমে খুঁজে নিয়ে ছেলেটির পিঠ চাপড়ালেন,—বাঃ ছোকরা। বেশ খেলেছ।

ছেলেটি ঘটা ক'রে মাথা নোয়ালো। একগাল হেসে বলল,—তা ঠিক। আর তুমিও আজ বিকালের দিকে বল করেছ চমৎকার।

হো হো করে হেসে উঠলেন ওরিলি।

ছেলেটি থতিয়ে গেল। ভেবে পেল না হাসির কি আছে। 'যাদের বিরুদ্ধে আমি এ পর্যন্ত খেলেছি, তাদের মধ্যে এই লোকটির বলই সবচেয়ে ভাল। তা স্বীকার না করবার কি আছে?'

কথা বলার ও চিন্তা করার ঐ ভঙ্গি ছেলেটির নিজস্ব। তাতে বহু লোক হাসে। হাসবে। রেগে যাবে আরো অনেকে। পরিণত বয়সেও সে সম্পূর্ণ বুঝতে পারবে না তার কথায় বা আচরণে অদ্ভুত কোথায়?

সিড বার্ণসের জীবনের কমেডি এবং ট্রাজেডি দুইই এখানে। একটা অমার্জিত সত্যভাষিতা, ব্যক্তিবিবেচনাহীন লোকব্যবহার, সহজ দর্পমিশ্রিত সাহস, বালকোচিত আড়ম্বরের দিকে আকর্ষণ অথচ

সদয় সুভদ্র মনের নিষ্ঠাবোধ। এই চরিত্র মার খাবেই মুখোস-ঢাকা সমাজের হাতে। সমস্যার সুরু সেইখানে।

সমস্যাতরঙ্গে বিক্ষুব্ধ বার্ণসের বেগবান জীবননদী।

সমস্যার সূচনা—ধরা যাক, একেবারে আদিতে। বার্ণসের জন্ম তারিখ কি? বার্ণসের মা বলেন, ১৯১৯ সালের ৫ই জুন। বার্ণসের ধারণা,—১৯১৮র ৫ই জুন।

বার্ণস। 'সুতরাং আমার জীবনে একটি বিস্মৃত বছর আছে।'

বার্ণস ভূমিষ্ঠ হবার আগেই পিতার হল মৃত্যু। মা সংসারের হাল ধরলেন। তিনি দৃঢ় স্বভাবের হিসাবী মহিলা। সিড মায়ের কাছ থেকে টাকার মূল্য বুঝতে শিখল।

বার্ণসের দাদু নিউ সাউথ ওয়েল্‌সের ট্যামওয়ার্থে গাড়ী চালাতেন। তাঁর সঙ্গে বিখ্যাত ডাকাত থাণ্ডারবোল্টের পরিচয় ছিল। দাদু থাণ্ডারবোল্টের গুণমুগ্ধ ছিলেন, কারণ সে গরীবকে নির্যাতন করত না এবং বড়লোকের কাছ থেকে টাকা আদায় করত ভদ্রভাবে।

বার্ণস। 'এইভাবে আমার পরিবারের সঙ্গে গোড়ার দিকে প্রান্তরবাসী ডাকাতদলের সম্পর্ক ছিল।'

সিডের মা'র অনেকগুলি বাড়ী ছিল। ৭ বছর বয়স থেকে সিড ভাড়া আদায় করতে সুরু করল কমিশনের ভিত্তিতে। অল্প বয়সে হাতে পয়সা এল। সিড হিসেবী। টাকা জমাতে সুরু করল। তবে ভাল জামা কাপড় জুতোয় তার বড় ঝোঁক।

লেখাপড়া হোল না সিডের। সে হচ্ছে খোলামেলার মানুষ। পণ্ডিত হবার জন্য তার জন্ম নয়। এক ক্লাসে সে এত বছর স্থিতি করল যে, শিক্ষক মশায় উত্ত্যক্ত হয়ে বললেন,—'সিড, তুমি যদি নিজে ক্লাসঘরে আগুন না লাগাও, তাহলে এই ক্লাস ছাড়া তোমার পক্ষে সম্ভব হবে না।'

সিডের দাদা ক্রিকেট খেলত। সিডের রক্তেও ক্রিকেটের দোলা লাগল। দাদাকে এক নাগাড়ে বল করে যেতে হত, অমনি নয়,

কমিশনের ভিত্তিতে। বল করতে করতে ক্রিকেট পেয়ে বসল সিডকে। পাড়ার ছাওয়ালদের নিয়ে একটা দল গড়ে ফেলল। ছেলেদের মধ্যে সিড অর্থশালী। তার নিজের ব্যাটবল। ছেলেরা তাকে রীতিমত সমীহ করে। ফিস্‌ফিসিয়ে বলে, ওর সঙ্গে ঝগড়া করিস না, তাহলে ব্যাটবল কেড়ে নেবে। ব্যাটিংয়ে অন্য ছেলের যখন এক ইনিংস, সিডের তখন দুই।

মুশকিলে পড়লেন মিস্টার আর মিসেস সিমনস্‌। সিডের দলের ক্রিকেট-পিচের অফের দিকে পড়েছে তাঁদের বাড়ী। বাড়ীর কাঁচের জানলা প্রায়ই ভাঙতে লাগল অফের ওভার বাউণ্ডারীতে। রেগে মেগে পুলিশে খবর দেওয়া সিমনস্‌দের নিত্যকর্ম হয়ে দাঁড়াল। সিডেরও কম ক্ষতি হল না তাতে। চিরকালের জন্য আপেক্ষিক দুর্বলতা এসে গেল অফের মারে।

সিডের দলের সঙ্গে অন্য পাড়ার ছোকরাদের মারামারি চলতে লাগল নিয়মিত। পুলিশ অফিসে সিমনস্‌ দম্পতির ফোনের আর্তনাদ থামল না। কথা কাটাকাটি হয়ে গেল সিডের সঙ্গে স্কুলের স্পোর্টস মাস্টারের। পাড়ার মেয়েরা সিডকে ডাকতে লাগল গভর্নর জেনারেল বলে বারেবারে।

কিভাবে সে গভর্নর জেনারেল, সিড তত ভেবে দেখার জন্য ব্যস্ত হত না। ভাল লাগত মেয়েদের মুখে সম্ভ্রমের মধুর ডাকটি।

এই সময় একদিন সিড বার্ণস জীবনে প্রথম বেড়া টপকাল। এই বেড়া টপকানোই তার জীবনের রূপ এবং রূপক।

সিডের বয়স তখন তের। সে বয়সে অস্ট্রেলিয়ান ছোকরাদের চামড়ার কোট ও চামড়ার টুপির প্রতি অপরিসীম আসক্তি। বড় ভাই হোরি ক্রিকেট ছেড়ে ক্ষেপে উঠেছে মোটর সাইকেল নিয়ে। অবজ্ঞার উদারতায় নিজের চামড়ার টুপি দিয়ে দিল সিডকে। সিড সেই মহাভাগ্যের টুপি পরে পিটারস্থাম দলের হয়ে খেলতে গেল।

একটু বড় খেলায় এই প্রথম সিডের পল্লীর বাইরে যাওয়া।

সবাই অপরিচিত। ড্রেসিংরুমের আবহাওয়া মনঃপূত নয়। সিড চতুর্থ খেলোয়াড়। প্রথম উইকেট পড়ার পর প্যাড পরে পিছনের দরজা দিয়ে সে বাইরে চলে গেল, বন্ধুদের মাঝখানে। যখন আর একটি উইকেট পড়ল, তখন সেখান থেকেই বেড়া টপকে ছুটল মাঠের মধ্যে। সিডের নিজের দলবল প্রচুর সম্বর্ধনা জানাল। পূর্ণ আত্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে উইকেটে দাঁড়িয়ে টুপি একটু উঁচু করে 'বাউ' করল সিড বার্ণস।

দুর্ভাগ্য। প্রথম ওভারে মাত্র ৪ রান করার পরে ছিটকে গেল উইকেট। বিমর্ষভাবে প্যাভিলিয়ানে ফেরা মাত্র তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ক্যাপ্টেন,—অসভ্য কোথাকার! মাঠে ঢোকার রীতি জান না? প্যাভিলিয়ান থেকে উইকেটে যেতে হয়, এ জিনিস শিখবে কবে?

সেই শোচনীয় বিকালে সিডের বন্ধুরাও তাকে ত্যাগ করল। মাথা থেকে টুপি খুলে মনমরা ভাবে সে বাড়ীর দিকে পা বাড়াল। সিডের জীবনে বেড়া টপকানোর এই সুরু, আরো কত কাহিনী আছে, ক্রমে শোনা যাবে।

সিড ক্রমেই খেলায় উন্নতি করছে, একজন উঠতি প্রতিভাবান খেলোয়াড় যেমন করে থাকে। ভালো ভালো স্কোর। খেলায় উন্নতির সঙ্গে ব্যক্তিপূজায় কিন্তু তার মন গেল না, যদিও সেটাই ছিল রীতি।—'শুধু নাম শুনে কাউকে সমীহ করতে প্রস্তুত নই'—সিড সোজা জানিয়ে দেয়। একজন পরামর্শ দিয়েছিলেন ক্রিকেটের বই পড়তে। সিড বলল, লেখকেরা নিজের স্টাইলের কথাই বইতে লিখেছে। আমারও একটা নিজের স্টাইল আছে। তাছাড়া, সে যোগ করে দেয়, আমার একটা নিজের মনও আছে।

মাঠে মানুষ-প্রমাণ আয়না দাঁড় করিয়ে সিড বার্ণস খেলা শেখে। আয়না দেখে খেলা শেখা যায়, আবার নিজেকেও দেখা যায়। সিড খুসী হয়ে ওঠে তাতে।

সিড বার্ণস বড় হয়েছেন। পার্কস সহরে খেলতে যাবেন পিটার-স্থামের এ গ্রেড দলের হয়ে। ইতিমধ্যে একটা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড গাড়ী হয়ে গেছে নিজের। বার্ণস বন্দোবস্ত করে ফেললেন, কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে ঐ গাড়ীতেই পার্কস সহরে যাবেন। তেলের খরচ বন্ধুদের। গাড়ীর বাকি খরচ বার্ণসের। খুব ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা। পরিবহন কর্তৃপক্ষ হঠাৎ কোথা থেকে খবর পেয়ে বলল, যাত্রী বইছ, ট্যাক্স দিতে হবে।

পার্কস সহরের মেয়র সম্বর্ধনা জানালেন। পিটারস্থামের অধিনায়ক ডাডলে সেডন উত্তরে বললেন, আমাদের মধ্যে একজন আছেন যিনি আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়,—ঠিকভাবে বলতে গেলে,—যিনি শীঘ্রই আন্তর্জাতিক খেলোয়াড় হবেন। সেডন বার্ণসের নামোল্লেখ করেননি। বার্ণস বুঝলেন, তিনি ছাড়া কেউ নন। উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নোয়ালেন।

১৯৩৬-৩৭ সালে সিড বার্ণস প্রথম একজন মানুষ পেলেন, যাকে দেখে টুপি খোলা যায়। ডন ব্রাডম্যান। 'আমি বিশেষভাবে ডন ব্রাডম্যানের দিকে আকৃষ্ট হলাম। লক্ষ্য করলাম, তিনি সেঞ্চুরী করুন বা শূন্য করুন,—কাগজে শিরোনামা পাচ্ছেন। এই হল ব্যক্তিত্ব। এর প্রতিই আমার ঈর্ষামিশ্রিত লোভ।'

ঐ বছর ইংলণ্ড খেলতে এল অস্ট্রেলিয়ায়। নিউ সাউথ ওয়েলসের কোচ জর্জ সিড বার্ণসকে ইংরেজ খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে নেটে বল করতে বললেন। সিড বোলিং করলেন বটে কিন্তু পরে জর্জকে বললেন, দেখুন, আমি কিন্তু ভাল করে বল করিনি। ওদের সব কায়দা দেখিয়ে দেব কেন? শীগগির আমাকে তো এদের বিরুদ্ধে খেলতে হবে।

জর্জ অট্টহাস্য করে উঠলেন।

কোনো হাসি সিড বার্ণসকে দমাতে পারে নি। কোন কিছুই পারে না। শরীরের শক্তিবৃদ্ধির জন্য ব্যায়াম করতে করতে সিড

নিজের মনে বলতে থাকেন, 'প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে শীঘ্রই আমাকে সেঞ্চুরীর পর সেঞ্চুরী করে যেতে হবে। আমার অফুরন্ত শক্তি চাই। ব্রাডম্যান একটা সেঞ্চুরী করে সন্তুষ্ট থাকেন নি, আমিও থাকব না।'

১৯৩৮ সালে ইংলণ্ডগামী অস্ট্রেলিয়া দলে নির্বাচিত হলেন আঠারো বছরের সিড বার্ণস, দলের বেবি।

যত্ন করে সিডনি থেকে চমৎকার একটা টুপি কিনেছেন। দলের ম্যানেজার সেটা দেখে মুখ বেঁকিয়ে বললেন,—'আঃ মোলো, কোথা থেকে জোটালে টুপিটা। ছুঁড়ে ফেলে দাও।'

আঠারো বছরের যৌবনে আতিশয্যই স্বাভাবিকতা। সিড খুব ভাল খেলবে, ব্রাডম্যানের মত। তার জন্য ব্যায়াম দরকার। জাহাজে ভোরের কুয়াশার মধ্যে লাফাতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে গেলেন। বাঁ হাতের কব্জিতে লাগল কঠিন মোচড়। দারুণ যন্ত্রণা হতে লাগল। জিব্রালটারের আগে কারো কাছে কথাটা ভাঙলেন না, যদি মাঝপথে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। ইংলণ্ডে পৌঁছে ডাক্তারী পরীক্ষায় জানা গেল, সওয়া তিন মাসের জন্য নিশ্চিন্ত, কব্জির হাড় ভেঙেছে।

অসুখী সিডের করবার কিছু নেই। ব্রাডম্যানের সমান হব এই স্বপ্নের কব্জি ভেঙে গেছে। কি করেন, বন্ধু ব্যাডককের মুভি ক্যামেরা নিয়ে ঘুরে বেড়ান। ক্যামেরা-তত্ত্ব আয়ত্ত হয়ে যায়। বেশ লাগে। নাইট ক্লাব যার ভাল লাগে না, মদে যে অভ্যস্ত নয়, কখনো টান দেয়নি সিগারেটে, একটা 'হবি' পেয়ে যেতেই সে সেটাকে দুহাতে—গোটা ও ভাঙা হাতে—প্রবল আগ্রহে আঁকড়ে ধরল। এই হবি'র ভবিষ্যৎ যদি সে জানত।

দীর্ঘ তিন মাস পরে ২৯শে জুন, ১৯৩৮, যখন বার্ণস প্রথম খেলতে নামলেন তখন দলের খেলোয়াড়েরা বার্ণসের থেকে বহু যোজন এগিয়ে। 'এই ট্যুরে ব্রাডম্যানের পিছনে ধাওয়া করার ইচ্ছে ছিল আমার। কিন্তু তিনি ১৫৯২ রান করে ফেললেন আমি সুরু করার

আগেই। যে কোনো লোককে ধরবার পক্ষে এটা একটা বাড়াবাড়ি রকম ব্যবধান। আর সেখানে ব্রাডম্যান। নিজেকে বোঝালাম, আমাকে দ্বিতীয় স্থানেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে অগত্যা। ব্রাডম্যান আরো ৮৩৭ রান করলেন, আমি করলাম ১০৮০। সুতরাং যদি আমি নিজেকে ব্রাডম্যানের পাশে দাঁড় করাই, সেটা নিশ্চয় বৃথা গর্ব হবে না।'

রাজা রাণী ইয়র্কশায়ার ভবনে অস্ট্রেলিয়ান দলকে আপ্যায়িত করলেন। রাজা, রাণী ও রাজকুমারীর কি সুন্দর ব্যবহার! বার্ণস মুগ্ধ হন। সব চেয়ে মুগ্ধ হন রাজার পোষাকে। এমন চমৎকার কাটের স্যুট আর দেখেন নি। রাজার দলবলের একজনকে বার্ণস একান্তে জিজ্ঞাসা করেন, রাজার স্যুট কোথায় তৈরী হয় জানেন নাকি? তিনি হাঁ করে থাকেন, উত্তর দেন না।

ইংলণ্ডে কয়েকটি পোষাক তৈরী করে ফেললেন বার্ণস। নাম হয়ে গেল 'পোষাকী ক্রিকেটার' বলে। সফরের শেষে যখন বাড়ী ফিরলেন, তাঁকে দেখে তাঁর মা বা ভাইদের কি অবাক চাউনি। 'মনে হয় আমাকে একটা ডিউকের মত দেখাচ্ছিল। সে রকম আমি অনুভবও করছিলাম।' প্রচুর আত্মতৃপ্তির সঙ্গে বার্ণস ভাবতে থাকেন।

ইংলণ্ড থেকে ফিরে অস্ট্রেলিয়ায় বার্ণসের ব্যাটিং-সাফল্য হল অভূতপূর্ব। পরপর চলল—১৪৪, ১০৮, ১৩৩, ১৩১, ১৩২, ১৮৫, ৫১। 'এইটেই আমার ক্রিকেট-জীবনের সবচেয়ে ধারাবাহিক ব্যাটিং-সাফল্য। বল বড় দেখতাম। চরম আত্মবিশ্বাস এসেছিল। জীবনের এ একটা সুন্দর সময়, যখন সব কিছু স্বচ্ছন্দে চলছে। পৃথিবীর চূড়ায় অবস্থান। এই সময়ই যা কিছু করে নিতে হয়। কারণ ব্যর্থতা আসতে পারে যে কোনো সময়। One can drop from hero to zero in a very few balls.'

বারুদের কৃষ্ণপক্ষ এল পৃথিবীতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সবুজ মাঠ

থেকে সরিয়ে বার্ণসকে পুরে দিল ধূসর সেনানিবাসে। সেখানে বন্ধুত্ব হোল অস্ট্রেলিয়ার গলফ চ্যাম্পিয়ান নরম্যান ভন নিডার সঙ্গে। আগুনের ধারে বসে গল্প করার সময় ভন নিডা তাঁর জীবনদর্শনকে প্রবেশ করিয়ে দিলেন সিড বার্ণসের মধ্যে। জীবনে প্রচার চাই। গ্ল্যামার চাই। সাধারণের মনকে কাড়তে হবে। যার জীবনে রঙ নেই তার বাঁচার অর্থ কি? ভন নিডার কাছে বার্ণস শিখলেন, হলিউডের বৈশিষ্ট্য প্রচারে, স্পোর্টসের হবে না কেন?

সেনানিবাসে বার্ণসের হল বন্ধুলাভ। তার আগে আরো একটি বড় লাভ হয়েছিল, পত্নীলাভ। বার্ণস তখন কুস্তীর দিকে আকৃষ্ট হয়েছেন, অলিম্পিক কুস্তিগীর এডি স্কার্ফের সঙ্গে বড় দোস্তী। সে ভরসা দিয়েছে, বার্ণসের শরীর এবং সামর্থ্য কুস্তীর উপযোগী। বার্ণস কিছু কিছু আপোষের কুস্তী লড়ছেন। একদিন তিন কুস্তিগীর ফিরছেন, মাঝপথে একটা হোটেলে স্কার্ফ থামলেন। সেখানে ডিনার নাচ চলছে। গম্ভীর চেহারার বাপমা'র সঙ্গে একটি মেয়ে বসে। স্কার্ফ তাঁদের গাম্ভীর্যের বহর দেখে বাজি ধরল, যদি বার্ণস ঐ লালচুল মেয়েটির সঙ্গে নাচতে পারে, তাহলে আজকের খাওয়ার খরচ দেবে স্কার্ফ। সাহস সঞ্চয় করে বার্ণস উঠে গিয়ে তার বাপমা'র কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে রাঙাচুল মেয়েটিকে নাচে ডাক দিলেন। বাপ-মা'র সম্মতি পেয়ে সেদিন যে মেয়েটি বার্ণসের নৃত্যসঙ্গিনী হয়েছিল, বার মাস পরে গির্জার সম্মতিতে তাকেই বার্ণস পেলেন জীবনসঙ্গিনী-রূপে। মেয়েটির নাম এলিসন। তার বাবা কেনেথ এডওয়ার্ড সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের থিওলজির অধ্যাপক।

যুদ্ধের পর খেলতে নেমে বার্ণস আবার যুদ্ধপূর্ব সাফল্যের সূত্রটি তুলে নিলেন—পরপর স্কোর চলল—২০০, ১৪৬, ১৫৪, ১০২। যুদ্ধপূর্ব হিসেব ধরলে ১২টি ম্যাচে ১১টি সেঞ্চুরী এবং একটি ৫১ রানের ব্যর্থতা।

১৯৪৬-এর অক্টোবরে এম সি সি আসবে অস্ট্রেলিয়ায়। সাধারণভাবে সকলের ধারণা, হয়ত ব্রাডম্যানের ক্রীড়াজীবন শেষ হয়ে গেছে। হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে বার্ণস কামনা করতে লাগলেন, মহান ডনের সমাপ্তি যেন এখনি না হয়। 'ব্রাডম্যানের কাছে আমার আরো কিছু শেখার আছে। একমাত্র ব্রাডম্যানই আমাকে শেখাতে পারেন।'

বার্ণসকে জিজ্ঞাসা করা হল, অস্ট্রেলিয়ার ওপেনিং খেলোয়াড়রূপে খেলতে রাজী আছেন কিনা? অনেক চিন্তার পর বার্ণস রাজী হলেন। এতে যদিও খেলার দর্শনীয়তা কমে যাবে, তবু ড্রেসিং-রুমে প্রতীক্ষার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি। "তাছাড়া ক্রীড়াজগতে ব্রাডম্যানের প্রত্যাবর্তন হয়েছে! তাঁর পরে খেলতে নামার চেয়ে আগে নামা অনেক ভাল। শ্যাম্পেনের পর সাদা বীয়ার চলে না।"

১৯৪৬ ব্রিসবেন টেস্টে সূচনা করে বার্ণস ৩১ রানে আউট হলেন এক আশ্চর্যজনক ক্যাচে। খেলার শেষে ড্রেসিংরুমে ব্রাডম্যান বললেন—

'তুমি ভাল খেলেছ। কিন্তু ওটা ওপেনারের খেলা নয়। তুমি সব সময় রান করার খোঁজে ছিলে। ওপেনাররূপে আউট না হওয়াটাই তোমার প্রথম চেষ্টা হওয়া উচিত। সুন্দর সূচনা সবচেয়ে মূল্যবান। আক্রমণের ধার পড়ে যাওয়ার পরে যারা আসবে, তারা রান তুলবে স্বচ্ছন্দে। আমার ওপেনারের কাছে আমি যা সবচেয়ে বেশী চাই, তা হচ্ছে ধৈর্য—প্রচুর প্রচুর ধৈর্য।'

বার্ণস ভাবলেন, ব্রাডম্যানের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করব। অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট বলতে মহান ডন। কেন্দ্র-শক্তির খুঁটিতে নিজেকে বাঁধতে লজ্জা নেই।

সিডনির দ্বিতীয় টেস্টে এমন একটি ব্যাপার ঘটল, যা ক্রিকেট ইতিহাসে 'অশোভনতার' প্রভূততম অখ্যাতি পেয়েছে। ঘটনাটি বার্ণসের চরিত্রকেও প্রকাশ করেছে সম্পূর্ণভাবে। একটু বিস্তৃত বর্ণনা দরকার।

সিডনি টেস্টে টসে জিতে ইংলণ্ড প্রথম ব্যাট করে করল ২২৫। দ্বিতীয় দিনে আসন্ন বৃষ্টির আচ্ছন্ন আলোয় অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস সুরু হল। মোরিস ও বার্ণস। অল্প রানে ফিরে গেলেন মোরিস। ব্রাডম্যানের বদলে এলেন জনসন। বৃষ্টি পড়তে লাগল। খেলা বন্ধ হল ও সুরু হল কয়েকবার। ভিজে পিচ, বল পিছলে যাচ্ছে। পিচ এখনো মারাত্মক নয়। কিন্তু শুকুতে সুরু করলেই তা আঠালো হয়ে ভয়াবহ রূপ নেবে। আবার বৃষ্টি, খেলা বন্ধ। ড্রেসিংরুমে খেলোয়াড়েরা হাজির।

ব্রাডম্যান। সিড, যেভাবে হোক তোমাকে খেলে যেতে হবে। ঘাড় গুঁজে খেলে যাও। প্রথম সুযোগেই কম আলোর বিরুদ্ধে আবেদন জানাবে।

বার্ণস। এতে সুবিধে কি? রান তো উঠবে না।

ব্রাডম্যান। আমরা সুযোগ নিচ্ছি। তৃতীয় দিনে ভাল আবহাওয়া পেলেও পেতে পারি।

বার্ণস কম আলোর বিরুদ্ধে আবেদন জানাতে সুরু করলেন। প্রতি রানের পরে আবেদন জানানর অধিকার আছে ব্যাটসম্যানের। আবেদনের পরে মাঠের মাঝখানে আসতে হবে আম্পায়ারদের। তারপর উপরে নীচে তাকিয়ে সিদ্ধান্ত। সিদ্ধান্ত হল—আলো ঠিক আছে, খেলা চলবে। খেলা সুরু হল। আবার আবেদন। সুতরাং আম্পায়ারদের মধ্য-মাঠে আগমন, পর্যবেক্ষণ এবং সিদ্ধান্ত—খেলা চলবে। আবার খেলা সুরু, আবার আবেদন। এমনি চলল বারংবার। ক্ষেপে উঠল দর্শকেরা। চেঁচাতে লাগল, ভ্যাঙাতে লাগল তারস্বরে। একবার আবেদনের পরে আম্পায়াররা মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বিবেচনা করছেন—হ্যামণ্ড এগিয়ে এলেন বার্ণসের দিকে।

হ্যামণ্ড। করছ কি বার্ণস? খেলতে দিচ্ছ না কেন?

বার্ণস। বিচলিত হয়ো না হ্যামণ্ড, মাঠে এখনো বহু ঘণ্টা তোমাদের কাটাতে হবে।

আবেদনের পর আবেদন চলেছে, প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে, অবশেষে গৃহীত হল। বার্ণস মাঠ ছেড়ে প্যাভিলিয়ানে ফিরছেন। চেঁচিয়ে গালাগালি করতে লাগল দর্শকেরা। এমন কি সদস্যেরা পর্যন্ত। ক্ষোভে ও ব্যঙ্গহাস্যে ভরে উঠল বার্ণসের মুখ।

বার্ণস। আদেশ পালনের পুরস্কার!

ড্রেসিংরুমে শ্রান্ত বিরক্তভাবে প্রবেশ করছেন, সাদরে গ্রহণ করলেন ব্রাডম্যান।

ব্রাডম্যান। চমৎকার সিড। তোমার আজকের কুড়ি রান অনেক সেঞ্চুরীর চেয়ে মূল্যবান।

পরদিন শনিবার। জনসন আউট হয়ে গেলেন গোড়াতেই। সূর্য উঠেছে। হ্যাসেট এলেন ব্যাট করতে। বার্ণস অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন, ব্রাডম্যান কোথায়?

হ্যাসেট আউট। এবার নিশ্চয় ব্রাডম্যান। কোথায়! কাঁধ ঝাঁকিয়ে, চুল দুলিয়ে এলেন মিলার। কি আশ্চর্য্য, ব্রাডম্যান কি আসবেন না? ব্রাডম্যান ধৈর্য ধরতে বলেছেন বার্ণসকে। ধৈর্যের কি সীমা নেই?

পাহাড়ের উপরকার ছোকরারা চীৎকার করে মাঠ ফাটিয়ে ফেলছে। গতকাল আলোর কুশ্রী আবেদন, আজ ব্যাট না তোলা। ছেলেগুলো পাবলে বার্ণসকে ছাড়িয়ে খায়। যা বলে বলুক। বার্ণসকে ধৈর্য ধরতে হবে। তাকে একটা কাজ করতে বলা হয়েছে। ব্রাডম্যান বলেছেন। ব্রাডম্যানের কাজ। ব্যাট ধরে দাঁড়িয়ে থাকবেন বার্ণস।

মিলার আউট। চার উইকেটে ১৫৯। এখনো ব্রাডম্যান আসবেন না? আসছেন, অবশেষে। বড় ক্লিষ্ট গতি। বার্ণস এগিয়ে যান।

ব্রাডম্যান। আমি বড় অসুস্থ, সিড। পায়ের পেশীর বেদনাটা কমেনি। আবার পেটে গ্যাসট্রিকের যন্ত্রণা সুরু হয়েছে। তোমার উপরই ভরসা। তুমি এতক্ষণ বাঁচিয়েছ, এখনও তোমাকে বাঁচাতে হবে।

বার্ণস। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব, স্কিপার।

অপরাহ্ণশেষে ব্রাডম্যান ও বার্ণস ফিরে গেলেন প্যাভিলিয়ানে, অপরাজিত।

সোমবার সকালে দ্রুত গতিতে বার্ণসের মোটর মাঠে এসে প্রবেশ করল। ড্রেসিংরুমের পাশেই হ্যামণ্ডের সুপরিচিত জাগুয়ার গাড়ী। তার পাশে নিজের গাড়ী রাখলেন। কাপুড়ে ক্রিকেটার বার্ণসকে বিরাট একটি ব্যাগ নিজে বয়ে নিয়ে ড্রেসিংরুমে যেতে হবে। তাই যত কাছাকাছি গাড়ী লাগানো যায় তত সুবিধা। বার্ণস নামতে যাচ্ছেন কনস্টেবল এসে বাধা দিল। এখানে গাড়ী রাখা চলবে না, শ'খানেক হাত দূরে গাড়ী রাখার জায়গা।

বার্ণস। সে কি? এই তো হ্যামণ্ডের গাড়ী রয়েছে। তাছাড়া আমি এই খেলায় খেলছি। আধ ঘণ্টার মধ্যে আমাকে ব্যাট করতে নামতে হবে। এর মধ্যে কাপড় বদলে একটু প্র্যাকটিস করা দরকার। বেশী দূর হলে এত বড় গীয়ার নিজে বয়ে নিয়ে যাব কি করে?

কনেস্টবল। তা আমি জানি না। আপনাকে গাড়ী সরাতে হবে।

বার্ণস। যদি আমাকে গাড়ী সরাতে হয়, তার আগে হ্যামণ্ডকে গাড়ী সরাতে বল না কেন?

কনস্টেবল। হ্যামণ্ডের কথা চিন্তা করার দরকার নেই। আমি বলছি, আপনি গাড়ী সরিয়ে রাখুন।

বার্ণস। ঠিক আছে, গাড়ী সরাব যদি সার্জেন্ট ইনচার্জ সরাতে বলে। এখন আমি চললুম প্র্যাকটিস করতে।

পোষাক বদলে নেটে চলে গেলেন বার্ণস। নেট থেকে ফিরলেন যখন খেলা সুরু হতে মাত্র মিনিট দশেক বাকি। কনস্টেবলটি পথ আগলে দাঁড়িয়ে। এগিয়ে এসে বার্ণসের হাত বাগিয়ে ধরল। বলল, লাইসেন্স দাও। তোমাকে চালান দেব।

বার্ণসকে চালান দেবে! ব্যাটা, খেলার মেজাজ নষ্ট করে দিতে চায়? খেলতে নামবার সময় বাধা দেবার তুই কে? বার্ণস এক ধাক্কায় নিজেকে ছাড়িয়ে নেন। ধাক্কার চোটে কনস্টেবল ছিটকে পড়ল

প্রেসম্যানের উপর, প্রেসম্যান পড়ল ক্যামেরাম্যানের উপর, ক্যামেরা-ম্যানের ক্যামেরা দুম করে আছড়ে পড়ল কনক্রীটের পথে। একটা গোলমাল হৈ চৈ। সকলকে ঠেলে বার্ণস ব্যাট নিয়ে মাঠে নামলেন। গাড়ী যেখানে থাকার সেখানে রইল।

ব্রাডম্যান ও বার্ণস মাঠে নামছেন।

ব্রাডম্যান। আমার শরীর এখনো সারেনি সিড। আমার উপর নির্ভর কোরো না। আবার বলছি, তুমিই ভরসা।

বার্ণস। আমি চেষ্টা করব, স্কিপার।

খেলার গতি দ্রুত ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। ব্রাডম্যান ক্রীজে থাকা মানে সব কিছুর চেহারা বদলে যাওয়া। অসুস্থ ব্রাডম্যানও বিদ্যুৎগর্ভ। রান উঠছে। ওভারের মাঝখানে বার্ণসকে নানা কথা বলছেন ব্রাডম্যান ঃ কে কি রকম বল দেয়; কার মনে কি আছে; কখন আক্রমণ করতে হবে; আত্মরক্ষার প্রয়োজন কখন। বার্ণস শুনছেন। শিখছেন।

বার্ণস,—ব্রাডম্যান বললেন,—আজকে তোমার কাঁধে অস্ট্রেলিয়া দল। Barnes for reliability—মনে রেখো।

কথাটা ব্রাডম্যান বারবার বলছেন। শুনতে শুনতে সত্যি মনে হতে লাগল বার্ণসের। চীৎকার করুক দর্শক, ভ্রূকুটি করুক বিপক্ষ, বিরক্ত হোক বোলার—ব্রাডম্যান বলেছেন, বার্ণসের কাঁধে অস্ট্রেলিয়ান দল। বার্ণস টলবে না।

বার্ণস সেঞ্চুরী করলেন। এবার স্বস্তি। দলের রানসংখ্যা ভদ্র রূপে পৌঁছেছে। হাত খুলে খেলা যাক। গত দুদিন ধরে যথেষ্ট বিরক্ত করা গেছে দর্শকদের। তাদের পয়সার দাম দেওয়া হয়নি। এখন একটু আনন্দ দান করা খেলোয়াড়ের পক্ষে ন্যূনতম কর্তব্য। বার্ণসের ব্যাট থেকে বল পর পর ছিটকে গেল বাউণ্ডারীতে।

ওভারের শেষে ব্রাডম্যান বার্ণসের কাছে এগিয়ে এলেন। স্থির শান্তভাবে তাকালেন। চোখে চোখ রেখে বললেন—বার্ণস হল নির্ভরতার প্রতীক—মনে রেখো সিড।

বার্ণস ফিরে গেলেন ক্রীজে, পুরোনো দায়িত্বে। কপাট-চওড়া ব্যাটে আঘাত খেয়ে বল মুখ থুবড়ে পড়ল ক্রীজের উপর। উইকেট-কীপার এগিয়ে এসে বল কুড়িয়ে তুলল। 'নির্ভরতার প্রতীক' ক্লান্তভাবে নিজেকে বোঝালেন, দলের প্রয়োজনে, দলের অধিনায়কের প্রয়োজনে তোমাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতি কুশ্রী ইনিংস খেলে যেতে হবে। খেলতেই হবে। তার মধ্যে, একটু সান্ত্বনা পেলেন এই কথা ভেবে—এমন শ্রীহীন আরও একটি ইনিংস তিনি দেখেছেন—১৯৩৮-এ কেনিংটন ওভালে হাটনের ১৩ ঘণ্টায় ৩৬৪ রান।

ব্রাডম্যান অসুস্থ ছিলেন। উরুর মাংসপেশীতে টান, পেটে অম্লবেদনা। সুতরাং ২৩৪ রানের বেশী এগুতে পারলেন না। বার্ণস অবাক হয়ে দেখলেন, প্যাভিলিয়ানের দিকে ব্রাডম্যান রীতিমত দৌড়ুচ্ছেন। নিজের মনে বার্ণস বিড় বিড় করে বকতে লাগলেন,—হা ভাগ্য! যদি তুমি আমার মারের সময় এই রকম ভাবে উইকেটের মধ্যে দৌড়ুতে তাহলে এতক্ষণে হাটনের রেকর্ড আমার পকেটে। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন বার্ণস, হাটনের বরাত ভালো!

দলের দায়িত্ব ব্রাডম্যান নেননি। দ্রুত রান তুলে বার্ণসকে ছাড়িয়ে যেতে পেরেছেন। বার্ণস কিন্তু খুব পেছিয়ে ছিলেন না। চমৎকার মার মেরে শীঘ্রই ব্রাডম্যানের রানের কাছে পৌঁছে গেলেন। জনতা খুবই চেঁচাচ্ছে। এবার খুশীতে। বার্ণসের দোষ তারা প্রায় ভুলে গেছে। অনেক, অনেক কিছু পেয়েছে তারা। দুটো ডবল সেঞ্চুরী একসঙ্গে। পঞ্চম উইকেটের ৪০৫ রানের বিশ্বরেকর্ড। অস্ট্রেলিয়ান দর্শকদের দেশপ্রীতির প্রত্যাবর্তন ঘটেছে। উল্লসিত হয়ে তারা নিজের হাতে হাত চাপড়ে বার্ণসের পিঠ চাপড়াতে লাগল।

বার্ণস ব্রাডম্যানের রানে পৌঁছে গেলেন, ২৩৪। আর একটি মাত্র রান, তাহলেই সিডনি মাঠে অস্ট্রেলিয়ার রেকর্ড বার্ণসের একার পকেটে আসে। আগে ছিল সিডনি গ্রেগরীর ২০১ রান। ব্রাডম্যান আজ সেটি ভেঙেছেন। তারপরে বার্ণস ব্রাডম্যানের সমান হয়েছেন।

এই মুহূর্তে সেটি ভেঙে দিতে পারেন। হাত নিসপিস্ করছে। রক্তের মধ্যে আরো রানের—রেকর্ড ভাঙার ক্ষুধা। বোলারদের মনোবল নষ্ট, আউট হবার সম্ভাবনা নেই। আরো রান, অনেক রান, বড়ো রেকর্ড— তালে তালে বাজতে থাকে বার্ণসের মনের ছন্দে।

একটা নিতান্ত সোজা বলকে বার্ণস সোজা তুলে দিলেন উঁচুতে তারপর কোনোদিকে না চেয়ে পূর্ণ তৃপ্তি ও আনন্দের সঙ্গে প্যাভিলিয়ানের দিকে চলতে সুরু করলেন।

সবিস্ময় চীৎকার ও হাততালিতে মাঠ ফেটে পড়ল। অদ্ভুত। নিজের ইনিংস ছুঁড়ে দিয়ে চলে গেল।

ঠিক করেছি—প্যাভিলিয়ানের দিকে গতিশীল বার্ণসের মনে বিচিত্র পুলক। ডন তোমাকে আমি পূজো করি। তুমি আমাকে অনেক শিখিয়েছ। তোমার আমার মধ্যে অনেক জিনিসে মিল আছে। আমার ক্ষেত্রে কোনো অবিচার করা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমাদের রেকর্ড একসঙ্গে, ঠিক একরূপে থাক রেকর্ড বুকে—ডন ব্রাডম্যান ২৩৪, সিড বার্ণস ২৩৪।

ডন, তোমাকে আমি পূজো করি—ড্রেসিংরুমে প্রবেশের সময় এই কথাটাই আচ্ছন্ন করে আছে বার্ণসের মন। ব্রাডম্যান তখন ড্রেসিংরুম ফাটাচ্ছেন, আনন্দে নয়, উরু থেকে আঠালো ফিতে জোর করে খুলে নেওয়া হচ্ছে—তার যন্ত্রণায়। বার্ণস যেতেই তার দিকে হেসে তাকালেন ডন।

ব্রাডম্যান। বাহবা 'ব্যাগা,' অস্ট্রেলিয়ার জন্য তুমি বিরাট কাজ করেছে।

বার্ণস। তুমিও কিছু কম করান।

বার্ণস ফিরবেন হোটেলে। গাড়ীতে উঠতে যাবেন—পুরোনো জায়গাতেই গাড়ী দাঁড় করান আছে। একজন এগিয়ে এসে গাড়ীর দরজা খুলে দিল।

কে, পুরোনো কনেস্টেবলটা—না?

বার্ণস গোলযোগের নায়ক হয়ে উঠলেন এরপর। সে গণ্ডগোলের বিস্তৃত ইতিহাস দিয়ে লাভ নেই। কেবল একথা বললেই যথেষ্ট হবে, সচ্চরিত্র ক্রিকেট-বোর্ডের সাদা বোর্ডকে বার্ণসের ধারাবাহিক অশিষ্ট কীর্তি কালো আঁচড়ে ভরিয়ে ফেলল।

বার্ণস কিন্তু রান করতে লাগলেন প্রচুর। ল্যাঙ্কাশায়ার চললেন আমন্ত্রণে। পথে ক্যালেগানী ট্রেনে আবার উত্তেজনা। বার্ণস ডিনার খাচ্ছিলেন ট্রেনে, এমন সময় ট্রেন বাঁক ফিরল। এক বোতল শস্ টেবিল থেকে গড়িয়ে গিয়ে উল্টে পড়ল এক ভদ্রলোকের প্যান্টে। ভদ্রলোক কাণ্ড বাধালেন বটে! ওয়েটারকে হাঁক পাড়লেন, গাল দিলেন, ট্রেন থামাতে চাইলেন, সব জড়িয়ে বিরাট ব্যাপার ঘটালেন। বার্ণস চেয়ারে হেলান দিয়ে উপভোগ করতে লাগলেন—যাক বাবা, এই একটা গণ্ডগোলের মধ্যে আমি অন্ততঃ নেই।

ল্যাঙ্কাশায়ার থেকে ফিরে এলেন বার্ণস। ১৯৪৮ সালে অস্ট্রেলিয়া সফর করবে ইংলণ্ড। দলে স্থান পাবার জন্য সকলেই ফর্ম দেখাতে ব্যস্ত। বার্ণসও। সে চেষ্টাতেও একটি গোলমালে জড়িয়ে পড়লেন আবার।

ভারত খেলতে এসেছে। ইংলণ্ড যেতে গেলে আগে ভারতের বিরুদ্ধে খেলা দরকার। কিন্তু বার্ণসের বিরুদ্ধে মস্ত অভিযোগ, তিনি ল্যাঙ্কাশায়ারে খেলেছেন। অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটে ওটা নিষিদ্ধগমনের তুল্য। প্রশ্ন নিয়ে হাজির হলেন ব্রাডম্যানের কাছে। ডনকে জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর ইংলণ্ড যাবার সম্ভাবনা কি রকম? ল্যাঙ্কাশায়ারে যোগদান কি খুব ক্ষতি করেছে? তাঁকে নিতেই হবে এমন দাবি নিশ্চয় করছেন না, কিন্তু তাঁর যোগ্যতা অন্ততঃ বিবেচিত হবে কি না?

ডন হাসলেন।—'ব্যাগা' কিছু রান কর আগে। পরে এ বিষয়ে কথা হবে।

এই অবস্থায় বার্ণস শেফিল্ড শীল্ডে খেলতে গিয়ে এডিলেডে মাত্র ৪ রানে আউট হলেন। ব্যাপার গুরুতর। সুযোগ ফস্কে যাচ্ছে।

পরের খেলা মেলবোর্ণে ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে। শীল্ডের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খেলা। এই খেলায় সাফল্যের উপর সবকিছু।—

আমি ১-১০৫ রানের মাথায় খেলতে গেলাম। সুন্দর সূচনা। রান করে যাওয়া এখন আমার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। আমি কিন্তু বল দেখে খেলতে মনস্থ করলাম, দৃঢ়ভাবে ও অন্ততঃ প্রথম দশ রান পর্যন্ত ঐ ভাবে, তারপর দেখা যাবে।

এরপর কিন্তু উইকেট পড়তে সুরু করল, ২-১২০, ৩-১৬০, ৪-১৩৩। খেলার উপর আমাদের আধিপত্য হারিয়ে যাচ্ছে।

আমাকে ত্রাণকর্তার ভূমিকা নিতে হবে। ভূমিকা বটে। এমন মাটি আঁকড়ে পড়লাম যে, যেন ওঠার সাধ্যই রইল না নিজের। যারা আমার সে খেলা দেখেছিল, তারা বলে, অমন জিনিস আর দেখা যায়নি,—অমন খেলা, অমন দর্শক, চেঁচামেচি, পরিস্থিতি।

আমি স্থিরপ্রতিজ্ঞ হলাম, সেদিন উইকেট হারাব না। ঐ কথাই শেষ কথা। যখন আত্মরক্ষা করি, তখন দু'পা এবং সমস্ত শরীর ব্যাটের পিছনে এনে হাজির করি। বল আমার পায়েরকাছে খসে পড়ে। স্থির করলাম, রানের নিশ্চিত সম্ভাবনা না থাকলে কোনো বলই পেটাব না। সারাদিনের মধ্যে চড়াও হয়ে একটা মারও মারিনি।

বিরাট জনতা জমেছে, ৬৫,০০০ হাজারের মত। যারা বাইরের দিকে আছে তারা যখন ভিক্টোরিয়ার কাছ থেকে খেলাটি ছিনিতে নিতে সুরু করলাম, ব্যাপারটাকে মোটেই পছন্দ করল না। আমার পেছনে চেঁচাতে আরম্ভ করল। জনতার চীৎকারে আমি কখনো বিচলিত হই না। তারা যখন আমাকে পছন্দ করে, তখন উৎসাহ দেয়, আমি বলি বহুত আচ্ছা। তারা যদি রেগে গিয়ে গজরায়,—সেও ভি আচ্ছা। যখন আবহাওয়া একঘেয়ে হয়ে ওঠে, তখন আমি তাদের একটু খোঁচা দিই। সামনে

হাততালির মত পিছনে হাততালিও আমার সমান প্রিয়। যতক্ষণ হৈ চৈ আছে, ততক্ষণ আমি খুশী।

কয়েক ঘণ্টার এই নিরেট আত্মরক্ষার পর দর্শকেরা বিভক্ত হয়ে পড়ল। বাইরের দিকে যারা, তারা আমার বিরুদ্ধে। ভিতরের দিকের লোকজন অর্থাৎ সদস্য ও তাদের সাঙ্গপাঙ্গরা আমার পক্ষে। মাঝে মাঝে যখন বাউণ্ডারী করলাম—নিরাপদ বল ছাড়া সে চেষ্টা কখনো করিনি—সুন্দর আসনে সমাসীন ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহোদয়াগণ আমাকে সম্বর্ধিত করতে লাগলেন। অন্যদিকে গজরাতে ও তড়পাতে লাগল বাইরের দিকের মেয়ে পুরুষে। মেলবোর্ণের তারা জানে কিভাবে ছ্যা ছ্যা করতে হয়।

এ বড় মজা। এর প্রতিটি মুহূর্ত্ত আমার কাছে উপভোগ্য। চারের বাড়ি মারার পরেই আমি ভিতরের সুনির্বাচিতদের দিকে ফিরে টুপি খুলি, আর মাথা ঝোঁকাই। জিনিসটি তাঁরা বড় ভালবাসেন। তারপর বাইরের দিকে ফিরি, ব্যাটটা পায়ে ঠেকিয়ে রেখে দু'হাত নেড়ে তাদের দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবার মত ভঙ্গি করি, যেন বড় বীতশ্রদ্ধ। তারা চেল্লাতে থাকে আরো জোরে। 'সিডনিতে ফিরে যা বার্ণস,'—তারা চেঁচায়। 'ছুঁড়ে দে ওকে জাপানীর হাতে'—তারা একসুরে রব তোলে। এর ঠিক পরের বলটি নির্ঘাত নিষ্প্রাণ ব্যাটে ঠোকর খেয়ে আমার কাছে পড়ে থাকবে, আমি কাঠের মত দাঁড়িয়ে থাকব, উইকেটকীপার ১২ গজ দৌড়ে এসে সেটি কুড়ুবে। তখন আবার চীৎকার উঠবে। এমন চেঁচানি আমি ক্রিকেট মাঠে কখনো শুনিনি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই চলল।

১৪· করে নট আউট রইলাম। পরদিন খবরের কাগজে বেরুল, পূর্ব দিনের দৃশ্য মেলবোর্ণে অভূতপূর্ব। যখন আবার মাঠে উদয় হলাম, সম্বর্ধনার কি বহর! প্রথম বলটি আবার পায়ের কাছে থুবড়ে পড়ল। এবং এমনি চলল।

…১৫৮ রান করে আউট হলাম। মেলবোর্ণ হেরাল্ডের পোস্টারে ছাপা হল—'অবশেষে—গেছে!' আমাদের রান হল ৪২০। দ্বিতীয় ইনিংসে ১৮৬ রান হলেই জয় হয়। ৮৬ রান করে নট আউট ছিলাম। চমকপ্রদ ক্রিকেট খেলেছিলাম। সমস্ত মাঠ আমার জয়ে মুখরিত হয়েছিল।

বার্ণসকে ইংলণ্ডগামী দলে স্থান দেওয়া হল, ল্যাঙ্কাশায়ারে যোগদান এবং স্কটল্যাণ্ডে স্ত্রীর অবস্থান সত্ত্বেও। তার কারণ, বার্ণস বুঝলেন, তাঁকে একজন চাইছেন বিশেষভাবে। সেই একজনের নাম ডোনাল্ড জি ব্রাডম্যান। ইংলণ্ডে তিনি জীবনের শেষ সফরে সেরা দল নিয়ে যেতে চান। বার্ণস না গেলে পূর্ণাঙ্গ শ্রেষ্ঠ দল হয় না।

ইংলণ্ডে ট্যাক্সি করে যেতে যেতে ব্রাডম্যান একদিন বার্ণসকে বললেন, হাটন হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার পয়লা নম্বরের শত্রু। সুযোগ পেলেই সে কেনিংটন ওভালের রেকর্ডের পুনরাবৃত্তি করতে পারে।

ব্রাডম্যান। বুঝলে সিড, হাটনকে আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে দেওয়া যায় না। একটা মতলব মাথায় এসেছে। যদি তুমি তার কাছাকাছি, একেবারে ব্যাটের মুখে দাঁড়িয়ে ফিল্ডিং করতে পার, তাহলে হয়ত তার মনোযোগ নষ্ট করা যায়। তোমার কি মনে হয়?

বার্ণস। আমার কোনো আপত্তি নেই।

ব্রাডম্যান। কত কাছে দাঁড়াতে হবে ভেবে দেখেছ?

বার্ণস। কিছুমাত্র না। আমার মনে হয় না, হাটন আমার খুলি উড়িয়ে দিতে পারবে।

বিপদের চিন্তায় ব্যস্ত হলেন না বার্ণস। প্রথম কথা, হাটন ভালো হুক মারতে বা তুলে মারতে অভ্যস্ত নন। তাছাড়া বার্ণস নিয়তিবাদী। কাছে যারা ফিল্ডিং করে, তাদের বিপদ আছেই। খুলিতে একটা আঘাত মানে ইংলণ্ডের কোনো সমাধিভূমে বার্ণসের

দেহাস্থির চিরবিশ্রাম। মৃত্যু যদি আসে আসবেই, কেউ তাকে ঠেকাতে পারবে না। সাহসী অদৃষ্টবাদী বার্ণস ভাবতে থাকেন।

ইংলণ্ডে বার্ণস ভালই খেলতে লাগলেন। পৃথিবীর একজন সেরা প্রথম জুটির খেলোয়াড় বলে স্বীকৃতি পেলেন। এ দিকে ব্যাটের মুখে দাঁড়িয়ে ফিল্ডিং করে কেবল হাটনকে নয়, উত্ত্যক্ত করে তুললেন সমস্ত ইংরেজ ব্যাটসম্যানকে। এমন সময় একদিন ডন ডাকলেন। হাতে একটা চিঠি দিয়ে বললেন, পড়ে দেখ। বার্ণস পড়লেন—অত কাছে দাঁড়িয়ে ফিল্ডিং করার অখেলোয়াড়ী মনোভাবের বিরুদ্ধে একজন চিঠি লিখেছেন। পড়া শেষ হতে ডন বললেন, চিঠিটা ছিঁড়ে ফেল এবং ভুলে যাও।

খেলোয়াড়রূপে প্রভূত সাফল্য সত্ত্বেও বার্ণস কিছুদিনের মধ্যে একটা নৈরাশ্যজনক সত্য উপলব্ধি করলেন—ইংলণ্ডের অধিবাসী ও সংবাদপত্রের কাছে ডনের তুলনায় নিজের ও অন্য খেলোয়াড়দের অকিঞ্চিৎকরত্ব। ডনকে যদিও প্রধান মানেন, তবু আত্মদর্পী এবং প্রচারপ্রেমিক বার্ণসের জিনিষটা বড় বাজল। বার্ণস দেখলেন, সংবাদ-পত্র কেবল ডনকেই চায়। ডনকে প্রচারের পিছনে ছুটতে হয় না, প্রচারই ডনের পিছনে ছোটে। একটা ঘটনায় বার্ণসের শিক্ষা হল।

১৯৪৮ সালে নটিংহামের প্রথমে টেস্টে অস্ট্রেলিয়া জিতল। এই জয়ের শেষের দিকে বার্ণসের কিছু বিশেষ দান ছিল। মাথায় বৃষ্টি, তাড়াতাড়ি রানের দরকার। ইংলণ্ডের বোলিংয়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বেডসারের বলে ওভার বাউণ্ডারী মারেন বার্ণস। শেষ করলেন মোট ৯৮ রানের মধ্যে ৬৪ নট আউট থেকে। হুক, ড্রাইভ, কাট—জার্মান বাজনার মত বার্ণসের ব্যাটে বেজেছে। শোচনীয় আলোর মধ্যে মাথায় বৃষ্টি নিয়ে অপূর্ব খেললেন বার্ণস। একজন ক্যামেরাম্যান অবাক হয়ে বার্ণসকে বলল, এই অন্ধকারে বল দেখছ, বিড়ালের চোখ নাকি? বার্ণস উল্লসিত হয়ে ভাবলেন, নিশ্চয় ভালো প্রেস পাব। সব কয়টি প্রভাতী সংবাদপত্রের অর্ডার দিয়ে রাখলেন হোটেলে।

কি দেখলেন ?

'সকল ক্রিকেট স্তম্ভ ব্রাডম্যানের শূন্যে পূর্ণ। কয়েক ইঞ্চি জোড়া করে তারা ব্যাপারটি বর্ণনা করেছে। বিস্তৃত তালিকা দিয়েছে, ব্রাডম্যান কবে কবে গোল্লা করেছেন।'

বার্ণস ভাবতে থাকেন, কি ফল! শত করুন বা শূন্য করুন, ডন প্রচার পাবেন। বাকি সকলে দল তৈরীর সংখ্যা।

প্রথম টেস্টে বার্ণসের সঙ্গে এক হাত হয়ে গেল আম্পায়ারদের। বার্ণস ও মোরিস ঠাণ্ডার মধ্যে খেলতে নেমেছিলেন, খানিক হাত জমার পর গরম হয়ে উঠে সোয়েটার খুলে আম্পায়ার কুকের ঘাড়ে চাপাতে গেলেন। আম্পায়ার গরম হয়ে বললেন, ও সব হবে না, আমি ধোপার গাধা নই।

আম্পায়ার চেস্টারের সঙ্গেও বার্ণসের লাগল। চেস্টারের গুরু-মশাইগিরি বার্ণসের পছন্দ নয় মোটে। একবার মোরিস একটা বল সোজা ড্রাইভ করলেন, চেস্টার সেটাকে পা দিয়ে থামালেন তাঁর দিকের উইকেট বাঁচাতে। বার্ণস সে বলটাকে বোলারের দিকে ছুঁড়ে দিলেন। চেস্টার তা দেখে বার্ণসকে আঙুল তুলে সতর্ক করলেন, বার্ণসও উত্তরে আঙুল তুললেন,—চেস্টারই নীতিভঙ্গ করেছেন।

বার্ণস চেস্টারের সঙ্গে কথাবার্তাও সমীহ করে বললেন না। আলো কমের আবেদন জানাতে গিয়ে বললেন—'এ!—কী আলো!' আবেদনের ভঙ্গি দেখে চেস্টার ভিরমি যান আর কি! আবেদন বাতিল করে দিলেন।

বার্ণসের আর আলোর আবেদন জানানোর উপায় রইল না। ১৯৪৬ সালের সিডনি টেস্টে আলোর যুদ্ধ করে বার্ণস আইন বদলাতে বাধ্য করেছেন এম সি সি-কে। নতুন আইনে একবার আবেদন জানানোর পরে বাকি সিদ্ধান্তের ভার সম্পূর্ণ আম্পায়াদের উপর।

আবেদন গৃহীত না হলেও নতুন আইনটা যে আমারই কীর্তির পরিণতি, এই কথা ভেবে বার্ণস সম্ভবত তৃপ্তি পেলেন।

খেলার একেবারে শেষে বার্ণস মাতালেন এবং হাসালেন সকলকে। মাঠের সকলে হিসেবে ভুল করেছিল। তাদের ধারনা ছিল ৯৭রান করলেই অস্ট্রেলিয়ার জয়। তদনুযায়ী ৯৬ রানের মাথায় লেগে স্যুইপ করেই, মারের কি গতি হল তার দিকে না তাকিয়ে বার্ণস দুটো টেস্ট স্টাম্প উপড়ে নিয়ে ছুটতে লাগলেন প্যাভিলিয়নের দিকে। হায়রে হায়! কী মন্দ বরাত বার্ণসের! স্কোরার ও প্রেসের লোকেরা ভুল ভুল বলে চেঁচাতে লাগল। সত্যিই ভুল। এখনো জয়ের জন্য এক রান বাকি। সকল খেলোয়াড়কে ফিরতে হল মাঠের ধার থেকে মাঠের মধ্যে—বার্ণসকে প্যাভিলিয়নের ভিতর থেকে। বার্ণসের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে মাঠে আবার স্টাম্প পোঁতা হল, খেলা আরম্ভ হল, খেলা শেষও হল, এবার কিন্তু বার্ণসের বরাতে কিছুই জুটল না, একটা বেল পর্যন্ত নয়। বার্ণস ছদ্ম নৈরাশ্যে মাঠে ব্যাট ছুঁড়ে ফেলে যেন কাঁদতে লাগলেন। বাকি সকল হাসতে লাগল।

নটিংহ্যামের প্রথম টেস্টের মতই লর্ডসের দ্বিতীয় টেস্টেও ইংলণ্ড শোচনীয়ভাবে হারল। বার্ণস প্রথম ইনিংসে দলের সর্বনিম্ন ('০') এবং দ্বিতীয় ইনিংসে সর্বোচ্চ (১৪১) রান করলেন।

ওল্ড ট্রাফোর্ডে তৃতীয় টেস্টে ক্রিকেটের দেনা শুধলেন বার্ণস। যথারীতি তিনি ব্যাটের বড় কাছে দাঁড়িয়েছিলেন। সাহসে সাহস বাড়ে, আর বাড়ে বিপদ। যারা প্রথম উইকেটের নিখুঁত খেলা খেলে তারা যত না বিপজ্জনক, আরো বেশী মারাত্মক শেষ উইকেটের ব্যাট-কাঁধে খেলোয়াড়রা। ইংলণ্ডের পোলার্ড এমনিতে বোলার। রীতিমত স্বাস্থ্যবান। স্বাধীন ক্রীড়াপদ্ধতি। বার্ণস যদি ব্যাটের মুখে দাঁড়িয়ে থাকে, সে ঝুঁকি বার্ণসের। পোলার্ড হাতা গুটিয়ে নিয়েছেন। যতখানি জোরে সম্ভব লেগের দিকে ব্যাট চালালেন। কাটা গাছের মত মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন বার্ণস। ইংলণ্ডের শত্রু নিপাত হতে স্বাভাবিক সংস্কারে উল্লসিত হয়ে উঠল কিছু ইংরেজ দর্শক। অনেক

দিন ধরে বার্ণসের অসদাচরণ তারা সহ্য করেছে। এবার শাস্তি সহ্য করুক বার্ণস।

কিছু সংখ্যক দর্শকের হৃদয়হীনতায় ঘৃণা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ব্রাডম্যান। দর্শকদের দোষ দেন নি ঠিক, দিয়েছেন কোনো কোনো দায়িত্বহীন সংবাদপত্রকে। তারা, বার্ণস পিচের উপর দাঁড়িয়েছিল, বোলিং-এর সময় নড়ছিল, এই ধরণের মিথ্যা প্রচার চালিয়েছে। বার্ণসের প্রশংসা করে ব্রাডম্যান বললেন,—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সর্টলেগ ফিল্ডসম্যান, অন্য যে-কোনো খেলোয়াড়ের সাধ্যের এবং সাহসের অতীত বস্তু সম্পাদনে সমর্থ।

বল লেগেছিল বাঁ দিকের পাঁজরে। মুহূর্তের মধ্যে বাঁ দিক যেন পড়ে গেল পক্ষাঘাতে। চোখে রক্ত উঠে অন্ধ হয়ে গেল চোখ। এমন আঘাতে মৃত্যু হয়। হাসপাতালের ডাক্তার বললেন, বার্ণসের মত মোটা পাঁজবের হাড় দেখেন নি। পাঁজর ভেদ করতে একস্‌রে যন্ত্রকে পূর্ণ শক্তিতে চালাতে হয়েছিল। শ্রীবার্ণসের মোটা পাঁজর আর জোর বরাত সে যাত্রা শ্রীমতী বার্ণসকে কালো পোশাক পরাল না।

বার্ণসের দেনা বোধ হয় সম্পূর্ণ শেষ হয় নি। শনিবার যখন অস্ট্রেলিয়া দলের সঙ্কট অবস্থা, আয়ান জনসন, ব্রাডম্যান ও মোরিস ফিরে গেছেন প্যাভিলিয়ানে, তখন বার্ণস বললেন, খেলতে নামব, মাঠে নেমেই সহাস্যে পোলার্ডের সঙ্গে করমর্দন। কয়েকটা বল খেললেন, এবং একটা সিঙ্গলস্‌ নেবার জন্য দৌড়ুতে সুরু করলেন। দৌড় থেমে গেল মাঝপথে। মূর্চ্ছিত বার্ণসকে ছ'জন পুলিশ বয়ে নিয়ে গেল মাঠের বাইরে।

লীডসের চতুর্থ টেস্ট বুকের ব্যথা নিয়ে বার্ণসকে মাঠের বাইরে থেকে দেখতে হল। লীডসেও অস্ট্রেলিয়া জিতল। ব্রাডম্যান বলেছেন 'সে একটা বিরাট জয়'। ইংলণ্ডেরই জয়ের কথা। পঞ্চম দিনের সূচনায় ইংলণ্ড ৮ উইকেটে ৩৬৫ রান করে যখন ডিক্লেয়ার

করল তখন অস্ট্রেলিয়াকে ৪০৪ রান করতে হবে ৩৪৪ মিনিটে যদি সে জিততে চায়—এবং তা করতে হবে পঞ্চম দিনে! ব্রাডম্যান শৃঙ্খল ও তরবারির মধ্যে তরবারিই তুলে নিয়েছিলেন। বীরের ভাগ্য বীরকে অবলম্বন করল। ব্রাডম্যানের অস্ট্রেলিয়া ৭ উইকেট হাতে নিয়ে, ১৫ মিনিটে সময় বাকি থাকতে সে খেলায় জিতেছিল।

এমন নাটকীয় খেলায় থাকতে পারেন নি নাটকীয়তম খেলোয়াড় সিড বার্ণস—চরম দুর্ভাগ্য!

পঞ্চম টেস্টে বার্ণস ফিরে এলেন এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসে মোরিসের সঙ্গে প্রথম উইকেটের জুটিতে ১১৭ রান করলেন (নিজের ৬১)। এই টেস্টে অস্ট্রেলিয়া জিতল পুনর্বার—এবার ইনিংসে।

ওভালের এই পঞ্চম টেস্ট ক্রিকেট থেকে বিদায় দিয়েছিল বিরাটতম টেস্ট ক্রিকেটারকে—ডন ব্রাডম্যানকে। এই টেস্টে অস্ট্রেলিয়া একটি মাত্র ইনিংস খেলবার সুযোগ পেয়েছিল—ব্রাডম্যান ব্যাট হাতে নিয়ে মাত্র একবারই মাঠে নামবার সুযোগ পান। ক্রিকেটের সম্রাট সম্রাটের অভিনন্দন পেলেন শেষ অবতরণে। এক অতিবিশাল গর্জন যখন গ্যালারি থেকে উঠে আকাশ ছুঁয়ে মাঠে নেমে আসছে তখন ব্রাডম্যান গার্ড নিয়ে দাঁড়িয়েছেন এবং হোলিজ বল করতে সুরু করছেন। প্রথম বল, ব্রাডম্যান ব্যাকফুটে আটকালেন। দ্বিতীয় বল একটু সর্টপিচ, ব্রাডম্যান পা বাড়িয়ে ব্যাট পাতলেন, এবং—বল ব্যাটে না লেগে উইকেট ভেঙে দিয়ে চলে গেল।

যে গর্জন আকাশ থেকে নেমে এসেছিল—তা আবার আকাশে উঠল। 'ব্রাডম্যান বিশ্বাসই করতে পারছেন না, ফিরে তাকালেন ভাঙা স্টাম্পের দিকে, তারপর ধীরে, অতি ধীরে ফিরে চললেন প্যাভিলিয়নের পথে।'

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাটক ক্রিকেট, দানে ও হরণে উদারতম। টেস্ট ক্রিকেটে সর্ববৃহৎ যাঁর রানসংখ্যা, শেষ টেস্টে তাঁর রান সর্বশূন্য।

কিন্তু এই সময়ে দলের অসংবরণীয় বয়স্ক বালকটি কি করছিল? বার্ণস আউট হতেই ব্রাডম্যান নেমেছেন। ব্রাডম্যান শেষ বারের জন্য নেমেছেন। মুভি-পাগল বার্ণসকে সে ছবি তুলতেই হবে। ব্রাডম্যান নেমে পড়েছেন, বার্ণসের প্যাড খোলার সময় নেই, প্যাড পরেই বার্ণস ক্যামেরা নিয়ে ব্যালকনিতে ছুটলেন।

ব্রাডম্যান ফিরে এলেন। ড্রেসিংরুমে বার্ণস ও তাঁর ক্যাপ্টেন একই সঙ্গে প্যাড খুলতে লাগলেন। প্যাড খুলতে খুলতে বার্ণস একগাল হেসে বললেন, 'স্কিপার, তোমার গোটা ইনিংসটার ছবি আমি তুলে নিয়েছি'।

ব্রাডম্যানের ১৯৪৮ সালের অপরাজিত অস্ট্রেলিয়ান দল দেশে ফিরল সগৌরবে। ব্রাডম্যানের সাহসী সৈনিকের দেহ মন তখন সাহসে ও সাফল্যে পূর্ণ। বার্ণসের ব্যক্তিগত কৃতিত্ব এই সফরে অসামান্য। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফিল্ডসম্যান, শ্রেষ্ঠ ওপেনিং জুটির অন্যতম—এই সুনাম পাওয়া গেছে। টেস্টে ব্যাটিং-অ্যাভারেজে দলের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান—৮২·২৫। বার্ণস হয়তো তৃপ্তিতে ভাবতে থাকেন—আমার স্থান ব্রাডম্যানেরও উপরে। ব্রাডম্যান তৃতীয় স্থানে ছিলেন। মোট রানে তিনি অবশ্য ব্রাডম্যানের চেয়ে ১৭১ রান পিছনে (ব্রাডম্যান ৫০০; বার্ণস ৩২৯) কিন্তু এও তো সত্যি যে, তিনি বুকে আঘাতের জন্য তিনটে ইনিংস খেলতে পারেন নি এবং আহত অবস্থায় খেলতে নেমে আর একটা ইনিংসে মাত্র ১ রান করেছিলেন। এই চারটে ইনিংসে কি তিনি ঐ ১৭১ রান করতে পারতেন না? নিশ্চয় পারতাম—পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বার্ণস ভাবতে থাকেন।

দলের সাফল্যে বোর্ড খুব খুশী। সদ্ব্যবহারের জন্য প্রাপ্য বোনাসের অতিরিক্ত একটা রূপার সিগারেট কেস দলের সকলের মতই বার্ণসও পেলেন। পরের মরশুমে অস্ট্রেলিয়ায় খেলবেন না স্থির

করলেন। কেবল ব্রাডম্যানের অনুরোধে খেলতে নামলেন ব্রাডম্যান-টেস্টিমোনিয়্যাল ম্যাচে। রান করলেন ৩২ ও ৮৯। কিন্তু মজা করলেন প্রভূত। হাতের ব্যাট সরিয়ে রেখে হঠাৎ একবার পকেট থেকে খেলনার ব্যাট বার করে স্ট্যান্স নিয়ে দাঁড়ালেন। হেসে গড়িয়ে পড়ল দর্শক।

বার্ণসের বেপরোয়া হাসি। কর্তৃপক্ষের কাছে বেসরম নোংরামি। 'লোক দেখানো', 'নিজে নাচুনে' বিরক্তিকর বার্ণস। বোর্ডের বিরুদ্ধে কুরুক্ষেত্রের পূর্বে এই হল খেলার মাঠে বার্ণসের শেষ বড় হাসি। একেবারে শেষ হাসি হাসবেন তখন, যখন খেলোয়াড় বার্ণসের বিদায় রাগিণী বাজছে।

সিডনির একটি নবনির্মিত গৃহ। সুন্দর পরিচ্ছন্ন রুচিতে সজ্জিত। বাড়ীটি গৃহকর্তার বড় সখের। প্রচুর পরিশ্রম করে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বাড়ী তৈরী করেছেন। ঝকঝকে তকতকে আসবাব।

সকালের আলো এসে পড়েছে ড্রইংরুমে। মজবুত গঠনের এক ব্যক্তি কুশনে উপবিষ্ট। চওড়া বুক কাঁধ। মোটা হাতের হাড়। চুল কিছু পাতলা। মুখে ঔদ্ধত্য ও আত্মবিশ্বাসের মিশ্রণ। চেহারায় কোথায় একটা ছেলেমানুষি আছে। ভদ্রলোকের বয়স বেশী হবে না, ৩২-৩৩-এর মধ্যে। চেহারা রোদে পোড়া বলে একটু বেশী দেখায়।

ঘরে ঢুকলেই দেখা যাবে দুটি ফটো পাশাপাশি ঝুলছে। তার একটি একজন বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তির--প্রশস্ত ললাট ও আকর্ণবিস্তৃত হাসিতে উজ্জ্বল একখানি মুখ। দ্বিতীয় ফটোর ব্যক্তিটিও পৃথিবীর অনেকের পরিচিত—একজন ক্রিকেটারের ছবি, প্রচণ্ড জোরে বল পেটানোর ভঙ্গিতে তোলা।

উপবিষ্ট ব্যক্তির 'কে-কার-পরোয়া-করে' চেহারা আজ কিছু

ম্লান। কপালে ও চিবুকে বিষাদের ঘন রেখা। সকালের রোদ ঘরটিকে আলোয় ভরিয়ে তুললেও মনে স্ফূর্তি আনতে পারেনি।

উপবিষ্ট ব্যক্তিই গৃহকর্তা। উঠে দাঁড়ালেন। অশ্রদ্ধা ও বিরক্তি মিশ্রিত একটা আওয়াজ করে প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে ঘরে পায়চারি করতে সুরু করলেন। ছবি দু'টির সামনে দাঁড়ালেন স্থির হয়ে। সহাস্যমুখ ভদ্রলোকের ছবির দিকে তাকিয়ে চোখ কোঁচকালেন। তারপর দ্বিতীয় ছবির দিকে দৃষ্টি পড়ল। আস্তে আস্তে মাথা নাড়াতে লাগলেন। দ্বিতীয়টি সিড বার্ণসের ব্যাটিং-এর পরিচিত ছবি। প্রথমটি ডন ব্রাডম্যানের।

পায়চারি চলতে লাগল। তারই মধ্যে কয়েকবার ছবি দু'টির দিকে দৃষ্টি পড়ল। সবচেয়ে প্রিয় দু'টি চিত্র—ব্যাডম্যানের ও নিজের, ছোট বয়স থেকেই পাশাপাশি রেখে এসেছেন। আগে মনের প্রাচীরে ঝুলত, এখন নিজের ঘরের প্রাচীরে ঝুলছে। ছবি দু'টির দিকে চাইলে অনেক কথা মনে পড়ে, অন্তত আজ মনে পড়ছে। মন বড় খারাপ। বড় আঘাত পেয়েছেন। বিষণ্ণ মনে গোটা জীবনের কামনা ও কীর্তির ঘটনাগুলো বড় বেশী চলাফেরা করছে।

কয়েকদিন আগে। বার্ণস যাচ্ছিলেন সিডনির পথ দিয়ে মোটরে। একটা পোস্টার হঠাৎ চোখে পড়ল—'বার্ণস এল—বার্ণস গেল।' মানে? তাড়াতাড়ি একটা সংবাদপত্র কিনলেন। পড়তে পড়তে পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে উঠল। বিবরণ বেরিয়েছে—অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটের নির্বাচকমণ্ডলী ১৯৫১ সালের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিরুদ্ধে টেস্টে ১৩ জন খেলোয়াড়ের যে নির্বাচিত তালিকা পাঠিয়েছেন বোর্ডের কাছে, কন্ট্রোল বোর্ড তা নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে ফেরৎ পাঠিয়েছেন একজন খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে আপত্তি করে, —আপত্তির কারণ 'ক্রিকেট ছাড়া অন্য কিছু।'

রক্ত উঠে গেল মাথায়। দ্রুত গাড়ী ঘুরিয়ে বাড়ী ফিরলেন বার্ণস। দৌড়ে গিয়ে ফোনের রিসিভার তুললেন। ডায়াল ঘুরল ত্বরিত।

—হ্যালো, মিঃ অক্সলেড কি? আমি সিডনি বার্ণস কথা বলছি …ও আচ্ছা, আমি এখনি যাচ্ছি।

সিডনির জর্জ স্ট্রীটে স্ট্যান ম্যাককেবের ক্রীড়া-সরঞ্জামের দোকান। অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের চেয়ারম্যান মিঃ অক্সলেডের সঙ্গে সেখানে দেখা হোল বার্ণসের। অনেকে উপস্থিত। বার্ণস ঢুকতেই মিঃ অক্সলেড সমাদরের সঙ্গে হাত বাড়িয়ে করমর্দন করলেন।

—মেলবোর্ণে যে সেঞ্চুরী করেছ, তা অপূর্ব। তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

ধন্যবাদ। কিন্তু বুঝতে পারছেন, আমি অন্য কারণে এসেছি। খবরের কাগজে এসব কি বেরিয়েছে? ব্যাপারটা কি? বার্ণস উত্তেজিত হয়ে ওঠেন।

জঘন্য ব্যাপার। ওসব নোংরা জিনিসের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই,—ঘৃণার সঙ্গে বললেন মিঃ অক্সলেড।

জঘন্য বলে!—ম্যাককেব সমর্থন করলেন। আমরা সকলে বার্ণসকে চিনি। তার পক্ষে খারাপ কিছু করা সম্ভব নয়। কিন্তু—মিঃ অক্সলেডের দিকে ফিরে ম্যাককেব বললেন—আপনাকে অবশ্যই বলতে হবে না যে, কিছু কিছু বোর্ড-মেম্বার বার্ণসকে কি চোখে দেখে।

মিঃ অক্সলেডের সৌম্য মুখ গম্ভীর হল। চুপ করে রইলেন।

বার্ণস ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন—আমাকে নির্বাচিত না করলে কিছু বলবার ছিল না। নির্বাচকমণ্ডলী নিজের কাজ আমার চেয়ে ভাল বোঝেন। কিন্তু এরকম গায়ে পড়া অপমান!—ক্ষোভে ও রোষে বার্ণস কাঁপতে থাকেন।

পিঠে হাত চাপড়ে সান্ত্বনা দিলেন বৃদ্ধ মিঃ অক্সলেড।

—কিছু ভেব না সিড। ক্রীষ্টমাসের সময় বোর্ডের যে পরবর্তী মিটিং হবে, তাতে এ বিষয়ে আমি প্রচুর প্রশ্ন করব।

সেদিনকার মত জঘন্য রাত্রি বার্ণসের জীবনে আসেনি। একজন খেলোয়াড়কে নির্বাচন করেও বাদ দেওয়া হয়েছে 'ক্রিকেট ছাড়া অন্য

কারণে'—এ সংবাদ সমস্ত অস্ট্রেলিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে আগুনের মত। সান্ধ্য কাগজে এই নিয়ে বিশেষ প্রবন্ধ লেখা হয়েছে। সকলেই ধরে নিয়েছে, বাতিল ব্যক্তির নাম সিড বার্ণস। পথে ঘাটে পাড়ায় সকলে এই নিয়ে আলোচনায় মুখর। বার্ণসের বাড়ীতে ফোনের পরে ফোন। এ বিষয়ে তাঁর ব্যক্তব্য কি? সংবাদপত্র থেকে বারবার চেয়ারম্যান মিঃ অক্সলেডকে রিং করা হচ্ছে। মিঃ অক্সলেড জানিয়েছেন, বোর্ড নির্বাচকদের কাছে পুনর্বিবেচনার জন্য তালিকা ফেরৎ পাঠিয়েছে, একথা সত্য

—কিন্তু কার বিষয়ে আপত্তি—বার্ণসের বিষয়ে কি?

আমি কোনো মন্তব্যই করতে পারব না বার্ণসের বিষয়ে—একেবারেই না,—মিঃ অক্সলেড বললেন।

মিঃ অক্সলেডের ঘরে ফোন আবার বেজে উঠল সেই রাত্রে। ওপাশ থেকে বার্ণসের উদ্বিগ্ন কম্পিত কণ্ঠ ভেসে আসে—বার্ণসের নামে যে সব গুজব রটেছে, মিঃ অক্সলেড কি সংবাদপত্রে তার প্রতিবাদ করবেন? মিঃ অক্সলেড সকালের মতই সান্ত্বনার ভঙ্গিতে জানালেন বোর্ডের আগামী মিটিংয়ে এ বিষয়ে তিনি প্রশ্নের পর প্রশ্ন করবেন। বোর্ডের সেক্রেটারী মিঃ জিনসের কোনো পাত্তা নেই। সন্ধ্যের দিকে সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের জানিয়ে গেছেন, রাত্রে বাড়ী থাকবেন না, পরদিন সকালেও তাঁকে পাওয়া যাবে না।

একটা নীরবতার ষড়যন্ত্র চলল বোর্ডের তরফ থেকে। দিনের পর দিন মাসের পর মাস। বার্ণস সম্বন্ধে বোর্ডের কেউ কোন কথা বলবে না। শামুকের মত শুঁড় গুটিয়ে নিল সকলে।

বার্ণসের পক্ষে দাঁড়াল সংবাদপত্র।

ক্রিকেট-লেখক সংঘের সম্মেলনে ওরিলি বললেন—বোর্ড যে এমন হীন হতে পারে ভাবা যায় না। এত নীচ! সারা জাত ছি ছি করছে।

সমর্থন করলেন অন্য একজন।—আশ্চর্য, বার্ণসের দোষ কি তা পর্যন্ত জানান হল না!

তীব্র কণ্ঠে ফিঙ্গলটন বললেন, দোষ নেই? সমূহ দোষ। সত্যি কথা বলা হয়েছে। বোর্ডের সদস্যদের অমন নরম চামড়া। বার্ণসের কড়া কথার চাবুক বাছারা সইবেন কি করে?

আর্থার মেইলী সমর্থনে মাথা নাড়ালেন,—নির্বাচকমণ্ডলীর পদত্যাগ করা উচিত ছিল। যাদের নির্বাচিত নাম ফেরৎ দেয়, তারা পদ আঁকড়ে বসে থাকে কি করে?

ঈর্ষা আর বিদ্বেষ! ওরা বার্ণসকে ভয় করে।—যোগ করলেন উপস্থিত একজন।

সাংবাদিকরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়বে—ফিঙ্গলটন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন। সকলে বলল, নিশ্চয়ই!

কিন্তু জনসাধারণ! বার্ণস বড় জনতা ভালবাসেন। তারা যখন হাসে ভাল লাগে, তেমনি ভাল লাগে তারা যখন চটে যায়, তখনও। এখন? বার্ণস রাস্তা দিয়ে হাঁটছেন—কয়েকজন এক জোট হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। ফিস্‌ফিস্‌ করে কি বলতে লাগল, আঙুল তুলে দেখাল!

কয়েকটা পাজি ছোঁড়া রাস্তায় বেরুলেই চেঁচিয়ে ওঠে সমস্বরে—'কোথায় তোমার গাড়ী রাখলে বার্‌-নেস্‌?' ইচ্ছে করে টুঁটি ছিঁড়ে ফেলি। বার্ণস ভাবেন, কি লাভ। বোর্ডের টুঁটি তো ছিঁড়ে ফেলা যাচ্ছে না। বার্ণস পথে আর প্রায় বেরোন না।

তাতেও শান্তি নেই।

ক্রিং ক্রিং ক্রিং ফোন বাজল। বার্ণস রিসিভার তোলেন। ওপার থেকে ভেসে আসে—

হ্যালো, কে, বার্ণস?

হ্যাঁ।

তা বাছা, রাজারাণীকে তুমি কী অপমান করেছিলে যে, তোমাকে

দল থেকে বাদ দিল! রাজাকে অপমান করাটা কিন্তু বাছা ভাল হয় নি।

ফোন নামিয়ে রাখেন। আবার তোলেন। ফোন বাজছে—

কি হে চুরি-চামারি পর্যন্ত শিখেছ। অন্য খেলোয়াড়ের পকেট মারো নিজে খেলোয়াড় হয়ে? ছ্যা ছ্যা!

ফোন নামান। আবার তোলেন!

মিঃ বার্ণস, আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি কি? শুনলাম আপনি না কি মদ্যপান করে আপনার পত্নীকে প্রহার করেন? পরিবারের লোকজনকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। ব্যাপারটা সত্য হলে বড় দুঃখের।

বার্ণস বাইরে গিয়েছিলেন। ফোন ধরেছেন তাঁর স্ত্রী। বার্ণস প্রবেশ করলেন। স্ত্রী ফোন নামিয়ে রাখলেন, মুখচোখ লাল। বার্ণস বুঝলেন, চুপ করে রইলেন।

কতবার ভেবেছেন বাজলেও ফোন তুলবেন না। শুধু অপমান আর অপমান। যত কুশ্রী কথা, কিন্তু—। বার্ণসের কানে এখনো সেই স্নেহস্নিগ্ধ কথাটি বাজছে। সেদিনও বিরস শ্রান্ত মন নিয়ে রিসিভার তুলেছেন—

সিড বার্ণস নাকি?—ওদিক থেকে মেয়েলি গলা ভেসে আসে।

হ্যাঁ।

ঈশ্বর তোমার কল্যাণ করুন।

বার্ণস অবাক হয়ে যান, এমন কথা বলবার লোক এখনো আছে?

সিড, আমি তোমার মায়ের বয়সী। জানি তোমার নামে যা রটেছে, সব মিথ্যে। তোমার বিষয়ে এমন লোকের কাছে শুনেছি যে মিথ্যে বলতে পারে না। তুমি ভয় পেয়ো না নিন্দেয়।

আপনার নাম জানতে পারি কি? আপনি কি আমার পরিচিত?

নাম জেনে কি হবে? তুমি আমাকে চেন না। তোমাকে স্নেহ করে এমন অনেক লোকের মধ্যে আমি একজন।

ধন্যবাদ।

বাছা, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও। মনে বল আমেন।

বার্ণস তাই ফোন না ধরে পারেন না। যদি তেমন কেউ ডাকে।

বার্ণস চিঠি লিখলেন ডন ব্রাডম্যানকে। ১৯৩৮ ও ১৯৪৮ সালের ইংলণ্ড সফরকারী দলের অধিনায়ক। বার্ণসের নামে যে সব গুজব রটেছে, তা কি তিনি সমর্থন করেন?

ঘরে পায়চারি করতে করতে এই সব কথা বার্ণসের মনে পড়ে। কয়েক মাসের অপমান ও মানসিক যন্ত্রণার তুর্বহ জীবন। অসহ্য, অসহ্য। কি অন্যায় করেছি আমি? নিঃশব্দে চীৎকার করে ওঠেন তিনি। বলো—কি অন্যায় করেছি?

সকালের ঘটনা। স্কুল থেকে বড় মেয়ে হেলেন মুখ ভার করে ফিরেছে। তার মা জিজ্ঞাসা করলেন,—কি হল? মায়ের গলা জড়িয়ে হেলেন বলল,—বাপি অত তুষ্টু কেন মামি?

সে কি রে, কে বললে?

হ্যাঁ, বাপি তুষ্টু, স্কুলের মেয়েরা বলছিল।

ছিঃ মা, ও কথা বলে না। একেবারে মিথ্যে কথা। তোমার বাপি শুনতে পেলে মনে বড় তুঃখ করবেন।

হেলেন তখনো গোঁ ধরে থাকে। ইস্কুলের মেয়েরা তাকে বুঝিয়েছে, নিশ্চয় তার বাবা খারাপ লোক, নইলে বোর্ড তাড়িয়ে দিয়েছে কেন? মেয়েরা এসব কথা তাদের বাপ মার কাছ থেকে শুনেছে।

বার্ণস ভাবেন পৃথিবীটা কি নীচ আর নিষ্ঠুর। ছোট একটা মেয়ের মন পর্যন্ত বিষিয়ে দিতে সঙ্কোচ করে না। কিন্তু বার্ণসের অপরাধ কি? কর্তাদের মন যুগিয়ে চলতে না পারা? কই বার্ণস তো কোনদিন মিছিমিছি কাউকে অপমান করেননি। বার্ণস জানেন অনেকে তাঁর উপর চটা। কর্তাদের অনেকের সঙ্গে তাঁর পীরিত নেই। সে কার দোষ? এই সেদিন। সিডনির ড্রেসিংরুম থেকে কয়েকজন

কর্মকর্তাকে চলে যেতে বলেছিলেন বার্ণস। না বলে উপায় ছিল কি? ক্রিকেটের ক' বোঝে না, কেবল নানা আজেবাজে কথা বকে নতুন ছোকরা খেলোয়াড়দের মাথা গুলিয়ে দেবে। বার্ণস জানেন আলোর আবেদন নিয়ে অনেকে তাঁর ব্যবহারে বিরক্ত হয়েছে। এতে বার্ণসের দায়িত্ব কোথায়? তিনি তো ক্যাপ্টেনের আদেশ মেনেছেন। মেলবোর্ণ মাঠে ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে খেলায় তাঁর অঙ্গভঙ্গি অনেকের ভালো লাগেনি। কিন্তু বার্ণস কি একা দলকে বাঁচা. নি? তাছাড়া একটু চাঞ্চল্য না থাকলে খেলাধুলা বাঁচে কি করে? সেদিন সকলকে কে মাতিয়ে রেখেছিল? ১৯৪৮ সালে ইংলণ্ডে ছবি তোলা নিয়ে কেউ কেউ নাকি বলেছে, বার্ণস রাজা রাণীকে অপমান করেছেন। সর্বৈব মিথ্যা। রাজার এডিকং লর্ড গাউরির অনুমতি নিয়ে তবে ছবি তুলেছেন। উপরন্তু রাজা রাণী সন্তুষ্টই হয়েছিলেন। ছবি তুলতে নাকি এম সি সি কর্তৃপক্ষ চটেছিলেন, মাঠের ছবির স্বত্ব আগে থেকে অন্য কোম্পানীকে বেচে দেওয়া হয়েছিল। মজা মন্দ নয়। সিডনি বার্ণসের ছবি তোলার স্বত্ব বেচে দেওয়া হল, অথচ স্বয়ং বার্ণস তা জানলেন না। আর সেটা লঙ্ঘন করলেই যত দোষ।

বার্ণস পায়চারি করতে করতে ভেবে পেলেন না তাঁর অন্যায়টা ঠিক কোথায়? একটা পুরনো ঘটনা মনে পড়ল। অনেকে এখনো সেই ঘটনা স্মরণ করিয়ে খোঁচা দেয়। পাঁচ বছর আগেকার তুচ্ছ ব্যাপার। মেলবোর্ণে বার্ণস ঘোরানো দরজা টপকে ভিতরে ঢুকেছিলেন। বার্ণস দৃঢ়ভাবে নিজের মনে বললেন, আমার কোন দোষ নেই সে ব্যাপারে, একেবারে না। আমি যথেষ্ট ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছিলাম সেদিন।

ইংলণ্ডের সঙ্গে মেলবোর্ণে তৃতীয় টেস্ট, ১৯৪৭। বার্ণস খেলছেন।

বার্ণস সকালে দুটি টেস্ট ক্রিকেটের টিকেট দিয়ে এসেছেন নিউজিল্যাণ্ড থেকে আগত এক বন্ধু দম্পতিকে। খেলোয়াড়েরা মাত্র দুটি টিকেটই পায়। ফলে এমনকি বার্ণসের স্ত্রী পর্যন্ত খেলা দেখতে যেতে পেলেন না।

খেলা সুরু হতে বেশী বাকি নেই, বার্ণস গেটে গিয়ে দেখলেন লম্বা কিউ। ক্রম অনুযায়ী গেটে পৌঁছে ঢুকতে যাবেন, গেটকীপার টিকেট চাইল। টিকেট দিতে গিয়ে দেখেন—কি মুশকিল! নিজের অ্যাডমিশন টিকেট হোটেলে ফেলে এসেছেন। গেটকীপারকে বললেন, দেখ, আমি সিডনি বার্ণস, সুরুতেই আমার ব্যাট করার কথা। টিকিট ভুল করে ফেলে এসেছি। আমাকে ঢুকতে দাও।

গেটকীপার বলল, টিকেট ছাড়া ঢুকতে দেওয়া বারণ।

যন্ত্রণা। এখন করি কি। এখনি খেলতে হবে অথচ ফিরে টিকেট আনবার সময় নেই। বার্ণস গেটকীপারকে অনুরোধ করেন, যদি ডন ব্রাডম্যান বা ম্যানেজারকে ডেকে দেয়। গেটকীপার কোনো কথা শুনতে রাজী নয়। বার্ণস আবার বোঝাবার চেষ্টা করেন, দেখ আমি বার্ণস। তুমি আমাকে চেন। গতকাল থেকে আমি নট আউট আছি। আমাকে এখনি খেলতে হবে। আমার নাম লিখে দরজা ছেড়ে দাও। গেটকীপার জানালো, লোকের ভীড়, বার্ণস ঝামেলা না বাড়ালেই ভাল করবেন।

শোন,—এইবার কড়া গলায় বার্ণস বলেন—আমাকে মাঠে ঢুকতেই হবে। যথেষ্ট দেরী হয়ে গেছে। তুমি অবস্থা বুঝেও কিছু করছ না। কাউকে ডেকেও দিচ্ছ না। নিজের ব্যবস্থা আমি নিজেই করছি।

বার্ণস ঘোরানো দরজা টপকে মাঠে ঢুকলেন।

এতে অন্যায়টা কি? ভুল তো মানুষের হয়। টিকেট আনার সামান্য ভুলের চেয়ে বেশী অন্যায় কি হত না, যদি যথাসময়ে ব্যাট করতে না নামতেন? টপকে ঢুকেছেন বলে ক্ষমা প্রার্থনা? অসম্ভব। মিঃ অক্সলেডের সে অনুরোধ রাখতে পারেননি বলে বার্ণস দুঃখিত, কিন্তু অকারণে ক্ষমা চাইবার বান্দা নন সিডনি বার্ণস।

আর একটা কথা বার্ণসের মনে পড়ল। দাঁতে দাঁত চেপে উচ্চারণ করলেন জা-নো-য়া-র! কেউ কেউ নাকি বলেছিল, বার্ণসের এই

স্বভাব। নিজের টিকেট বেচে দিয়ে চালাকি করে ঢুকতে চেয়েছিল। গর্দভদের কে বোঝাবে যে, এস জি বার্ণস লেখা কার্ড নিয়ে আর কেউ মাঠে প্রবেশ করতে পারে না।

বাইরে গাড়ীর হর্ণ শোনা গেল। বার্ণসের চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ল। দেখা করতে উঠে গেলেন।

কয়েকদিন পরে। সন্ধ্যার দিকে বার্ণস ঘরে বসে। একমনে কতকগুলো কাগজের কাটিংস নাড়াচাড়া করছেন। একটি মেয়ে ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করল। উঁকি দিয়ে দেখল। করুণ হয়ে উঠল মেয়েটির মুখ। তারপর চেষ্টা করে মুখে হাসি ফুটিয়ে বার্ণসের পাশে এসে পিঠে হাত রাখল।—সিড, কি দেখছ?

কি বলছ এলিস?

কাগজগুলো আর কত নাড়াচাড়া করবে? তার চেয়ে চল সিনেমা দেখে আসি।

সিনেমা? আজ থাক। দেখনা—বার্ণস উৎসাহিত হয়ে বলেন, আজ আবার আমার পক্ষে কাগজে লিখেছে।

দেখি দেখি,—আগ্রহের সঙ্গে মিসেস বার্ণস হাত বাড়ান।—আমায় দাও, আমি পড়ে দেখি।

শ্রীমতী বার্ণস জানেন, স্বামীর দুর্বহ জীবনে এই এক সান্ত্বনা। খবরের কাগজে তাঁর পক্ষে যে সব লেখা হয়েছে তার কাটিংস করা ও পড়া। শ্রীমতী বার্ণস ইচ্ছে করে ঐ সব কাটিংস পড়ে পড়ে শোনান। ওরিলির সুস্পষ্ট লেখা ঝক্‌ঝক্ করে ওঠে—বার্ণস এমন একজন মানুষ, যাকে আমি বহু বিষয়ে প্রশংসা করি। সে যে-গতিতে ক্রিকেট অধিকর্তাদের তীক্ষ্ণ সমালোচনা করতে পারে, সেই গতিতে তাঁদের কাছে মাথা নামাতে পারে না। সে 'যো-হুজুর' নয়। একেবারে নয়। তার এমন জটিল ব্যক্তিত্ব যে, সে সহজেই জনতার গুলতানির উপরে নিজেকে তুলে রাখে।

আর্থার মেইলীর ভাষা আরো তীব্র—'অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটের কূটনীতির দিকটিকে যে আবরণ ঘিরে রেখেছে, তার তুলনায় 'লৌহ যবনিকা'ও ফিনফিনে মশারি।

শ্রীমতী বার্ণস কাগজ উল্টে যান। কোথাও লেখা হয়েছে, টেস্ট ক্রিকেট ব্যবস্থাপকদের পৈতৃক সম্পত্তি নয়, অস্ট্রেলিয়ার একজন সেরা খেলোয়াড়কে 'অকারণে', আরো ঠিকভাবে বলতে গেলে, রহস্যময় কারণে বাদ দেবার কোন অধিকার নেই বোর্ডের। কেউ লিখেছেন, ইদানীং ক্রীড়া সংস্থাগুলি বৃটিশ ক্যাবিনেটের চেয়েও বেশী গুপ্ত ব্যাপার হয়ে উঠছে। কিংবা লেখা হয়েছে,—সারা পৃথিবী ক্রিকেট ডিক্টেটারে ছেয়ে গেছে। অনেকেই প্রশংসা করেছে বার্ণসের স্পষ্ট কথার। ক্রিকেট কর্তৃপক্ষের 'আদুরে অঙ্গে' বার্ণস যে খোঁচা দিয়েছেন, এতে অনেকেই প্রকাশ্যে আনন্দ জানিয়েছেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে কবরের নীরবতার সমারোহ, সিড বার্ণস বা এরিক রোয়ানের মত চরিত্র তার ভিতরে প্রাণ-স্ফুলিঙ্গ।

বার্ণসকে সবচেয়ে বল দিয়েছে ডাঃ ইভাটের বিবৃতি। ডাঃ ইভাট একজন স্মরণীয় অস্ট্রেলিয়ান। বিরোধী পক্ষের নেতা তিনি। রাষ্ট্রপুঞ্জের সভাপতি ছিলেন।—

> "আমি নির্দিষ্টভাবে মনে করি, নিউ সাউথ ওয়েলসের অধিনায়ক বার্ণসকে নির্বাচন করে পরে বাদ দেওয়া ব্যক্তি এবং রাজ্য উভয়ের উপর আঘাত। যথাশীঘ্র সম্ভব এই অপমান দূর করা উচিত।
>
> "আমি নিঃসন্দেহ যে, বার্ণস মাঠে কিংবা মাঠের বাইরে এমন কোন অসদাচরণ করেন নি, যা তাঁর নামে কলঙ্কারোপ করতে পারে।…
>
> "এই ধরণের অন্যায় নিবারণের জন্য ক্রিকেটে বিচার বিভাগীয় তদন্তের ব্যবস্থা থাকা উচিত। যে ব্যক্তি নিজ রাজ্যের পক্ষে খেলবার, এমনকি সে রাজ্যদলের অধিনায়কত্ব করবার

উপযুক্ত বলে বিবেচিত হতে পারেন এবং যিনি নিজ যোগ্যতা গুণেই টেস্ট দলে স্থানলাভ করেছিলেন, তাঁকে বাদ দিতে হলে ঐ বাদ দেওয়ার কারণ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, অনিবার্য এবং বিশ্বাসযোগ্য হওয়া চাই।

"এ ব্যাপারে বহু পরোক্ষ ইঙ্গিত করা হয়েছে, যাকে প্রকাশ্যে ব্যক্ত করতে কেউ সাহস করেন নি। এখনি সংশ্লিষ্ট সকলকে ঐ সমস্ত অস্পষ্ট অভিযোগ প্রমাণ বা অপ্রমাণ করার সুযোগ দেওয়া উচিত। সেই হবে খেলোয়াড়ী মনোভাব এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের সুবিচারগত সম্পর্কের ভিত্তি।"

বার্ণসের স্ত্রী ধীরে ধীরে লেখাটি পড়তে লাগলেন। বার্ণসের মুখ ক্রমে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

আরো কয়েক দিন পরে। সকালে বার্ণস গাড়ী নিয়ে বেরুতে যাবেন, মেয়ে হেলেন ছুটে এল।

বাপি, এ গাড়ীটা কার?

কেন বলত? আমার।

মেয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে বলল, না তোমার নয়,—ও বাড়ীর আন্টি বলছিল, তুমি গাড়ী চুরি করেছ?

স্ত্রী এসে দাঁড়িয়েছিলেন। মেয়ের মুখে হাত চাপা দিয়ে নিয়ে চলে গেলেন চোখের জল চেপে। মাথা নামিয়ে সিঁড়ি দিয়ে টলতে টলতে নামতে লাগলেন সিড বার্ণস।

সেদিন গভীর রাত্রি। বার্ণস ছটফট করতে করতে পায়চারি করছেন। মাঝে মাঝে টাঙানো ছবি দুটোর কাছে দাঁড়াচ্ছেন। সহ্য হয় না, হয় না। একটা কাতরোক্তি করলেন। স্ত্রী পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।—শুতে চল, রাত হয়েছে।

যাচ্ছি, যাও।

না না, এখনি চল।

যাও—বিরক্ত করো না।

কয়েক মুহূর্ত পরে চমকে পিছনে ফিরে তাকালেন, না—স্ত্রী নেই। —আমার দোষ কোথায়? লোকের ভাল করেছি, তার এই ফল। তিক্ত হাসির সঙ্গে বার্ণস ভাবেন, এক লক্ষ টাকার উপর দান করেছেন রেডক্রশে—ক্রিকেট-ফিল্মের থেকে পাওয়া টাকা। বার্ণস উঠে দাঁড়ান। বুকের বাঁদিকে কেমন একটা বেদনা। ডাক্তারে বলেছিল, একস্ট্রা অর্ডিনারী। বুকের এমন চওড়া হাড় তিনি দেখেননি। হয়ত পোলার্ডের মার খেয়ে মরেই যেতেন, যদি হাড় চওড়া না হোত। আচ্ছা পোলার্ডের মারটা আমারই বুকে কেন? ঠিক ঠিক। ব্রাডম্যানের কথা শুনে ব্যাটের মুখে দাঁড়িয়ে ফিল্ডিং করছিলেন। ওতে নাকি অস্ট্রেলিয়ার সুনাম বজায় থাকবে, ইংলণ্ড হারবে। ব্রাডম্যান। অস্ট্রেলিয়া। ব্রাডম্যান কি করেছেন বার্ণসের জন্য? ছি ছি, বার্ণসের মন প্রতিবাদ করে ওঠে। বার্ণসের ব্যাপারে ব্রাডম্যান কোনো অন্যায় করতে পারেন না। এই তো আজকেই ব্রাডম্যানের উত্তর পেয়েছেন। অন্যতম নির্বাচক এবং বোর্ডের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও ব্রাডম্যান বার্ণসকে চিঠি লিখতে দ্বিধা করেন নি। স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন, বার্ণস সম্বন্ধে সমস্ত গুজব মিথ্যে। সত্যি হতে পারে না। বার্ণসকে তিনি জানেন। ইংলণ্ডে বার্ণস গাড়ী চুরি করেছে? সর্ব্বৈব মিথ্যে। ওসব কাদা ছিটোবেই লোকে যদি বিখ্যাত হয় কেউ। ব্রাডম্যানের নিজেকেও কম অপমান সহ্য করতে হয়নি। ব্রাডম্যানের হাস্যোজ্জ্বল ছবির সামনে দাঁড়িয়ে বার্ণস বিড়বিড় করে বলেন, Don, you are great, you are great. বার্ণস আবার পায়চারি করতে থাকেন। হাজার চিন্তা মাথায় ভিড় করে আসে। সব এলোমেলো কথা। অনেক রাত ঘুম হয়নি। সখ করে কেনা টুপিটা ছুঁড়ে ফেলে দিতে কে যেন বলেছিল! আচ্ছা, জীবনে কবার বেড়া টপকেছি? বেড়া টপকানোই আমার কাল। আমাকে লোকে ভালবাসে, না অপছন্দ করে? জীবনে কী পেলাম!

বার্ণস ক্লান্ত হয়ে সোফাতে গিয়ে বসেন। মাথা ঢলে পড়ে হাতলের উপর। চোখ বোজেন। নিথর নীরবতায় ঘড়ি টিক্ টিক্ করে চলে। ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় কতকগুলো অশরীরী চিন্তা :

আমার দুটি সম্বল—ক্রিকেট-সামর্থ্য ও আত্মবিশ্বাস।

আমি জানতাম ব্রাডম্যান কত বড় খেলোয়াড়, আমাকে পার্টনার-রূপে আচ্ছন্ন করে রাখতেন। সহসা জেগে উঠলুম। নিজেকে বললুম, সিড, তুমি এ কী হয়েছে ?

বিশ্ববীরের পাশে আমার নিজ মূর্তির উদয় হল।

জীবনে দান কম করিনি।

টাকা! টাকা! টাকা! টাকার লোভে কর্তৃপক্ষ পাগল।

আমি বাস্তববাদী। টাকার দাম বুঝি। টাকা অত সস্তা নয়।

গৌরবের সঙ্গে হারাও ভাল, নীচভাবে জেতার চেয়ে।

ব্যাটের মুখে দাঁড়িয়ে ব্যাটসম্যানকে বিরক্ত করা কি গৌরবজনক ?

জীবনে কোনোদিন মদ বা সিগারেট ছুঁইনি। কোনো বদভ্যাস নেই ?

মেয়েরা আমাকে কি বলে ডাকত, গভর্নর জেনারেল, না ?

মিলারের ম্যানারিজম্ জঘন্য। অসহ্য। বিশৃঙ্খল মনের চিহ্ন। খেলুড়ে নাচুনে মিলার। খোকা :

খেলায় কিন্তু আনন্দ পাওয়া ও দেওয়া সবচেয়ে বড় জিনিস।

টেস্ট ক্রিকেট মজার ব্যাপার নয়। সেখানে লড়তে হয়।

'বার্ণস ! সেই বদ লোকটি আবার ?'

আমাকে একটা ডিউকের মত দেখাচ্ছিল।

আচ্ছা রাজা কোন্ দোকান থেকে পোষাক করান ?

আমি কোনোদিন মহা মহা ব্যক্তির চাউনি বা কথায় এলিয়ে পড়িনি।

বাড়াবাড়ি রকম বিনয় করে লাভ নেই, আমি ইচ্ছে করলে টেস্টে উইকেটকীপার হতে পারতাম।

আমি চাই অন্যেও আমাকে পছন্দ করুক।

সেই বাল্যকালেই আমার নিজের বলে একটি মন ছিল।

শূন্য কিংবা সেঞ্চুরী—ব্রাডম্যানের নাম মুখে মুখে। আমার ঐ জিনিস চাই।

আমি কারো পোঁ ধরে থাকা পছন্দ করি না—ব্রাডম্যানেরও।

স্ট্রাইক নেওয়ার ব্যাপারে আমি ব্রাডম্যানের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করেছি। সবচেয়ে বেশী যা চেয়েছি— সমান অংশ।

আমি জানি প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে আমাকে সেঞ্চুরীর পর সেঞ্চুরী করে যেতে হবে।

আমি এখন পৃথিবীর সেরা ব্যাটসম্যান। হাঃ হাঃ হাঃ।

প্রচার চাই, গ্লামার চাই। ম্যাড়মেড়ে সাদামাঠা হয়ে লাভ নেই।

বেশ করেছি বেড়া টপকেছি। তোর কি ?

একমাত্র ব্রাডম্যানই আমাকে শেখাতে পারেন।

বর্তমান অবস্থায় ব্যাটিং-এ আমি ব্রাডম্যানের সমকক্ষ।

ব্রাডম্যানের পরে খেলতে নামা শ্যাম্পেনের পরে সাদা বীয়ার।

ধন্যবাদ সিড, কম্পটন বলল।

I know my master. ব্রাডম্যান আমারি মত ইংলণ্ড যেতে উৎসুক।

সাফল্যের মিষ্টি বচন কোনো সময়েই আমাকে ভুলিয়ে রাখেনি। আমি বাস্তববাদী।

'বার্ণস, খেলতে দিচ্ছ না কেন?'

ডন, আমি তোমাকে পূজো করি।

যাক বাবা, এই একটা গণ্ডগোলের মধ্যে অন্ততঃ আমি নেই।

একজন ব্রাডম্যানের পক্ষেই নিয়ম ভাঙা সম্ভব।

আমাকে একজন বিশেষ করে চাইছে তার নাম ডোনাণ্ড জি ব্রাডম্যান।

'Barnes for reliability.'

যদি কর্তৃপক্ষ না থাকত পৃথিবীটা কি স্থন্দর হোত! কি স্থ-ন্দ-র হো-ত…

বার্ণসের স্ত্রী মধ্যরাত্রে ঘরে ঢুকে স্বামীর দেহের উপর একটা চাদর ঢেকে দেন। পর্দা টেনে দেন জানলার। একদৃষ্টে খানিকক্ষণ মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। অত বড় জোয়ান পুরুষালি মানুষটা কি

অসহায়! অসীম মনতায় মন ভরে যায়। কপালের উপর কয়েকটী চুল এসে পড়েছিল। মৃদুভাবে সেগুলো সরিয়ে দিয়ে ঘরে ফিরে যান।

বিকালে বাড়ীর পিছনের দিকে বার্ণস বেড়াচ্ছেন। স্ত্রীর বাগানের সখ। যত্নে সাজানো। নরম আলোয় মাখামাখি বৈকালী মধুরতা। অনেকদিন পরে মন একটু হাল্কা, ভালো লাগছে। মেয়ে হেলেন দৌড়ে এসে কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাকে আদর করতে ইচ্ছে হল। কোলে তুলে একটি বেঞ্চে এসে বসলেন। মেয়েটী অনেকদিন আদর পায়নি। বাবার কোলে মুখ গুঁজে চোখ বুজে বসে রইল। তার সোনালি চুলের মধ্যে আঙুল ডুবিয়ে নিগূঢ় একটী অভিমানে হঠাৎ বার্ণসের দু' চোখ ভরে গেল।

গাছের ফাঁক দিয়ে মায়াবী আলো এসে পড়েছে হেলেনের চুলে। মেয়েটী বাপের স্নেহের ছোঁয়ায় কেঁপে কেঁপে উঠছে। এমন সময় কি একটা বলতে মুখ তুলল। আলো এসে পড়েছে তার বাবার মুখেও। নিজের চক্‌চকে চোখ তার বাবা লুকোতে পারলেন না। হেলেনের মুখ শীর্ণ গম্ভীর হয়ে গেল। একটা অদ্ভুত শান্ত গলায় তার বাবার দিকে মুখ তুলে বলল, বাবা তুমি জিততে পার না।

শিউরে উঠলেন বার্ণস। কন্যাকণ্ঠে কার কণ্ঠ শুনলেন? ঠিক তো। বার্ণস বা তাঁর স্ত্রী অপমান সহ্য করতে পারেন, কিন্তু নিষ্পাপ সন্তান দুটির উপর পিতৃকলঙ্ক চাপিয়ে দিয়ে যাবার কি অধিকার? লড়তে হবে। জিততে হবে। শেষ কপর্দক পর্যন্ত যাক, তবু।

হেলেনের চুল জ্বলজ্বল করছে। মুখে অপরিচিত আভা। কন্যার ললাটে চুম্বন করলেন বার্ণস। নির্ভয় শান্ত সুরে বললেন, তাই হবে মা।

দীর্ঘ আটমাস পরে পট উঠল। ২২শে আগস্ট ১৯৪৭। শুক্রবার। এগারোটা বেজে তের। সিডনির জেলা জজ মিঃ লয়েডের

আদালতে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের সেক্রেটারী মিঃ জিনস্ পদার্পণ করলেন।

সিডনি বার্ণস মামলা রুজু করেছেন স্টানমোরের জনৈক মিঃ রেথের নামে। জে এল রেথ সিডনি ডেলী মিরারে একটি চিঠি লিখেছিলেন এই মর্মে :

'মিঃ স্ট্রাসি অ্যাটকিন মন্তব্য করেছেন, সিড বার্ণস সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যক্তির যে সকল মত বেরিয়েছে, তাতে তিনি কোথাও বোর্ডের পক্ষ সমর্থন দেখতে পান নি। বোর্ড-সদস্যদের মুখ বন্ধ বলে এ কথা মনে করার কারণ নেই তাঁরা একেবারে সমর্থনশূন্য।

'বোর্ড একটি নিরপেক্ষ সংস্থা; ক্রিকেটের জন্য যাঁদের দানের সীমা নেই এমন সমস্ত ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত। এটি সকলের কাছে খুব স্পষ্ট যে, গুরুতর কারণ না থাকলে শুধুমাত্র খেয়ালবশে বোর্ড বার্ণসকে বাতিল করতেন না।

'বার্ণসের অনুরোধমত বহিষ্কারের কারণ জানাতে অস্বীকৃত হয়ে বোর্ড তাঁর প্রতি সদাশয়তার পরিচয়ই দিয়েছেন। ক্রিকেট-প্রিয় বিপুল জনগণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমি জানাচ্ছি, বোর্ডের প্রতি আমাদের সর্বান্তঃকরণের সমর্থন আছে এবং আমি মিঃ বার্ণস ও তাঁর সমর্থকদের জানাতে পারি, ব্যাপারটাকে এইখানে ইতি করতে দেওয়াই মঙ্গল।'

আত্মসম্মান রক্ষার শেষ উপায়রূপে মিঃ রেথের বিরুদ্ধে সিডনি বার্ণস মামলা দায়ের করেছেন।

বার্ণসের পক্ষে সুবিখ্যাত আইনজীবী মিঃ শ্যাণ্ড। মিঃ রেথের পক্ষে মিঃ স্মিথ।

বোর্ডের সেক্রেটারী মিঃ জিনস্ টুপি ও ওভারকোট খুলে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়ালেন।

বিবাদী পক্ষ থেকে মিঃ স্মিথ মিঃ জিনসকে কণ্ট্রোল বোর্ডের কাগজপত্র পেশ করতে বললেন। মিঃ জিনস্ আপত্তি করলেন—

কাগজপত্র গোপনীয়। মিঃ জিনসের আপত্তি নাকচ করে দিলেন বিচারপতি ।

নথিপত্র পেশ করতে বাধ্য হলেন সেক্রেটারী, 'গোপনীয়' কাগজপত্র পর্যন্ত।

বার্ণস। শূন্য রানে বোর্ডের এক উইকেট পতন।

মিঃ জিনস্ টুপি তুলে নিলেন, কোট পরলেন, 'ক্ষমা' নিলেন এবং কাগজপত্র পিছনে ফেলে এডিলেডের দিকে প্রস্থান করলেন।

খাতাপত্রের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল আইনজীবীরা। উজ্জ্বল হয়ে উঠল মিঃ স্মাণ্ডের মুখ। বিমর্ষ হয়ে পড়লেন মিঃ স্মিথ।

সাক্ষীর কাঠগড়ায় মিঃ সিডনি বার্ণস। মিঃ স্মাণ্ড জেরা সুরু করলেন ।

বার্ণস জানালেন, প্রত্যেক ট্যুরের শেষে তিনি শোভন আচরণের বোনাস পেয়েছেন বোর্ডের কাছ থেকে। ১৯৪৮ সালের সাফল্যমণ্ডিত সফরের স্মারকরূপে একটি রূপার সিগারেট বাক্সও তাঁকে দেওয়া হয়েছে।

বিবাদী পক্ষের মিঃ স্মিথ জেরা করতে উঠলেন। বার্ণস কাঠগড়া জোর করে চেপে ধরেন। লুকোবার কিছু নেই, সাহসের সঙ্গে সত্য বলে যাবেন।

মিঃ স্মিথ মাত্র পাঁচ মিনিট জেরা করলেন। অত্যন্ত অসুখী ভাবে ।

মিঃ বার্ণস বিবাদী মিঃ রেথকে কি আপনি জানেন ?

না।

আপনি কি মনে করেন, আপনার বিরুদ্ধে তাঁর কোনো ব্যক্তিগত বিদ্বেষ আছে ?

আমি মনে করি না।

আপনি নিশ্চয় আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, আপনি ক্রিকেট ছাড়া অন্য কারণে বাতিল হয়েছেন একথা শোনার পর জনসাধারণ ব্যাপারটাকে গুরুতর মনে করতে পারে ?

তা পারে।

আপনিই সংবাদপত্রে এ বিষয়ে আলোচনা সুরু করেছেন ?

হ্যাঁ। আমি চেয়েছি আমার চরিত্র কলুষমুক্ত হোক।

তাহলে আপনি নিশ্চয় আশা করেন, জনসাধারণ এই বিতর্কে অংশ নেবে ?

হাঁ।

আপনি অবশ্য আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, বোর্ডের মত দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান যখন কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে, সে ক্ষেত্রে সেই ব্যবস্থাকে মিঃ রেথের মত একজন বাইরের লোক যুক্তিযুক্ত বলে বিশ্বাস করলে দোষ করবেন না।

না, করবেন না।

মিঃ স্মিথ আসন নিলেন।

ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের চেয়ারম্যান মিঃ অক্সলেড সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠে জানালেন—স্যার ডোনাল্ড ব্রাডম্যান, মিঃ কুশ এবং তিনি বার্ণসের বিতাড়নের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলেন।

মিঃ স্মিথ প্রশ্ন করলেন,—বার্ণসের বিরুদ্ধে অভিযোগ কি ?

মিঃ অক্সলেড। বার্ণসের কতকগুলো আচরণ অনেকের কাছে আপত্তিকর মনে হয়েছিল। যেমন কয়েক বছর আগে মেলবোর্ণে দরজা টপকানো, ১৯৪৮ সালে ইংলণ্ডে ফিল্ম তোলা, দর্শকদের সামনে টুপি খুলে অভিবাদন ইত্যাদি।

এই সমস্ত আচরণ সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি ?

এই সবে আমি খুব গুরুত্ব দিই না বা নিজে আহত হইনি। তবে ওগুলো ছেলেমানুষি।

বার্ণস মানুষ হিসাবে কেমন ?

ড্যায়ন্যামিক চরিত্র। দর্শকদের আমোদ দেয়, কর্তৃপক্ষকে নয় সব সময়।

তাকে দল থেকে বাদ দেওয়া সম্বন্ধে আপনার মত কি ?

আমি তার ঘোর বিরোধী।

মিঃ অক্সলেড আরও জানালেন, ১৯৪৮ দলের ম্যানেজার মিঃ কিথ জনসন দলের সদস্যদের সম্বন্ধে মৌখিক ও লিখিত দু'রকম রিপোর্ট দিয়েছেন। লিখিত রিপোর্টে সদস্যদের আচরণের প্রশংসা করা হলেও মৌখিকভাবে বার্ণসের বিরুদ্ধে বলেছেন মিঃ জনসন। বার্ণস একবার খেলার দ্বাদশ ব্যক্তি টোসাককে টেনিস খেলতে কিছু দূরে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাছাড়া বার্ণসের ফিল্ম তোলা মিঃ জনসন পছন্দ করেন নি।

মিঃ স্যাণ্ড। আপনি কি মনে করেন না যে, ফিল্ম তোলা বিষয়ে বার্ণসকে পূর্বাহ্ণে মিঃ জনসনের সতর্ক করে দেওয়া উচিত ছিল ?

মিঃ অক্সলেড। আমার তাই বিশ্বাস।

১৯৪৮ দলের ম্যানেজার কিথ অরমণ্ড হেডলি জনসনের প্রবেশ।

মিঃ স্যাণ্ড জেরা সুরু করলেন।

আপনি বার্ণসের পক্ষে না বিপক্ষে ভোট দিয়েছিলেন ?

বিপক্ষে।

বার্ণসের বিরুদ্ধে অভিযোগ কি ?

অনেক আছে। যথা, মেলবোর্ণে দরজা টপকানো, ইংলণ্ডে একাকী ভ্রমণের অনুমতি প্রার্থনা, ইংলণ্ডে মুভি ছবি তোলা, দ্বাদশ ব্যক্তি টোসাককে প্যাভিলিয়ানের ৩০০ গজ দূরে টেনিস খেলতে নিয়ে যাওয়া।

মিঃ স্যাণ্ড ধীরে ধীরে কেটে কেটে বলতে সুরু করলেন—

দল থেকে কাউকে বাদ দেওয়াকে, মিঃ জনসন, আপনি কি খুব গুরুতর ব্যাপার মনে করেন না, যেখানে তার দ্বারা খেলোয়াড়টির ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে ?

তা ঠিক।

মিঃ জনসন, ম্যানেজাররূপে মূলত তরুণ বয়স্ক খেলোয়াড়দের দ্বারা গঠিত দলের কাছে কার্যত আপনি পিতাস্বরূপ—এ কথা কি স্বীকার করেন ?

করি।

মিঃ জনসন, আপনি নিশ্চয়ই একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি ?

হাঁ।

আপনি লিখিত রিপোর্টে জানিয়েছেন, অস্ট্রেলিয়ান দল ১৯৪৮ সালে ইংলণ্ডে যে ব্যবহার করেছে, তা যোগ্য প্রতিনিধির ব্যবহার—এ কথা কি ঠিক ?

হাঁ ঠিক।

ঐ দলের একজন সদস্য বার্ণেসের আচরণ এমন হয়েছিল যে, পরে তাকে দল থেকে বাদ দেওয়া হয়। তাহলেও সে যোগ্য প্রতিনিধি আপনার বিবরণ অনুসারে!

অনেক চিন্তার পর –

আপনার অনেক চিন্তার বিষয়ে আমার কৌতূহল নেই।

আমি সমস্ত দল সম্বন্ধে যুক্ত রিপোর্ট দিয়েছিলাম।

সকলের সম্বন্ধে স্বীকার করছেন ?

হাঁ।

তবু তাদের মধ্যে একজনের আচরণ এমন জঘন্য ছিল যে, পরে তাকে দল থেকে বাদ দিতে হোল ?

পরবর্তী ঘটনার আলোকে—

আপনি বলছেন ঐ রিপোর্ট সকলের সম্বন্ধে প্রযোজ্য। কিন্তু আপনার মনে তা ছিল না, কি বলেন ?

একজনকে বাদ দিলে সকলের সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

আমি ব্যতিক্রমের কথা জিজ্ঞাসা করছি না। গোটা রিপোর্টে তাহলে ভুল আছে ?

হাঁ।

তাহলে আপনার রিপোর্ট মিথ্যা ?

একটি ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিকর।

একটি ক্ষেত্রের কথা বাদ দিন, রিপোর্ট মিথ্যা কি না বলুন ?

হাঁ।

বার্ণসের বিরুদ্ধে আপনার কোনো ব্যক্তিগত বিদ্বেষ আছে ?

না, বরং সে পছন্দ করার মত মানুষ।

বোর্ডের কাছে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবেন, একথা বার্ণসকে জানিয়েছিলেন ?

না।

আপনি নিশ্চিয় জানতেন না, রাজা-রাণীর ছবি তোলার আগে বার্ণস লর্ড গাউরির কাছ থেকে অনুমতি নিয়েছিলেন, কি বলেন ?

না, জানতাম না।

সফরকারী দল সম্বন্ধে এই প্রকার বিবরণী বিভিন্ন রাজ্য সংস্থায় পাঠানো হয়।

হাঁ।

দল সম্বন্ধে তারা একটি বিভ্রান্তিকর বিবরণী পাবে ?

হাঁ।

মিঃ জনসন, একথা কি সত্য, বার্ণস দল থেকে বাদ দেওয়ার কারণ সম্বন্ধে প্রচারিত গুজবের বিষয়ে প্রশ্ন করে আপনার কাছে চিঠি লিখেছিলেন, তখন আপনি গুজবে কথিত কারণের সত্যতা অস্বীকার করে একটি চিঠি লিখেছিলেন বার্ণসের কাছে ? এবং ঐ চিঠির তলায় আপনার স্বাক্ষরের উপরে লেখা ছিল 'আপনার বিশ্বস্ত' ?

হাঁ, সত্য।

কিন্তু মূলত গুজবে প্রচারিত কারণের জন্য বার্ণসকে দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল ?

হাঁ।

আপনি নিজেকে একজন বিশ্বস্ত ও দায়িত্বশীল ব্যক্তি মনে করেন ?

হাঁ।

ইংলণ্ডে একাকী ভ্রমণে অনুমতি দিতে অস্বীকার করলে বার্ণস আপনার কর্তৃত্ব স্বীকার করত ?

হাঁ।

আদালতের কার্য স্থগিত হবার সময় হয়েছে। জেরায় বিপর্যস্ত ও বিভ্রান্ত মিঃ জনসনকে মিঃ স্যাণ্ড ভেবে আসতে বললেন, বার্ণসের কোন্ অপরাধটা তাঁর চোখে সবচেয়ে গুরুতর মনে হয়েছিল ?

পরদিন সাক্ষীর কাঠগড়া থেকে মিঃ জনসন জানালেন, বার্ণসের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ফিল্ম তোলা। তারপর, টোসাককে টেনিস খেলতে নিয়ে যাওয়া। তারপর, একাকী ভ্রমণে অনুমতি চাওয়া। মিঃ জনসন স্বীকার করলেন, দরজা টপকানোর খুঁটিনাটি তাঁর মনে নেই।

জেরার মুখে জনসন মেনে নিলেন যে, ১৯৪৭ সালে মেলবোর্ণে দরজা টপকানো সত্ত্বেও যে বোর্ড বার্ণসকে তার পরবর্তী তিন সিরিজের জন্য মনোনীত করেছিল মিঃ জনসন সেই বোর্ডে ছিলেন। মিঃ স্যাণ্ড প্রশ্ন করলেন, তাহলে দরজা টপকানো বার্ণসকে বাদ দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট কারণ নয় ? মিঃ জনসন বললেন, না। টোসাককে টেনিস খেলানো কি এককভাবে বার্ণসকে বাদ দিতে পারে ?—না। দরজা টপকানো এবং টেনিস একসঙ্গে বার্ণসকে বাদ দিতে পারে ?—না। এমন কি টেনিস ও ফটো তোলা মিলিয়েও মিঃ জনসনের মতে বার্ণস বাদ পড়তে পারেন না। তবে টেনিস ও ফটো তোলার সঙ্গে দরজা টপকানোকে যোগ করলে বার্ণস বাদ যেতে পারেন—মিঃ জনসনের অভিমত। মিঃ স্যাণ্ড সিদ্ধান্ত করলেন, তাহলে দরজা টপকানোই বার্ণসের বিরুদ্ধে পাল্লা ঝুঁকিয়েছে।

মিঃ স্যাণ্ড। আপনি দরজা টপকানোর খুঁটিনাটি স্মরণ করতে পারেন না, অথচ ১৯৫১ সালে সেই ঘটনা মনে আনার পরে তা এমন গুরুতর হয়ে উঠল যে, তার ধাক্কাতে বার্ণস বাতিল হয়ে গেলেন ?

হাঁ।

ধরুন, ঐ দরজা টপকানোর পটভূমিকা। আপনি নিশ্চয় একথা মানবেন, কোনো আন্তর্জাতিক খেলায় গত দিনের নট আউট খেলোয়াড় পরদিন যখন মাঠে প্রবেশ করতে গেলেন, তখন যদি যথেষ্ট সময় হাতে না থাকে, তাহলে তিনি খুব বিচলিত থাকতে পারেন।

হাঁ নিশ্চয়।

টোসাকের টেনিসের ব্যাপারটি ধরা যাক। আচ্ছা মিঃ জনসন, আপনি কি সন্ধান করেছিলেন টোসাক ও বার্ণেসের মধ্যে কে কাকে 'ফুসলে' নিয়ে গিয়েছিল?

না।

ধরুন মিঃ জনসন, এই ডিসেম্বরে একটা টেস্ট খেলা হবে, এবং বার্ণেস টপ ফর্মে আছেন। আপনি কি তার অন্তর্ভুক্তির অনুকূলে থাকবেন?

বিব্রত মিঃ জনসন বিচারপতিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, হিজ অনার, আমাকে কি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে?

হিজ অনার। কোন বাধা নেই। উত্তর না দেবার কারণ কি?

মিঃ জনসন। আমি বলব—না।

মিঃ স্যাণ্ড। তার মানে আপনি তাকে ক্রিকেট-সামর্থ্য ছাড়া অন্য কারণে বাতিল করবেন।

বর্জ্জনের কারণ জানিয়েছি।

আপনি এখনো নিজেকে ন্যায়-বুদ্ধিসম্পন্ন মনে করেন?

হাঁ।

মিঃ স্যাণ্ড দুষ্ট কৌতুকের সঙ্গে প্রশ্ন করে চললেন,—

আগামী বছর একটা দল ইংলণ্ডে যাচ্ছে। ধরে নিন, ঐ দল-নির্বাচনের পূর্বে বার্ণেস এমন খেলা দেখালেন যে, রানের গড় দাঁড়াল দুশো, একটাও ক্যাচ ফসকালো না এবং তিনি অস্ট্রেলিয়ায় শ্রেষ্ঠ ফিল্ডস্‌ম্যান—

হিজ অনার। কিছু কিছু বোলিং-এর কথাই বা বাদ দিলেন কেন মিঃ স্যাণ্ড? হিজ অনার হেসে ফেললেন।

মিঃ স্যাণ্ড সহাস্যে বললেন, হাঁ বাদ যায় কেন? হঠাৎ বার্ণস ধীর ও দ্রুত উভয় প্রকার বল দারুণভাবে করতে সুরু করলেন। অস্ট্রেলিয়ায় তিনি সেরা ক্রিকেটার। তখন কি আপনি তাকে নির্বাচিত করবেন?

সকলের হাসি দেখে ক্ষুণ্ণকণ্ঠে মিঃ জনসন বললেন, সে সময় না আসা পর্যন্ত আমি মনস্থির করব না।

আপনি এখনি মনস্থির করুন। আমি তথ্য দিয়েছি।

এ প্রশ্নের আমি উত্তর দিতে পারি না।

আমি মাননীয় বিচারপতিকে অনুরোধ করব, তিনি যেন আপনাকে উত্তর দিতে বাধ্য করেন।

ভবিষ্যতের একটি সম্পূর্ণ অনুমানমূলক প্রশ্ন করা হয়েছে, আমি তার উত্তর কি করে দেব?

ধরে নিন, সেটি বর্তমানের জিনিস। বার্ণস বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ার শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়।

না, তাকে দলভুক্ত করব না।

এর উপর যদি অস্ট্রেলিয়ার জয় পরাজয় নির্ভর করে?

তবুও—না।

বার্ণসের বিরুদ্ধে আপনার কোনো বিরাগ আছে?

একেবারেই না।

আপনি যথেষ্ট পরিমাণে জাতীয় দৃষ্টি সম্পন্ন?

মনে তো হয়।

খেলার ব্যাপারেও?

হাঁ।

আপনি এখনো বিশ্বাস করেন, আপনি বোর্ডের সদস্য হবার উপযুক্ত?

হাঁ।

কপালের ঘাম মুছে মিঃ কিথ অরমণ্ড হেডলি জনসন সাক্ষীর কাঠগড়া থেকে নেমে গেলেন। মিঃ স্যাণ্ড চাপা কঠিন গলায় বললেন, বার্ণসের বিশ্বাসঘাতক বন্ধু।

মামলার শেষ হয়ে এল। বিবাদী পক্ষের উকিল মিঃ স্মিথ জুরীদের কাছে বক্তব্য উপস্থাপন করতে স্থুরু করলেন। আহা, মিঃ স্মিথ যা করলেন! মিঃ স্যাণ্ডও বোর্ডকে অমন ঘা দিতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। মিঃ স্মিথ চরম তিক্ত ভাষায় বিদ্ধ করলেন বোর্ডকে। বার্ণস-স্যাণ্ডের সঙ্গে রেথ-স্মিথ মামলার বদলে তা হয়ে দাঁড়াল বোর্ডের বিরুদ্ধে সকলের মামলা।

জুরীদের উদ্দেশ্যে নিজ বক্তব্য উপস্থিত করবার কালে বার্ণসের প্রতিপক্ষের উকিল মিঃ স্মিথ ক্রিকেট বোর্ডের বিরুদ্ধে লজ্জায় ও ঘৃণায় অভিশাপ উচ্চারণ করলেন। সত্যের নামে, জনস্বার্থের নামে তিনি জানালেন, বার্ণসের বিরুদ্ধে তাঁর মক্কেলের কটাক্ষ একেবারেই ভিত্তি-হীন। মাননীয় বিচারপতির ন্যায়বিচার যে, তাঁর মক্কেলের বিরুদ্ধে যাবে এ বিষয়ে মিঃ স্মিথের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, কারণ তাঁর মক্কেল এক জঘন্য ধরনের, চক্রান্তপরায়ণ ক্রিকেট-বোর্ডের উপর আস্থা স্থাপন করেছিলেন।

মিঃ স্মিথ বলে চললেন—

'আমি বা আমার মক্কেলের সামান্যতম ধারনাও ছিল না বার্ণসের বিরুদ্ধে অভিযোগ কি? আমরা এ বিষয়ে কোনো তথ্যও সংগ্রহ করতে পারিনি। আপনারা সকলেই এখন বুঝতে পারছেন, বোর্ড আমাদের সাহায্য করতে কেন অনিচ্ছুক ছিল, বা কাগজপত্র গোপন করতে এমন আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল।

'ভদ্রমহোদয়গণ, বার্ণসের পক্ষে ক্ষতিপূরণের যথাযথ পরিমাণ আপনারা নির্ধারণ করবেন। আমি কেবল আপনাদের একটি কথা

বলব, আপনাদের সিদ্ধান্তের দ্বারা আমার মক্কেলের বিরুদ্ধে ন্যায়ের যে ঘৃণা প্রকাশ পাবে, সেই ঘৃণা, অতি তুচ্ছ ও হাস্যকর কারণে অস্ট্রেলিয়ান একাদশ থেকে বার্ণসকে বিতাড়নকারী বোর্ড সম্বন্ধে যে কোনো ভদ্র নাগরিকের ঘৃণার পরিমাণের তুলনায় নিতান্ত সামান্য। আমার সকল মন্তব্য ও নিন্দাবাণী থেকে আমি মিঃ অক্সলেড, স্যার ডোনাল্ড ব্রাডম্যান এবং মিঃ কুশকে বাদ দিচ্ছি।

'আমাদের এখানে, তথাকথিত দায়িত্বশীল সদস্যদের দ্বারা গঠিত বোর্ডের পক্ষ থেকে কথিত এই সমস্ত সুগম্ভীর বচন শুনতে হয়েছে যে, ৬ বছর আগে বার্ণস কোনো একটি ঘোরানো দরজা টপকে গিয়েছিলেন, তারপর বার্ণস টুপি খুলে দর্শকদের কাছে মাথা নোয়ানোর মত ভয়াবহ, বোর্ডের দারুণ অস্বস্তিকর কাণ্ড করেছিলেন! আপনারা কখনো এ রকম আহাম্মকি শুনেছেন? তারপর উক্ত বার্ণস টোসাককে ৫০ ফুট, ৩০০ নয়, দূরে টেনিস খেলতে নিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর আছে ফিল্ম তোলার ব্যাপার, যে ব্যাপারে আপত্তিহীন সাক্ষ্যের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, বাদীর পার্শ্বচর লর্ড গাউরি তা অনুমোদন করেছিলেন এবং স্বয়ং রাজা ফটো তোলাতে আনন্দিত হয়েছিলেন। ম্যানেজার জনসন একটু আপত্তিও তখন করেন নি।

'আমার মক্কেল নির্বোধের মত—তাঁর নির্বুদ্ধিতা পরে প্রমাণিত হয়েছে—বিশ্বাস করেছিলেন যে, বোর্ড ক্রিকেটের একটি নিরপেক্ষ পরিচালকগোষ্ঠী। আপনারা সহজে অনুমান করতে পারেন, উক্ত নিরপক্ষদের সম্বন্ধে মিঃ রেথের বর্তমান মনোভাব কি?

'আপনাদের মনে থাকতে পারে, আমার সুবিজ্ঞ বন্ধু মিঃ স্যাণ্ড আপনাদের কাছে মামলার সূচনা করার সময় বলেছিলেন—কথাগুলি আবার আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি,—অভিযোগকারী এখানে ক্ষতিপূরণের অর্থলাভের আশায় আসেন নি। নিজের চরিত্রকে কলঙ্কমুক্ত করতেই এসেছেন। যদি তাই হয়, আমার মক্কেলের নির্দেশ অনুযায়ী আমি জনসমাজে জানাচ্ছি, মিঃ রেথের চিঠিতে বার্ণস সম্বন্ধে কোনো

কটাক্ষ থাকলে তবে তা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করা হচ্ছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে এই একমাত্র করণীয় কার্য। আমার মক্কেল আরো জানাচ্ছেন যে, যে-কারণে বোর্ড বার্ণসকে বিতাড়িত করেছেন সে কারণগুলি নিরতিশয় অসার এবং যথার্থ তথ্যের সঙ্গে পরিচিত হলে তিনি কখনই পূর্বোক্ত পত্র লিখতেন না। আমার মক্কেল বাদীর মামলার খরচ বহন করতে প্রস্তুত।

মিঃ স্যাণ্ড উঠলেন। শান্ত ও সানন্দ কণ্ঠে বললেন,—ঘটনার পরিণতি অনুযায়ী বলতে পারি,—বিবাদী বিদ্বেষবশে আমার মক্কেলের বিরুদ্ধে কটাক্ষ করেন নি। আমি আরো বলব, যখন সমস্ত জিনিস সুস্পষ্ট হয়ে উঠল তখন বিবাদী যে সাহসের সঙ্গে তাঁর পরিবর্তিত মত ঘোষণা করেছেন এবং পূর্বে আরোপিত কটাক্ষ প্রত্যাহার করছেন—সে সাহস, দুঃখের বিষয়, অন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে অনুপস্থিত।

হিজ অনার। তাহলে বিবাদী চিঠি লিখে বাদীর সুবিধাই করছেন।

মিঃ স্যাণ্ড। ঘটনাবশে, তাই বটে।

হিজ অনার। (জুরীদের প্রতি) উভয় পক্ষ কোন্ ভিত্তিতে নিজেদের মধ্যে মীমাংসা করতে চেয়েছেন, আপনারা শুনলেন। আপনারা জেনেছেন, অভিযোগকারী কর্তৃক মামলা দায়েরের কারণ অর্থাকাঙ্ক্ষা নয়,—নিজ চরিত্রের কলঙ্কমুক্তি। বর্তমান মামলাকালে কলঙ্কমুক্তি এমনভাবে হয়েছে যে, আপনাদের করবার আর কিছুই নেই।

মামলার শেষ। কোর্টের আর্দালী ডাকল—গড সেভ দি কুইন। সিডনির সংবাদপত্র লিখল—গড সেভ ক্রিকেট।

বার্ণস বললেন,—ও সব কথার মধ্যে আমি নেই।

বার্ণসের কাহিনী শেষ হল। আমি অনেক সময় নিয়েছি।

ধৈর্যের উপর কতখানি আঘাত করেছি জানি না। অনেকে হয়ত ক্রিকেটের কথা শুনতে পাব এই প্রত্যাশায় এই লেখা পড়ে হতাশ হয়েছেন ক্রিকেটারের ব্যক্তিজীবনের সাত কাহিনী শুনে। কৃতকর্মের কৈফিয়ৎ দেওয়া উচিত। আমি খেলা দেখেছি বেড়ার পাশে বসে। খেলার মধ্যে আমি চেয়েছি মানুষকে দেখতে। যে খেলায় মানুষ নেই, সে খেলা খেলাই নয়। সিড বার্ণসকে প্রাণজীবিত চরিত্ররূপে পেয়েছি ক্রীড়াজগতে।

আরো একটি কারণে বার্ণস-কাহিনী তুলে ধরেছি। দিন দিন ক্রিকেট ব্যবস্থাপকদের খেলা হয়ে উঠছে। খেলোয়াড়েরা সেই ব্যবস্থাপনার সজ্জাদ্রব্য। প্রয়োজক যেখানে ছাপিয়ে ওঠে পরিচালককে এবং পরিচালক যেখানে ওঠ বোস করান শিল্পীকে, সেখানে সৃষ্টি হয় না। সিনেমা জগতের এই হল দুর্গতি। এখন ক্রীড়াকালের 'প্রয়োজনীয়' আয়ু নির্ধারণ করে দেয় প্রযোজকরূপী কণ্ট্রোলবোর্ড, কারণ তার নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার দরকার। বোর্ডের নির্দেশ অনুযায়ী গ্রাউণ্ডসম্যান মাঠের যৌবন অটুট রাখার ব্যবস্থা করে দেয় বক্স অফিসের মুখ চেয়ে। এদের দাবি মেটাতে হাজার হাজার ক্লান্ত মানুষ মাঠে এসে বিনা প্রমোদে প্রমোদকর দিয়ে ক্লান্তভাবেই বাড়ী ফিরে যায়। পরদিন ঠিক একই ভাবে আবার তারা আসে (কারণ রুটিনের যেমন ক্লান্তি, তেমনি ক্লান্তির রুটিন), ধোপভাঙা জামা পরে খেলোয়াড়েরা মাঠে নামে এবং প্যাভিলিয়ান, ড্রেসিংরুম ও টিকেট ঘরের আশে পাশে ঘোরাফেরা করেন কর্মকর্তারা।

খেলোয়াড়েরা যেখানে হোটেলের পেশাদার নৈশ নর্তকের সমতুল, সেখানে কর্তৃপক্ষ তাদের যৌবন কিনবেন ইচ্ছামত, তাতে সন্দেহ কি? ক্রিকেটে এর নাম হচ্ছে, নতুন ট্যালেণ্ট সন্ধান। বিগত যৌবনেরা যতদিন প্রসাধনে চোখের কালি এবং কপালের রেখা ঢাকতে পারবেন, ততদিন তাঁদের করুণা করে গ্রহণ করা হবে,—যার নাম পুরনো

প্রতিভার বিচারশীল ব্যবহার। এমনি চলেছে ক্রিকেট-পৃথিবীর রঙ্গশালায়।

সিড বার্ণস ঘৃণায় চেঁচিয়ে উঠলেন—টাকা টাকা টাকা। টাকা ছাড়া কর্মকর্তারা অন্য কিছু চায় না। তাঁর প্রবল অমার্জিত অট্টহাস্য গড়িয়ে পড়ল ব্যাটের জোরালো হিটের সঙ্গে মাঠের চতুর্দিকে। কিন্তু হাসতে আছে মানা। কর্তৃপক্ষ বেড়া তুললেন। বার্ণস বেড়া টপকালেন। ক্রিকেট দপ্তরখানার গেটে কর্তৃপক্ষ টাঙিয়ে দিলেন—প্রবেশ নিষেধ।

বার্ণস কাহিনী আরো বলেছি এই কারণে—একটা আয়না জোগাড় করেছি অস্ট্রেলিয়া থেকে, যাতে অন্য কর্মকর্তারা নিজেদের মুখ দেখতে পারেন। অনেক বেদনার মার্জনে বার্ণস মুকুরটিকে উজ্জ্বল করতে পেরেছেন। যদি নিজের চেহারা দেখে তাঁরা বার্ণসকে বা আমাকে গাল দিয়ে বলেন,—কি বিশ্রী আয়না,—আমরা বলব, আয়নাটি বিশ্রী নয়, শ্রী নেই তাদের যারা দেখছে।

গল্প মনে পড়ে যায়। সুবিখ্যাত শিল্পী ধনশালী ব্যক্তির ছবি এঁকেছেন অনেক যত্নে। অনেক টাকা মিলবে। একেবারে হুবহু জীবন্ত ছবি হয়েছে। ছবি দেখে রেগে ওঠেন ধনী—পয়সা চাও আবার, লজ্জা করে না, জঘন্য শিল্প সৃষ্টি। শিল্পী বিনীতভাবে বোঝায়,—ছবি ঠিক আপনার মতই হয়েছে—একেবারে আপনার চেহারা। কি করব বলুন, আপনি যে ঈশ্বরের মন্দ সৃষ্টি।

বার্ণসের কথা লিখতে লিখতে আমি একটি 'মানুষ'কে পেয়েছি। মানুষ বলেই সে ভুল করে। আবার ঠিক করে। তাকে চিনতে যেন ভুল না করি। বার্ণস কখনো নিজেকে লুকোন নি। তাঁর নিজের জীবনের প্রত্যেক পদক্ষেপে এবং আত্মজীবনীর প্রতিটি পংক্তিতে বড় বড় অক্ষরে একটি শব্দ লেখা আছে--'আমি'। 'বিনয়ের ব্যাভিচার', নত মস্তকের বিষাক্ত দংশন, কিংবা প্রতাপের অসঙ্কুচিত আস্ফালনে সংসার যখন বাসযোগ্য থাকছে না, সেখানে বার্ণস একটি সুস্থ পুরুষের

পৃথিবীর বার্তা আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন। বার্ণসের জীবনের দুর্ভাগ্যের মূল এইখানে—নিজ ভূমি থেকে নির্বাসনে।

মানুষের জীবনের দুর্ভাগ্যও এইখানে। সে তার পৃথিবী পায় না। রোমান্টিক সম্বন্ধে তো নিশ্চয়ই, না-রোমান্টিক সম্বন্ধেও একথা সত্য। আমরা সকলেই আমাদের ভালবাসার ভুবনের সন্ধান করছি। পাচ্ছি না। যদি বুদ্ধিমান হই, তবে যাকে পাচ্ছি তাকেই মেনে নিই। যেমন মেনে নেয় সুশান্ত কয়েদীরা তাদের কারাবাসকে। জীবনের সঙ্গে কারাবাসের তফাৎ হল, জীবন-কারাকক্ষে বাড়তি কয়েকটি ফার্নিচার, দু'একটি খোকাখুকু এবং একটি (ভাগ্যবানের ক্ষেত্রে একাধিক) ধর্মসাক্ষী-করা সেবিকা যোগ করে দিয়ে বন্দীজীবনের বেদনাময় রূপটিকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়।

নিজের জগৎহারা স্বাধীনচিত্ত মানুষ তাই বড় বেমানান বেয়াড়া। ভিন্ন জগতে তার ইচ্ছার সম্মান দেওয়া হয় না, পালিত হয় না নির্দেশ। সেরউড বনে পালিয়ে গিয়ে কয়েকটি শাসনদ্রোহী নিজেদের সাম্রাজ্য গড়েছিল।

সিড বার্ণসকে কেউ বুঝল না। কারণ তার ভাষা ও ভঙ্গি তার নিজের। ঐ শেরউড বনের। ক্রিকেটের নিখুঁত আভিজাত্যের বেত-বোনা প্যাভিলিয়ানি চেয়ারে বার্ণস তাই বেশীদিন বসতে পেলেন না।

বোধ হয় ব্রাডম্যান কিছু বুঝেছিলেন বার্ণসকে। বার্ণস টুপি খুলে সেকথা স্বীকার করেছেন। একটি ঘটনা ব্র্যাডম্যান নিজে বলেছেন সুখের সঙ্গে। সেরউড বনেরই কাহিনী।

১৯৪৮ সালে অস্ট্রেলিয়া দল চলেছে নটিংহ্যামের সেরউড বনের মধ্য দিয়ে ভ্রমণে। নিয়ে যাচ্ছেন পোর্টল্যাণ্ডের ডিউক। পথের মধ্যে পড়ল একটি গেট। হর্ন বাজল জোরে জোরে বেশ কয়েকবার। কেউ কোথাও নেই। বনের মালিক স্বয়ং ডিউক নেমে গেলেন। সকলে ভাবতে লাগল গেটকীপারের না জানি কি শাস্তি হবে! ডিউক কিছু পরে ফিরে এলেন, পিছনে দেখা গেল একটি বৃদ্ধ, একেবারে বুড়ো

থুত্থুড়ো। পা বেঁকে গেছে, কোমর গেছে ভেঙে, লাঠি ধরে এসে গেট খুলে দিল। সকলে ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞাসা করল, কি ব্যাপার? ডিউক হেসে বললেন, আমারই দোষ! সকলে বলল, সেকি? ডিউক বললেন, আমি গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, গেট খোলার কি হল? সঙ্গে সঙ্গে চোখা জবাব পেলুম,—জানলায় যে কাঁচ লাগিয়ে দেবে বলেছিলে, তার কি হল? সকলের অট্টহাসির মধ্যে ডিউক বললেন, আমি বাস্তবিক একেবারে ভুলে গিয়েছিলুম।

ব্রাডম্যান জানিয়েছেন, সেরউড বনের চেহারা বদলে গেছে যুদ্ধের পরে। প্রয়োজনের কুড়ুল ঝাঁঝরা করে দিয়েছে ঘন বনের নিবিড়তাকে। তবু, সেরউড বন বলেই বোধ হয়, ঐ বনেরই একটি ভৃত্য এবং একটি ডিউক বেঁচে আছে।

সেরউড বন গেল কোথায়! বার্ণসের ভিতরে একটা অবুঝ দুরন্ত ক্রন্দন ও সন্ধান। সেই হাহাকারের স্বরূপ বার্ণস নিজে সম্পূর্ণ বোঝেন নি। রবিন হুডের কয়েক শতাব্দী পরে তিনি জন্মেছেন। রবিনের সাম্রাজ্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে পথ হারিয়ে ফেলেছেন তিনি। ভিতরের উৎকণ্ঠা যত তীব্র হয়েছে বাইরের জগতে তত উগ্র ও বেখাপ্পা হয়ে পড়েছেন। বেড়া টপকে ঢুকতে চেয়েছেন। জীবনে বেড়া টপকানোর শেষ হল না। অশালীনতার শাসন সহ্য করতে হয়েছে সর্বক্ষণ। প্রতিবাদও করেছেন সাধ্যমত। রাজা জনের আমল হলে ঝুলতে হোত ফাঁসিকাঠে। গণতন্ত্রের যুগে ব্যক্তি-স্বাধীনতা নামক শিকল খুবই দীর্ঘ। বার্ণস বেঁচে থেকে চেঁচাতে পেরেছেন।

কিন্তু সেরউড বন গেল কোথায়! লিটল জনের লাঠিয়ালি, এলান-ডেলের বীণাধ্বনি, পাদরী বাবার সুখাদ্যপ্রীতি, রাজা রিচার্ডের প্রজা-বাৎসল্য, রবিন হুডের তীরন্দাজী এবং রবিনের প্রণয়িণী বালকবেশী মরিয়মের কমনীয় উপস্থিতি। তখন আলোচনা চলছে মশগুল হয়ে; একটা পুরোনো সিডার গাছের তলায় সকলে আগুন জ্বালিয়ে ঘিরে বসেছে—এমন সময় অন্ধকারের ভিতর থেকে হঠাৎ একজন তিন লাফে

সামনে এগিয়ে এসে ঝাঁকুনি দিয়ে কাঁধ থেকে মৃত হরিণটা ফেলে দিল সকলের মাঝখানে। তারপর পাদরীর হাত থেকে ঝলসানো মাংসের কাবাবটি ছিনিয়ে কামড় দিতে দিতে বলল, দলপতি রবিন, ব্যাটাদের আচ্ছা ঠকিয়ে হরিণটা মেরেছি—।

সেঞ্চুরীটা কেমন হাঁকড়ালাম স্কিপার? ড্রেসিংরুমে দৌড়ে ঢুকে সিড বার্ণস প্রশ্ন করলেন।

———

শুক্লপক্ষ কৃষ্ণপক্ষ কথা

সে ইতিহাস সম্পূর্ণ লিখবার সামর্থ্য আমার নেই। অচিরস্থায়ী হলেও সেটা 'নবজন্ম'। ভারতীয় ক্রিকেটের অস্থির রেনেসাঁসের বিবরণ লিখবেন পরবর্তী প্রতিভাবান ঐতিহাসিক, আমি ইতিহাসের খণ্ড উপাদান কিছু দিয়ে যাই।

লিখতে গিয়ে একটা বেদনার দংশন অনুভব করছি তীব্রভাবে। মাত্র তিন মাস দু'দিন—পূর্ণিমার সঙ্গে অমাবস্যার ব্যবধান। ১৯৬২ সালের ১৫ই জানুয়ারী মাদ্রাজের বেলাভূমে শুভকৃত্য, ১৯৬২ সালের ১৮ই এপ্রিল জ্যামাইকার সমুদ্রতীরে শেষকৃত্য। একটি তারিখে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ভারতের পঞ্চম টেস্টে জয় ও রাবার লাভ, অন্য তারিখে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কাছে পঞ্চম টেস্টে ভারতের পঞ্চম পরাজয়।

অকাল মৃত্যুর শোককাহিনী এখন থাক, এখন জীবনের গাহ জয়-গান। কলকাতা এবং মাদ্রাজ। ভারতের মহাপুরুষ বলেছিলেন জাতীয় জীবনের প্রভাতবেলায়—কলিকাতা এবং মাদ্রাজের উপরই আমার ভরসা।

সূচনা কিন্তু সুন্দর হয়নি। পশ্চাৎপট বিবর্ণতায় ধূসর। ড্র ড্র ড্র—ড্র্যাব ড্র্যাব ড্র্যাব। ভারত-পাকিস্তানের ডজন ড্র-এর একটা কুৎসিত স্মৃতি।

বিশ্বশুদ্ধ লোক ছি ছি করল। ইংলণ্ড যাবে ভারতসফরে, উপায় নেই, পূর্বনির্ধারিত ব্যবস্থা, পাঁচ দিনের পাঁচটা টেস্ট তাদের অ্যালাউ করতেই হবে, সর্বজনের সমানাধিকারে পাঁচজনের গায়ের ঘাম গায়ে লাগবেই, সুতরাং এক কাজ কর—রাষ্ট্রপতির বিমানবন্দরে গিয়ে কাজ নেই, তাঁর শরীর খারাপ, তাঁর সেক্রেটারী যান স-দুঃখ অভ্যর্থনা নিয়ে।

ভাবখানা এই রকমই ছিল ইংলণ্ডের, যখন ভারতগামী এম সি সি

দলে পিটার মে, কলিন কাউড্রে, টম গ্রেভনী, ব্রায়ান স্ট্যাথাম বা ফ্রেডি ট্রুম্যানের নাম দেখা গেল না। এঁদের মধ্যে মে কালাপানির পারে যাবেন না স্থির করেছেন, বাকি খেলোয়াড়দের কেউ বা ক্লান্ত, কেউ বা ব্যস্ত, কেউ বা অসুস্থ।

ক্ষতি কি তাতে, 'হাতী' মারতে কি কামান দাগতে হয়? দুঃসাহসী ইংরেজ ছোকরারা কি রাইফেল দিয়ে ভারতের জীবকুলকে নির্মূল করেনি? ক্লাইবের রক্ত চনচন করে ওঠে শিরায় ধমনীতে।

কেউ কেউ অবশ্য বললেন, পরেও বলবেন, কিন্তু ভারতসফরের জন্য ঐ সময়ে তো এর চেয়ে ভাল দল গঠন করা সম্ভব ছিল না ইংলণ্ডের পক্ষে? মে বিদেশ-সফরে যাবেন না, কাউড্রে সত্যই অসুস্থ, গ্রেভনীর তখন মন্দ ফর্ম। একমাত্র স্ট্যাথাম ও ট্রুম্যান। স্ট্যাথাম পড়তির মুখে, ভারতের 'অনুর্বর' জমিতে তাঁর পক্ষে অদ্ভুত কিছু করা কঠিন. এবং ট্রুম্যান—ন্যায়পরায়ণ ইংরেজ সমালোচক বিদ্রূপ না করে পারেন নি—ট্রুম্যানের মধ্যে এখন ভয়াবহ যা কিছু তা হল তার বদন, বল নয়।

তবু মুরুব্বিরা বাক্যচ্ছটায় প্রমাণ করতে লাগলেন দিনের পর দিন—ভারতের জন্য যথেষ্ট দলই পাঠানো হচ্ছে। এইসব করুণা-বচন উপস্থিত করার সময়ে তাঁরা একবারের জন্যও মনে রাখলেন না, দিনের পর দিন ডেক্সটারের দলের বিভিন্ন খেলোয়াড়ের সম্বন্ধে সংবাদপত্রে কী ধরনের অত্যুক্তির পাহাড় তাঁরা চাপিয়েছেন।

লালা অমরনাথকে তাই প্রতিবাদ করতে হল। 'ওয়ার্লড স্পোর্টস্' নামক ইংলণ্ডের এক বিখ্যাত ক্রীড়া-সাময়িকের সম্পাদক ভারত-পাকিস্তানের খেলোয়াড়দের উদ্দেশ্য করে নানা কটাক্ষের পর লিখে-ছিলেন—"ভারত পাকিস্তানের 'ভদ্র মহোদয়েরা' ক্রিকেট খেলাটি যে চিত্তাকর্ষক, উত্তেজনাবহুল এবং আনন্দদায়ক সম্ভবত তা উপলব্ধি করতে পারেন নি! গত শীতকালে ভারত-পাকিস্তানের খেলা যুক্তিহীন, গতিহীন, নিষ্প্রাণ ও দুঃখজনক পর্যায়ে পর্যবসিত হয়।"

কথাগুলো তিক্ত হলেও মিথ্যে নয়। ভারত-পাকিস্তানের ড্র হওয়া সিরিজের কটুতাকে ছাড়াতে পারে কোন্ কটুতর কথা? কিন্তু অমরনাথের মর্যাদাবোধ আহত হয়েছিল ভিন্ন কারণে। উক্ত সম্পাদক বোঝাতে চেয়েছিলেন প্রকারান্তরে, ভারতের ক্রীড়ামান নিম্নস্তরের। অমরনাথ এরই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেন। তিনি জানালেন, পাকিস্তানের সঙ্গে ড্র করলেও ভারত দলহিসাবে শ্রেষ্ঠতর, এবং ড্র-এর জন্য ভারতীয় খেলোয়াড়দের নৈপুণ্যের অভাব অপেক্ষা পিচের নিষ্প্রাণতাই দায়ী। অমরনাথ আরও কিছু কথা ঘোষণা করলেন সাহসের সঙ্গে। ইংলণ্ডের আগমনের বেশ কয়েকমাস আগে ৩০শে জুলাই, ১৯৬২, অমরনাথ এক বিবৃতি দিলেন :—

"লালা বলেন, আগামী শীতের মরশুমে এম সি সি বনাম ভারতের টেস্ট খেলার ফলাফল সম্পর্কে আমাদের আশান্বিত হইবার সঙ্গত কারণ আছে।

"লালা বলেন, ওয়ার্লড্ স্পোর্টসের সম্পাদক আদৌ ভারতে পদার্পণ করেন নাই। এখানকার পিচের সঙ্গে তাঁহার প্রত্যক্ষ পরিচয় নাই। লেখক যেন ১৯৫১-৫২ সালে এম সি সি-র বিরুদ্ধে এবং ১৯৫৯-৬০ সালে আস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট খেলায় ভারতের গৌরবময় ভূমিকা স্মরণ রাখেন।......

"লালা বলেন, উক্ত প্রবন্ধলেখক ভারতীয় ক্রিকেটারদের ধর্তব্যের মধ্যে আনেন নাই। অধিকন্তু মাথা মোটা বলিয়া উপহাস করিয়াছেন। তাঁহার স্মরণ রাখা উচিত, ভারতের তিনজন খেলোয়াড়ের নাম তাঁহার দেশের ঘরে ঘরে আজও স্মৃত হয়। এঁরা (রণজিৎ সিংজী, দলীপ সিংজী, পাতৌদির নবাব) ইংলণ্ডের পক্ষে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট খেলিয়াছিলেন।

"লালা উক্ত সমালোচককে এম সি সি দলের সঙ্গে ভারতে আসিয়া ভারতীয় ক্রিকেটারদের খেলা দেখিবার পরামর্শ দেন। তাহা হইলেই তাঁহার মত পরিবর্তিত হইবে। কারণ ভারতীয় ক্রিকেটের

মান মোটেই নিম্নস্তরের নয়, তরুণগণ এখানে উচ্চ মানের স্বাক্ষর রাখিয়াছেন।”

বিবিধ কোলাহলের মধ্যে একদিন ইংরেজ ক্রিকেটাররা ব্যাটদণ্ড হাতে নিয়ে অবতীর্ণ হলেন রান-প্রসবিনী ভারতভূমে, তাঁদের উদ্দেশ্য, সে দণ্ড শর্বরী পোহালে খেলার মাঠে মার-দণ্ড হবে।

প্রথম টেস্ট বোম্বাইয়ে। পাল্লা ইংলণ্ডের দিকে সামান্য ঝোঁকানো। সংক্ষিপ্ত ফল ঃ

ইংলণ্ড—৫০০ ও (৫ উইকেটে ডিঃ) ১৮৪

ভারত—৩৯০ ও (৫ উইঃ) ১৮০

[ইংলণ্ড টসে জয়ী। ফল ড্র]

দ্বিতীয় টেস্ট কানপুরে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ‘ব্যাটল্ অব কানপুর’ ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসহীন ইতিহাসে বিখ্যাত। ‘ইতিহাস পুনরাবৃত্ত হয়’। তা কি হবে না এক্ষেত্রে ? সকলেই ইতিহাসের প্রত্যাবর্তন দেখবার লোভে উন্মত্ত হয়ে উঠল যখন ভারত টসে জিতে প্রথম ইনিংসে ৮ উইকেটে ৪৬৭ করে ডিক্লেয়ার করল এবং ইংলণ্ড প্রথম ইনিংসে প্রত্যুত্তর দিল ২৪৪ রানে। ফল, ফলো অন। ভারতের ব্লাডপ্রেসার চড়তে চড়তে ফেটে পড়ার মুখে কিন্তু ইংলণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে পুলারের ব্যাটিং ‘সর্পগন্ধা’ তুল্য, পুলার চড়চড় করে প্রেসার নামিয়ে দিলেন। জনৈক হতাশের আক্ষেপ এই সময়ে কাগজে বেরিয়েছিল—

“কাঙাল একবার স্বর্গ দেখিয়াছিল—১৯৫৯ সালে কানপুরে। স্বর্গ দর্শন করাইয়াছিলেন যেসু প্যাটেল। অস্ট্রেলিয়ান ক্যাঙারু সেবার একবারের জন্য লেজ গুটাইতে বাধ্য হইয়াছিল। সেরূপ স্বর্গ কাঙাল আর কখনো দেখে নাই। এইবার ১৯৬১ সালে ঐ কানপুরেই ঐ স্বর্গের আভাস যখন ফুটিয়া উঠিতে লাগিল এবং যেসু প্যাটেলের বর্ম অঙ্গে পরিয়া যখন সুভাষ গুপ্তে আবির্ভূত হইলেন, তখন কাঙালগণ

সতৃষ্ণভাবে রেডিওর ধারে দলে দলে সমবেত হইল। সে কী শিহরণ! কী উত্তেজনা! মেয়েরা কলেজ পলাইল, ছেলেরা পরীক্ষার হল হইতে উঠিয়া আসিল, মায়েরা দুপুরের নিদ্রা ভুলিল, এবং বাবারা অফিস কামাই করিল। রবিবারের দুপুর হইতে সুরু করিয়া মঙ্গলবারের দুপুর পর্যন্ত পথে পথে যে দৃশ্য দেখা গেল তাহা হইতে মনে হইতে পারে, দেশ বুঝি যুদ্ধঘোষণা করিয়াছে।

"কিন্তু হায় সকলি গরল ভেল। শ্রীযুক্ত পুলার মনের আশা, মুখের হাসি, বুকের বল একেবারে কাড়িয়া লইলেন। ছাত্ররা আবার পরীক্ষার পড়া মুখস্থ করিতেছে,মেয়েরা সোয়েটার বোনায় মন দিয়াছে, আর বাড়ীর কর্তারা বিনা নোটিশে কামাই করার জন্য সন্ধ্যাকালে মেডিক্যাল সার্টিফিকেট সংগ্রহে ব্যস্ত হইয়াছেন।

"ক্রিকেটের কোনো মহাকবি থাকিলে মঙ্গলবারের দৃশ্য দেখিয়া 'কাঙালের স্বর্গ হইতে বিদায়' নামে একটি কবিতা লিখিয়া ফেলিতে পারিতেন।"

ভারত—(৮ উইঃ ডিঃ) ৪৬৭
ইংলণ্ড—২৪৪ ও (৫ উইঃ) ৪৯৭
[ভারত টসে জয়ী। ফল ড্র]

তৃতীয় টেস্ট দিল্লীতে। রাজধানীর অনেক কাজ, ক্রিকেট নিয়ে থাকলে চলে না, অথচ ক্রিকেট চলতে থাকলে সব নদী মাঠে যায়, সব কাজ হয় অবসান। সুতরাং ভারতভাগ্যবিধাতা শেষ দু'দিন বৃষ্টিতে ধুয়ে দিলেন। এই খেলায় ভারত জিততই বলা না গেলেও হারত না বলা যায়।

ভারত—৪৬৬
ইংলণ্ড (৩ উইঃ) ২৫৬
[ভারত টসে জয়ী। খেলা পরিত্যক্ত]

এবার কেন্দ্র কলকাতা। চলো চলো কলকাতা চলো। না, কথাটা ভিন্নভাবে বলো। চলো চলো গোয়া চলো। হঠাৎ

ভারতের ইতিহাস দ্রুত পাক খেয়ে উঠল। ভারতীয় সেনাবাহিনী অভিযান করল গোয়ায়। ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯২৬ সাল, গোয়া অভিযান আরম্ভ হয়ে সমাপ্ত হল মাত্র ২৬ ঘণ্টা পরে, ১৯শে ডিসেম্বর। শেষ ঔপনিবেশিক কলঙ্ককে ঢেকে দিল ত্রিবর্ণ পতাকা।

কিন্তু ঐ দুই দিন পথে পথে রেডিওর ধারে ভীড় করে দাঁড়িয়ে থাকেনি ভারতবাসী। সে ভারতের স্বভাব নয়। ভারত শন্তিবাদী, ভারতের জনগণ রাজ্যের ভাঙাগড়ায় নিস্পৃহ—আমাদের ইতিহাসের এই সিদ্ধান্ত যে মিথ্যা নয় তা প্রমাণিত হল গোয়ামুক্তির অভিযান-কালে আমাদের সাধারণ ঔদাসীন্যে। কানপুরে দ্বিতীয় টেস্টের সময়ে রেডিওর ধারে জনতার সমাবেশ দেখে আমি যে লিখেছিলাম, 'দেখিয়া মনে হয় দেশ বুঝি যুদ্ধঘোষণা করিয়াছে,' সে লেখা অন্য দেশের আচরণ অনুমান করে, নচেৎ আসল যুদ্ধ থেকে খেলার যুদ্ধসংবাদ নিতেই আমরা রেডিওর ধারে ভীড় জমাই।

কলকাতা টেস্ট মানে কতকগুলো ব্যাপার ধরে নেওয়া যায়। টিকিটের মাথুর কীর্তন। টিকিটের টিকি সন্ধানে টিকটিকিরাও হেরে যাবার জোগাড়। জীবনে ঘুষ নেননি এমন মানুষ ঘুষ দিতে উদগ্রীব,—যদি টিকিট মেলে! কালোবাজার ফুলে ফেঁপে লালবাজার।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় বললেন, আমি নিরুপায়। কিন্তু যদি টিকিটের ব্যাপারে কারো উপায় হয়ে থাকে, ভারত সরকারের কলকাতা অফিসের কর্তারা জানালেন, তাহলে অফিসে ছুটির জন্য ভাবনা নেই। একটি কেশতৈল অনুরূপ কথা বিজ্ঞাপনযোগে জানালো—যদি সিজন টিকিট পেয়ে থাকেন, তাহলে আমি আপনার শিরোধার্য হয়ে মাঠে যাচ্ছি, সারাদিনের খেলা দেখার ক্লান্তি ভুলিয়ে দেব আমার সৌরভে। কিন্তু ঐ সারাদিনের খেলা দেখার ক্লান্তি সংগ্রহ করা যায় কি করে? টিকিটের অন্নসমস্যার সামনে দাঁড়িয়ে রাজনীতি-সচেতন বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রের সম্পাদক ক্রুদ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—"যাঁহারা টিকিট পান নাই, শুধু তাঁদের জন্য খেদোক্তি করাই আমাদের উদ্দেশ্য নয়, আমরা

লক্ষ্য করিতেছি এর পিছনে সমাজের যে অবনতির চিত্র রচিত হইতেছে। ধরিবার লোক না থাকিলে আজকালকার দিনে কোনো কাজ হয় না,—স্কুল কলেজে ভর্তি হওয়া যায় না, চাকরি পাওয়া যায় না, এমন কি বিপন্ন রোগীকে হাসপাতালে পর্যন্ত ভর্তি করা যায় না। এসব কথা আমরা জানি, কিন্তু এই অনাচার ও অব্যবস্থা কি খেলার জগতেও রাজত্ব করিবে?...ক্লাবের টিকিট বিতরণের মধ্যে কণ্ট্রাকটারের ব্যবসায়ের স্বার্থ, দোকানদারের পসার, নির্বাচনপ্রার্থীর ভোটের প্রশ্ন পর্যন্ত প্রবেশ করিয়াছে। খেলার নামে ইহা কোন ধরণের নির্লজ্জ অনাচার যাকে আমরা সমাজের বুকে গ্রাণ্ড স্কেলে ডাকিয়া আনিতেছি?" সংবাদপত্রের জনৈক কল্যামিষ্ট তাঁর মসীময় কলমে অসিভয় দেখিয়ে নববর্ষের দিন নওজোয়ানদের ডাক দিলেন: নব বৎসরে পণ করিলাম, দেখিব না খেলা বিনা স্টেডিয়াম। হায়, আদর্শবাদের যুগ যে শেষ হয়ে গিয়েছে যুদ্ধের ধাক্কায়। সুতরাং বাঁচতে যদি চাও দুঃখ নিয়ে হাসো, হাসিটাই কান্নার লবণ। দুঃখের হাসি আঁকায় ও লেখায় ফুটে উঠল নানা দিকে। চমৎকার ছিল 'তির্যকের' কার্টুনগুলো। একটি কার্টুনে দেখা গেল, এক ব্যক্তি বগলে বাক্স-বিছানা নিয়ে চলেছে; পরিচিত ব্যক্তির প্রশ্ন: কি, কলকাতার বাইরে বেড়াতে নাকি? উত্তর: না···টিকিটের জন্য লাইন দিতে যাচ্ছি। আর একটি কার্টুনে টিকিট ঘরের সামনে ঠেলাঠেলি মারামারির ছবি; তারই কাছাকাছি দাঁড়িয়ে দুই শীতকাতর সুযোগসন্ধানী ঐ টিকেট-যুদ্ধের উত্তাপ থেকে আগুন পোহাচ্ছে। এবং 'তির্যক' আর একটি ব্যবসায়ীকে এঁকেছে, যে গাছের গায়ে ঠেসান দিয়ে একটা মই নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—সে গাছের টিকিট বেচছে।

মনোরম কতকগুলি রসরচনা বেরুল। সেখানে 'লাইনের নদীতে ভাসতে ভাসতে' যারা এসেছে তাদের বিবরণ আছে। মহেশতলার ব্যানার্জি কোম্পানী, বিডন স্ট্রীটের বহ্নিশিখার দল, কিংবা বনগাঁর সুপরিচিত লাইনিস্ট অনিল কাঞ্জিলাল। বাঙালীরা ইটালিয়ান

হয়েছে আকার-সাদৃশ্য বা আলস্য-সাদৃশ্যে নয়—ইটের লাইন পেতে; পঞ্চদিবসী পরিকল্পনার এই ইটালিয়ানেরা খুবই পাবলিসিটি-পিয়াসী। দুই ব্যক্তির শুধু তাতে বিতৃষ্ণা; একজন অফিসে ডুব দিয়েছেন, নাম ঠিকানা বেরুলে চাকরি নট, অন্যজন 'গুরুতর কারণে' (নিশ্চয় মাতৃদায়) ক্যাজুয়াল লীভ নিয়েছেন, সে ক্ষেত্রে ছবি না ওঠাই মঙ্গল।

একটি রসরচনায় সর্বগুণসম্পন্না নায়িকা স্বয়ংবরা হয়ে পাণিপ্রার্থীর কাছে একটিমাত্র বীরকর্ম দাবি করল—একটি সিজন টিকিট—লেখক জানিয়েছেন—'টিকিট আনবে বলে ছেলেটি চলে গেল। কিন্তু আর ফেরেনি।'

এ পর্যায়ে সর্বোত্তম রচনা শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার ঘোষের। বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক ক্রিকেটপ্রেমে অধীর হয়ে লিখলেন—'গোয়া নয়, শীত নয়—শুধু একখানা টিকিট।'

"ধন নয়, মান নয়—

"গোয়া নয়, শীত নয়,—কাল থেকে কলকাতার মুখে শুধু একটিই কথা—টিকিট! টিকিট!

"শুধু ট্রামে বাসে নয়, আপিসে টিকিট, বাড়ীতে টিকিট, শয়নে টিকিট, জাগরণে টিকিট—টিকিট স্বপ্নেও। গোটা শহর যেন কাল থেকে এক ঝানু টিকিট কালেক্টর।"

কলকাতা সহর এখন 'ঝানু টিকিট কালেক্টর'। কিন্তু উইদাউট টিকিটের কর্মকর্তারা ঝানুঙ্গিল। সুতরাং টিকিট জুটছে না 'কানাকানি', 'ফোনাফোনি', 'অঢেল তেল খরচা' সত্ত্বেও। তেল নিশ্চয়ই মোটরের তেল। ক্লাবের কর্মকর্তাদের সন্ধান পুলিসেও জানে না। ইলেকসনের ভাবী লড়িয়েরা সব পলাতক। লালবাজারের পুলিসকে ঠেকান কন্ট্রোলরুমের কন্ট্রোলের বাইরে চলে গেছে, সকলেই ইডেন গার্ডেনে ডিউটি দিতে চায়। মাঠের ভিতরে পুলিস পুলিশ পুলিস—'পুলিস স্টেট' সেখানে। 'খ্যাপা খাকীর' ভয় তুচ্ছ করে পুলিসকেই লোকে সকাতরে জিজ্ঞাসা করছে, বলুন না স্যার, আণ্ডারগ্রাউণ্ডটা ইস্টবেঙ্গল

গ্রাউণ্ডের কোন্ দিকে?/ 'ইডেন উদ্যানের দিকে তাকিয়ে চৌরঙ্গীতে অস্থির পায়ে পায়চারি করছে কলকাতা', পার্কসার্কাস থেকে 'দায়িত্বশীল মেডিকেল স্টুডেন্টরা' লাইন দিতে বেরিয়ে পড়েছে। 'ভবানীপুরের ছাতে দাঁড়িয়ে একজন আন্দাজ করছে, ঠিক কোথায় দাঁড়ালে স্কোরবোর্ডটা বায়নাকুলারে আসবে।' /ঘোণ্টে প্রভৃতির বন্ধুরা ঘোণ্টে প্রভৃতিকে কখনো জিজ্ঞাসা করছে, 'কিরে ঘোণ্টে, পারলি ম্যানেজ করতে? না কি সেই নাইট ডিউটি?'/ কিংবা তাকে ঠাট্টায় বিঁধছে—'কিরে তখন যে খুব রোয়াব দেখাচ্ছিলে! এখন মেগে গণ্ডে টিকিটের বদলে বড় যে ওভারকোট লিয়ে এলি!'

/সবচেয়ে বিপদ তিনজনের। একটি বালিকার, আমাদের লেখকের এবং জনৈক প্রেমিকের।

বালিকার বিপদ এই—

'মেয়েটি আজ চার দিন স্কুলে যাচ্ছে না। কারণ—দিদিমণি জেনে গেছেন, বাবা ওর এক কালে কাউকে কাউকে টিকিট দিতেন।'

লেখকের বিপদ—

'টেস্ট খেলা স্বচক্ষে যারা দেখতে চায় আমার ছোট মেয়েটিকে ধরলে সংখ্যায় তারা অন্যূন কুড়ি লক্ষ। কিন্তু হায়, কি উপায়, টিকিট নেই।

'সুতরাং রান্নাঘর থেকে ধরা গলায় নিবেদন, দেখ বাপু, শেষ পর্যন্ত যদি না-ই পার, তবে সন্তুকে কালই একটা ট্রাঙ্ক কল করে দাও। শেষে যেন আমাকে লজ্জায় পড়তে না হয়।—বেচারা প্লেনে ছুটতে ছুটতে আসবে—।'

প্রেমিকের বিপদ—

'টেলিফোনে মর্মান্তিক বাণী—সরি, তাহলে এখানেই শেষ।'

অনবদ্য একটি রচনা, তার জন্য অশেষ ধন্যবাদ।

টেস্টের ঠিক আগে ইডেন গার্ডেনে এম সি সি-র সঙ্গে সার্ভিসেস

দলের একটি তিন দিনের খেলার ব্যবস্থা হয়েছিল। ওটা পংক্তি-বঞ্চিতদের জন্য হাতে-প্রসাদ,—যাতে টেস্ট খেলা না দেখেও এম সি সি-র চেহারাখানা পাঁচজন দেখে নিতে পারে। সার্ভিসেস শোচনীয়ভাবে হারল সেই খেলায়। খেলার সময়ে 'বোলার ঘায়েল' নাম দিয়ে কুট্টি কার্টুন এঁকেছিলেন যাতে ব্যাটসম্যানরূপে কৃষ্ণমেনন বোলাররূপী বৃটিশ সংবাদপত্রকে পিটিয়ে ঘায়েল করছেন, কিন্তু বাস্তবে ইংরেজ ক্রিকেটাররা কৃষ্ণমেননের সার্ভিসেস দলকে পিটিয়ে ঠাণ্ডা করে দিল। ঐ খেলার প্রথম দিনের কিছু বিবরণ লিখে দিলুম। তা নিম্নোক্ত প্রকার:

একটা একরকম দিন

"ইডেনের ঐতিহাসিক রণক্ষেত্রে ২৬শে ডিসেম্বর ভারতীয় সেনাদলের সহিত ইংরেজদের যে সারাদিনব্যাপী সংগ্রাম হয় তাহাতে নয়টি 'জীবনের' বিনিময়ে ইংরাজগণ ৩৩৯টি রান সংগ্রহে সমর্থ হয়"—

প্রথম দিনের খেলাব বিবরণ লেখা যায় এই ধরনের যুদ্ধসংবাদে। এমন লেখার হেতু, ভারতীয় সেনাদল খেলছে, যারা গোয়ায় সদ্য রণজয় করে এসেছে, এবং ভারতের দেশরক্ষা সচিব এই খেলার উদ্বোধক। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ মেননকে প্রশ্ন, গোয়ার ক্রিকেটের পর ইডেনের ক্রিকেট কেমন লেগেছে তাঁর?

সেনাদলের তৎপরতায় আমরা কিন্তু খুব খুসী হইনি। সেনাদল যখন তখন ফাস্ট বোলার থাকা উচিত ছিল। কোথায়? নতুন বল তার লাল মুখখানি সবটুকু দেখিয়ে তবে ব্যাটসম্যানের কাছে পৌঁছেছে সুরেন্দ্রনাথ ও রমেশের হাত থেকে। ঝটিকা-আক্রমণ না হয় বাদ গেল কিন্তু শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন? তাও নেই। মিলিটারী ফিল্ডিং কিংবা মিলিটারী ফিল্ড-প্লেসিংয়ের ত্রুটি জাতীয় ক্ষয়ক্ষতি রীতিমত বাড়িয়েছে। তদুপরি লক্ষ্যভেদে শোচনীয় দুর্বলতা। মাত্র পাঁচ-দশ গজ দূর থেকে বল ছুঁড়েও এই সামরিক ব্যক্তিগণ উইকেট ভঙ্গ করতে

পারেন নি। তাতে ক্ষুব্ধ দর্শক বলেছে, ভারতীয় গোলাগুলির বৃথা খরচ। অনেক অভ্যাসের পরে বিকালের দিকে কয়েকবার বল উইকেটে লেগেছে—সব বারেই কিন্তু তার অনেক আগে ব্যাটসম্যান ক্রীজ অধিকার করেছে। বিরক্ত দর্শক রসিকতা করে বলছে—"শত্রুপক্ষ কয়েকটি গাভী ও কয়েকজন জেলেকে অপহরণের পরে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী সেনাদল কয়েক রাউণ্ড গুলি চালায়। কেহ হতাহত হয় নাই।"

পাঠক লক্ষ্য করবেন, সামরিক উন্মাদনায় আমি কি রকম সামরিক ভাষা ব্যবহার করছি ক্রিকেটে। এ বিষয়ে বাড়াবাড়ি হয়ে যাবার আগে আর একটি কথা জানিয়ে দিই। হাইকোর্ট-প্রান্তের আম্পায়ার বারংবার সেনাদলের এল-বি আবেদন অগ্রাহ্য করলে জনৈক উত্ত্যক্ত ভারতবাসী বেড়ার ধার থেকে চীৎকার করে বলেছে,—পর্তুগীজ আম্পায়ার নাকি?

সামরিক পরিভাষাকে না হয় ত্যাগ করলুম,—আসন্ন নির্বাচনের পূর্বে রাজনৈতিক পরিভাষাকে বর্জন করা কি সহজ? সকলেই দেখেছেন, ইংলণ্ডের পাঁচজন ব্যাটসম্যান বাম হাতের খেলোয়াড়।

অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চ বামের ঐক্য। জিন্দাবাদ বলা যাবে না কারণ তাঁরা আউট হয়ে গেছেন।

মাঠের আক্রমণের বড় ঝুঁকিটা আজ কিন্তু ব্যাটসম্যানদের অপেক্ষা সংবাদিকদের বেশী গ্রহণ করতে হয়েছে। তীব্র উত্তরে বাতাস তাঁদের বোতাম-আঁটা জামার তলায় প্রাণটাকে কাঁপিয়েছে, আর মাঠ-কর্তাদের রঙিন রসিকতা সবুজ রঙে 'রক্তাক্ত' করেছে তাঁদের সর্বাঙ্গ। ইডেন উদ্যান তার শ্যামলিমার জন্য দেশবিদেশে বিখ্যাত। সে খ্যাতি প্রচারে সাংবাদিকদের মুখ্য ভূমিকা। সেই কৃতজ্ঞতায় কর্তারা সাংবাদিকদের আসনে সবুজ রঙ মাখিয়ে দিয়ে সেটাকে কাঁচা অবস্থায় রেখেছিলেন, যাতে করে সাংবাদিকরা রংবাদিক হতে পারেন। সাংবাদিকরা অনেকেই

প্রবীণ, কর্তাদের কর্মকাব্যের ছোঁয়ায় 'ওরে নবীন ওরে আমার কাঁচা' হয়ে উঠেছিলেন। সুপরিচিত মাদ্রাজী সাংবাদিক, যিনি সকলের 'গুরুজী'—সবুজ রঙ তাঁর কোর্ট, সার্ট, গেঞ্জি ভিজিয়ে বুক পর্যন্ত রাঙিয়ে তাঁকে রঙের গুরু করে দিয়েছিল। বাঙালী 'বড়দা' রঙে কাপড়ে চোপড়ে হয়েছিলেন। ব্যাপার দেখে ব্যানিস্টার সাহেব বললেন, তাজ্জব, প্রেসবক্স না পেণ্টবক্স? ফ্রিসকিন বললেন, চেয়ে দেখ, আমি তৈরী হয়ে এসেছি, এটা আমার সবচেয়ে পুরণো কোট।

রঙের ব্যাপারটা সাংবাদিকদের কাছে নতুন নয়। গতবারে তাঁরা বসবার আসনে পেয়েছিলেন আলকাতরা। ফলে হয়েছিলেন কৃষ্ণকান্ত। এবার সবুজে নবদূর্বাদলশ্যাম।

খেলা সম্বন্ধে কিন্তু বেশী কিছু বলার নেই অথচ আশ্চর্য, একদিনে ৯ উইকেটে ৩৩৯ রান হয়েছে—তিন উইকেটে ২০৭ নয়—যা ইডেনের ইদানীন্তন পদ্ধতি; তার মানে রান হয়েছে, উইকেট পড়েছে। রান নিশ্চয় হয়েছে; একটি সেঞ্চুরী, দুটি অর্ধশতাধিক তার প্রমাণ। ৯টি উইকেটের পতন আবার বোলারদের কিছু সাফল্য দেখায়।

তবু টেস্টের আগে স্টেজ রিহার্সালের মত এই খেলাটিকে খুব গভীরভাবে নেওয়া সম্ভব হয়নি কারো পক্ষেই। সেনাদলের নম্রশক্তি বোলিংও এর জন্য দায়ী। সুরেন্দ্রনাথ পরিশ্রম করেছেন, লাঞ্চ-পূর্ব প্রথম দফায় বোলিং নিন্দের নয়, কিন্তু গতিহীন সুইঙ্গে শেষ পর্যন্ত সাফল্য লাভ করা যায় না। অপর সুইঙ্গ বোলার রমেশ কতকগুলি কিংবা অনেকগুলি উইকেট পেয়েছেন এই পর্যন্ত। মুদিয়া চেষ্টা করেছেন। লেগ স্পিন দিচ্ছেন এটা হাত মুচড়ে বাঁকিয়ে নিতান্ত দেখিয়ে দিয়ে ডাণ্ডেকার যে বল করেছেন, তাতে যথেচ্ছ পেটালে হয়ত ব্যাটসম্যান আউট হয়, না মারলে কিছুই হয় না। বোলিংয়ে একমাত্র দানীই ছিলেন খানদানী। ফ্লাইট, স্পিন, সুইংয়ের মিশ্রণ, অবিরত আক্রমণ —এই সবের দ্বারা তিনি ব্যাটসম্যানকে সমীহ করতে বাধ্য করেছেন।

আমেরিকান মোটরের 'পিক আপ' নিয়ে পুলার ও রিচার্ডসন ইংলণ্ডের সূচনা করেছিলেন। সুরুতেই দ্রুত রান। কিন্তু এ দুজনের বিদায়ের পরে ইংলণ্ডের ইনিংস স্বদেশীয় অস্টিন গাড়ীর সুধীর সুদীর্ঘ জীবনের ছন্দ অবলম্বন করল। পারফিটের সেঞ্চুরীর মধ্যে তাঁর মারের কৌশল, ধৈর্যক্ষমতা, ও কাউন্টি ক্রিকেটারের কার্যকারিতার চেহারা ফুটে উঠেছিল। বার্বার অধিকতর আক্রমণপটু ছিলেন। কিন্তু আনন্দ দিয়েছিলেন টেড ডেক্সটার, যদিও পূর্ণ প্রত্যাশার পূরণ হয়নি তাতে। ডেক্সটারের দীর্ঘ দেহ, স্বচ্ছন্দ চলন ও চালনা, ড্রাইভের শক্তি ও সৌন্দর্য, আত্মরক্ষার প্রয়োজন শেষ হবার পরে আক্রমণে খুসীর উচ্চহাস্য দর্শককে উত্তপ্ত করেছে। সারাদিনের সবচেয়ে স্ফূর্তিদায়ক ওভারটি ডেক্সটারের উপহার। তিনটের সময়ে অফস্টাম্পে পড়া ডাণ্ডেকারের লেগস্পিন বলে লম্বা ব্যাট বাড়িয়ে ডেক্সটার মার দিলেন, মিড অফের উপর দিয়ে বল উঠল, একটা চান্স গেল। একই ধরনের পরবর্তী বলকে আবার সোজা তুলে দিলেন বোলারের উপর দিয়ে। রমেশ দু হাত তুলে নেচে নেচে হাতের ক্যাচ ছাড়লেন। পরের বলে লেগ মিডের উপর দিয়ে ওভার বাউণ্ডারী, শিল্পীর শক্তির সৃষ্টি। পরের বলে তুলে মিড অফে বাউণ্ডারী। তার পরের বলে বোলারের হাতে কট। ৭৬ মিনিটে ৫৮ রান।

বোঝা যায় ডেক্সটার আউট হতে ব্যস্ত, পরবর্তী ব্যাটসম্যানদের ইডেনের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ দিতে উদ্‌গ্রীব ছিলেন।

টেস্টের সময়ে ডেক্সটারের সম্বন্ধে আরও কিছু লিখতে হবে বলে আমার বিশ্বাস।

এম সি সি-র পক্ষে চিত্তাকর্ষক খেলা হয়েছিল লাঞ্চের পরে ও চায়ের আগে। লাঞ্চের ঠিক পরের ৩০ মিনিটে ৫৩ রান। ১২০ মিনিটে মোট ১৭৮ রান। লাঞ্চের আগে খেলা যেমন মন্থর, চা-এর পরে খেলা তেমনি ব্যক্তিত্বহীন। অর্থাৎ স্যাণ্ডউইচ ব্যাটিং—উপরে ও তলায় নীরস রুটি, মধ্যে চাপা আসল মাংসটুকু।

খেলা এক সময় শেষ হল—যখন শেষ হল তখন মাঠে ছায়ারাজ্য। শেষ আলোটুকু শুধু আরক্ত করে রেখেছে শ্বেতদ্বীপের দুটি ব্যাটসম্যানের মুখ। একটি এক রকম দিন শেষ করে দর্শকেরা চলে গেল, যারা ডেক্সটারের ব্যক্তিত্ব থেকে আনন্দ পেয়েছে, সিং-হীন শিখ সোমলের ফিল্ডিং নিয়ে মজা করেছে, ধারহীন সেনা-বলে যখন একটিও বোল্ড হয়নি সারাদিনে তখন কৌতুক করেছে স্টাম্পের অটুট পালিশ সম্বন্ধে, ডাহিনা-বাম ব্যাটিংয়ের সময়ে ব্যাটসম্যান সিঙ্গলস নিলে আম্পায়ারকে যখন সিঙ্গলস নিতে হয়েছে প্রতিবার তখন তা নিয়ে হাসাহাসি করেছে, স্ক্রীনের সামনে ছুটে গিয়ে পুলিস যখন খেলা থামিয়েছে, তখন বলেছে, আহা পুলিসের কী ক্ষমতা, হাত দেখিয়ে লাট সাহেবের গাড়ী এবং ক্রিকেট দুইই আটকে দিতে পারে, এবং মাঠ থেকে বেরিয়ে ভেবেছে—

ভেবেছে যে, অফিস কামাই করে সত্যই খেলা দেখতে আসা উচিত ছিল কি না?

সিনেমায় মূল বইয়ের আগে এটা একটা মাঝারি ধরণের নিউজ রীল।

ইডেন গার্ডেনে চতুর্থ টেস্ট আরম্ভ হল ১৯৬১ সালের ৩০শে ডিসেম্বর বেলা দশটার সময়ে। কন্ট্রাকটার টসে জিতে ফিল্ডিং করতে বাধ্য করলেন ইংলণ্ডকে। সংবাদপত্রে দেখা গেল, ইংরেজ লেখকেরা ইংলণ্ডকে পিটিয়ে জিততে নির্দেশ দিচ্ছেন এবং একঘেয়ে টেস্টের বিরুদ্ধে আর এক দফা নিন্দাবর্ষণ করেছেন। আর একটি চাঞ্চল্যকর সংবাদ—গুপ্তে ও কৃপাল সিং দল থেকে বাদ পড়েছেন ক্রিকেট-বহির্ভূত কারণে।

বিচিত্র বেদনা ও অনুভূতি বোধ করেছিলুম একটি সংবাদে—জীবনের বিচিত্র কৌতুক।—

"কক্ষচ্যুত নক্ষত্র। কালকের রাজা আজকের ফকির।

"সি কে নাইডু ভারতীয় ক্রিকেটে এক মহানায়কের নাম। ইডেন উদ্যান ভারতের প্রথম টেস্ট-অধিনায়ক নাইডুর ক্রীড়াজীবনের বহু স্মৃতিবিজড়িত ক্রীড়াভূমি। তাঁকে কেন্দ্র করে ইডেন উদ্যানের কত কাহিনী। কিন্তু আজ সেই ইডেন উদ্যানেই সি কে অপরিচিত। তাঁর কোনই কদর নেই।

"একদিকে প্যাভিলিয়নের প্রকোষ্ঠে বোর্ডের বর্তমান কর্মকর্তাদের চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়-র ব্যবস্থা, অন্যদিকে প্রাক্তন এবং প্রথম টেস্ট-অধিনায়কের মুখে মাটির ভাঁড়ে চা।

"বিশেষজ্ঞ হিসাবে চতুর্থ টেস্টম্যাচের বেতারভাষ্য দেবার জন্য বেতার-কর্তৃপক্ষের আহ্বানে নাইডু কলকাতায় এসেছেন। ক্রিকেটের রাজতক্তে আজ যাঁরা সমাসীন, তাঁরা কেউ নাইডুকে চেনেন না।

"কিন্তু এম সি সি-র সদ্য বিদায়ী সভাপতি স্যার হিউবার্ট অ্যাস্টন, যিনি সম্প্রতি কলকাতায় এসেছেন এবং টেস্ট খেলা দেখার জন্য বেতার বিবরণী প্রচারমঞ্চের এক পাশে যাঁর আসন নির্দিষ্ট হয়েছে—তিনি নাইডুকে দেখেই বলবেন,—'কৈ কাল তো তোমাকে পার্টিতে দেখলাম না?'

"বলাবাহুল্য গত শনিবার স্যার অ্যাস্টনের সম্বর্ধনার জন্য ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড যে সভার আয়োজন করেছিলেন, সি কে নাইডু সে সভায় আমন্ত্রিত হননি। বাংলার ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েসন টেস্ট খেলোয়াড়দের ও ক্রিকেট-গণ্যমান্যদের জন্য ইংরাজী নববর্ষের প্রথম দিন যে ভোজসভার আয়োজন করেছেন সে সভায়ও এখন পর্যন্ত নাইডুর আমন্ত্রণ আসেনি।"

বিগত দিনের নায়ককে নিয়ে ব্যস্ত হতে চায় কে? আসুন আমরা বর্তমানের বন্দনা করে প্রগতিশীল হই। টেস্টের আগে ইংলণ্ডের অধিনায়ক টেড ডেক্সটারকে স্বাগত জানিয়েছিলুম যে রচনায় সেটি উপস্থিত করি।

ইংলণ্ডের তরুণ অধিনায়ক এডওয়ার্ড র‍্যালফ্ ডেক্সটারকে স্বাগত জানাচ্ছি তাঁরই অ্যালবামের একটি পাতা খুলে দিয়ে। ১৯৬০ সালে তোলা ডেক্সটারের একটি চমৎকার ছবি আছে তাতে। খুব ঘন কালো রঙের ব্যাকগ্রাউণ্ডে ছবিখানি তোলা হয়েছে।

ছবিটির পটভূমিকা এইরকম,—

"প্রায় সকল ক্রিকেট-প্রেমিক ১৯৬০ সালের দিকে তাকিয়ে বলবেন, 'কী দুর্বৎসর!' এই মরশুম দুঃখজনকভাবে মনে থাকবে নানা কারণে: খেলা নষ্ট-করা প্রচুর বৃষ্টি, আতঙ্কজনক দর্শক-হ্রাস, গ্রিফিনের (সাউথ আফ্রিকার) থ্রো নিয়ে কটু বিতর্ক, টেস্ট-আম্পায়ারের পদ থেকে বুলারের বিতাড়ন, 'ওভার টু মি' বই লেখার জন্য এম সি সি ও সারে কর্তৃক লেকারকে প্রদত্ত সুবিধাগুলির প্রত্যাহার, গ্লাস্টর্সশায়ারের অধিনায়কত্ব নিয়ে গ্রেভনীর সঙ্গে বিবাদ, এবং সাউথ আফ্রিকার নিতান্ত নৈরাশ্যজনক সফর...।" (উইসডেন)।

পটভূমিকার ঘন রঙকে আরো একটু গাঢ় ক'রে তোলা যাক ঐ দর্শক-হ্রাসের বিষয়টি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট কিছু তথ্য দিয়ে,—

"১৯৪৭ সালে সদস্যদের বাদ দিয়ে কাউন্টি ম্যাচে মোট দর্শকসংখ্যা হয়েছিল তেইশ লক্ষের কিছু বেশী। ১৯৬০ সালে তা নেমে গেছে, কিছু কম সাড়ে দশ লক্ষে। ১৯৫৯ সালের তুলনাতেও প্রায় সওয়া তিন লক্ষ দর্শক কম হয়েছে ১৯৬০ সালে। ১৯৫৮ সালকে বাদ দিলে (তখন দর্শকসংখ্যা ৯ লক্ষ ৮৪ হাজারের মত) যুদ্ধের পরে এই হল সর্বনিম্ন সংখ্যা।"

এমনই অন্ধকারের উপরে ডেক্সটারের ছবি কি ধরনের?—

"কিন্তু একটিমাত্র ব্যক্তি বা ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি যে সবকিছু বদলে দিতে পারে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে গত গ্রীষ্মে সাসেক্সের ক্ষেত্রে। তারা প্রভূত গুণান্বিত একজন ব্যাটসম্যানকে, টেড ডেক্সটারকে

পেয়েছিল, যিনি সে বারই প্রথম অধিনায়কত্ব করলেন, যার ফলে সাসেক্সের সদস্যসংখ্যা ১২ হাজার বেড়ে গেল, গেটে প্রাপ্তি বাড়ল দু'হাজার পাউণ্ড। কেউ কেউ আছেন যাঁরা যুক্তি তর্কের দ্বারা বোঝাবার চেষ্টা করেন যে, এই বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রান করা অত্যন্ত কঠিন; ১৯১৪ সালের পূর্ববর্তীকালের মত স্বর্ণযুগ এখন আর নেই। তাঁরা বলেন বোলিং এখন অনেক কুশলী, ফিল্ডিং উন্নত এবং ফিল্ডিং সাজানোয় অদ্ভুত চাতুর্য। আজকাল একেবারে ব্যাটের মুখ থেকে ক্যাচ ছিনিয়ে নেওয়া হয়। এইসব নানা কথা তাঁরা প্রায়ই তোলেন, কিন্তু কই, যখন ডেক্সটার অধীর আবেগে গর্জন করছেন তখন তো ব্যাটের মুখে লোক দেখা যায় না? উইকেটে যাঁরা রগড়ে খামচে টিকে থাকতে চেষ্টা করেন তাঁরাই গায়ে পড়তে দেন ফিল্ডারকে; কিন্তু যে মুহূর্তে একজন যথার্থ ব্যাটস্‌ম্যান ব্যাট ধরেন তখনই ঐসব ফিল্ডারদের দূর নিরাপদ রাজ্যে সত্বর প্রস্থান।"

১৯৬০ সালের দুর্বৎসরে মেঘফাটা দুটি মাত্র আলোকরেখাকে দেখেছেন উইসডেনের সম্পাদক—একটি, ইম্পিরিয়াল ক্রিকেট কনফারেন্সের সফল অধিবেশন; দ্বিতীয়, 'টেড ডেক্সটারের অসামান্য ব্যাটিং-কৌশল।'

তার মানে একটি গোটা বছরে দিনরাত্রির সূর্যের নাম টেড ডেক্সটার।

ডেক্সটার সম্বন্ধে আরো কিছু তথ্য উপহার দেওয়া যাক।

কাউন্টি প্রতিযোগিতায় ১৯৫৯ সালে সাসেক্সের স্থান ছিল পঞ্চদশ, পরের বছর লাফ দিয়ে উঠে পড়ল চতুর্থ স্থানে; সে লাফ নতুন অধিনায়ক ডেক্সটারের কাঁধে চড়ে। ডেক্সটার নিজ দলে রান, উইকেট, অধিনায়কত্ব এবং উদ্দীপনা,—এই চার বস্তু যোগ করেছিলেন। ১৯৬০ সালে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে রান করেছেন ২২৭১, উইকেট নিয়েছেন ৪৬, ক্যাচ ধরেছেন প্রচুর এবং ইংলিশ ক্রিকেটে দিয়েছেন নতুন প্রাণ। 'ডেক্সটারের রীতি,'

'ডেক্সটারের নীতি,' 'ডেক্সটারের ছোঁয়া,'—কথাগুলো ফিরছে মুখে মুখে।

ছবি তোলবার মত মানুষই বটে ডেক্সটার—মাঠে এবং মাঠের বাইরে। মালিন্য রাখেন না কোথাও, খেলায় কিংবা চলায়। তাঁর সবকিছু মার্জিত, শুদ্ধ, সুষ্ঠু এবং সুন্দর। আচার আচরণ দেখে মনে হতে পারে ড্যাণ্ডি, অহঙ্কারী, স্বার্থপর। ধরন ধারন দেখে গোড়ার দিকে সহযোগী খেলোয়াড়রা ঘটা ক'রে বলত, 'লর্ড এডওয়ার্ড', কিন্তু সে বিদ্রূপ ও কৌতুকের মধ্যে বিদ্রূপটা এখন একেবারে মুছে গেছে, কৌতুকের যেটুকু অবশিষ্ট আছে তা মৃদু ও স্নিগ্ধ, তার সঙ্গে উপরন্তু যুক্ত হয়েছে শ্রদ্ধা। লোকটিকে বাইরে থেকে যা দেখায়, সে আসলে তা নয়,—অত্যন্ত ভদ্র, মনোরম সঙ্গ, এক কথায় পছন্দ করবার মত মানুষ। 'ধাবমান অগ্নি' ফ্রেডি ট্রুম্যান বাকসংযমের সাধনা করেছেন এমন কথা কেউ কখনো বলেন নি। খনিশ্রমিকের পেশীর জোরে বল ছোঁড়বার সময়ে ইয়র্কশায়ারের উচ্চারণে অশ্রাব্য দিব্যিগালা যাঁর অভ্যাস, সেই ফ্রেডি ট্রুম্যান পর্যন্ত টেড ডেক্সটারকে কিছু সার্টিফিকেট না দিয়ে পারেন নি। ডেক্সটারের ভাগ্য! ১৯৬০ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজে প্রথম টেস্ট সম্বন্ধে ফ্রেডি বলেছেন,—

"ইংলণ্ড প্রথম ব্যাট করল। কেন ব্যারিংটন ও টেড ডেক্সটারকে ধন্যবাদ, তাঁদের তুটি চমৎকার সেঞ্চুরীর জন্যই ইংলণ্ডের পক্ষে ৪৮২ রান জোগাড় করা সম্ভব হল। অনেকেই জানেন, এক সময়ে যে-ব্যক্তিকে আমরা 'লর্ড এডওয়ার্ড' বলে ডাকতুম (তাঁর অতি সভ্য ভাবভঙ্গি এবং বিদগ্ধ বাগ্‌ভঙ্গির জন্য), তাঁর সম্বন্ধে আমি কিছু সন্দেহ পোষণ করতুম, কিন্তু তিনি ন্যাবা রোগ থেকে সেরে উঠার পরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজে অসাধারণ খেললেন। ওয়ালী হ্যামণ্ডও বোধহয় ব্যাকফুটে টেডের চেয়ে জোরে মারতে পারতেন না। কভার ড্রাইভগুলি আগুনের গোলার মত মাঠ পুড়িয়ে বাউণ্ডারীতে ছুটছিল। অ্যাঁ?—হ্যাঁ, লর্ড এডওয়ার্ড সত্যিই বিরাট ক্রিকেটার

হতে যাচ্ছেন। আমার বিশ্বাস তিনি চমৎকার অধিনায়কও হবেন।"

হ্যামণ্ড? ঠিক তাই। ডেক্সটার নিজের মধ্যে হ্যামণ্ডকে আর চাপা দিতে পারছেন না। ঈষৎ অপরিণত একটি হ্যামণ্ড—সেই এক্কই পোষাকের বাহার, সাজানো কথাবার্তা, ব্যাটিংয়ে মর্যাদাপূর্ণ সর্বনাশ এবং মিডিয়ম পেস বোলিংয়ে নিতান্ত প্রয়োজনীয় উইকেট সংগ্রহ। অজস্র ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ হ্যামণ্ডকে দুটি কথায় বেঁধে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে,—'দি ক্রিকেটার।' অর্থাৎ?—

"'ক্রিকেটার' শব্দটির দ্বারা আমি কেবল ব্যাটিং, বোলিং বা ফিল্ডিংকেই বোঝাই না। এই তিনের সমন্বিত প্রকাশে ১৯২৫ থেকে ৩৫-এর মধ্যে হ্যামণ্ডের সমতুল কেউ ছিলেন না, ব্রাডম্যানও নন, কনস্টানটাইনও নন। ঐকালে হ্যামণ্ড হয়ত অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে শতাধিক কি দ্বিশতাধিক রান ক'রে এলেন, তারপরে তাদের প্রথম দিকের গোটা তিনেক উইকেট নিলেন, তারপর সহজেই স্লিপে একটা ক্যাচ ধরলেন, যেটাকে অন্যে ফসকাবে তো নিশ্চয়ই কিন্তু স্বীকার করবে না ক্যাচ ছিল বলে। কিন্তু এসব ছাড়াও 'ক্রিকেটার' বলতে আমি আরো কিছু ধরেছি,...আমি মাঠে হ্যামণ্ডের নিছক উপস্থিতির প্রভাবের কথা বোঝাতে চাইছি, তাঁর সেই ভয়ানক উপস্থিতি যা দেখে তিনি যখন ১১-৫০ মিনিটের সময়ে গার্ড নিচ্ছেন তখন বোলারের মনে এই অনুভূতি জাগে যে, হায়, লাঞ্চ এখন কত দূরে, বাউণ্ডারীর সীমানা এখন কত কাছে।"

সুবিখ্যাত রবার্টসন-গ্লাসগোর কথা এগুলি। এই কথাগুলির উপর থেকে হ্যামণ্ডের নাম তুলে দিয়ে ডেক্সটারের নাম বসিয়ে দিলে ইংলণ্ডের এখনকার পাঠক সে কারসাজি বোধহয় ধরতেই পারবে না। কারণ, স্লিপে ক্যাচ ধরা দিলে, ঐ সকল কীর্তিই ডেক্সটার নিয়মিত করছেন। দৃষ্টান্তের যদিও প্রয়োজন নেই তবু বলা যায়—১৯৬০ সালে মিডলসেক্সের বিরুদ্ধে ডেক্সটার প্রথম

দিনে করলেন ১৫৭ এবং শেষ দিনে নিলেন ২৪ রানে ৭টি উইকেট, এক সময়ে ১ রানে ৪ উইকেট। দুটো ক্যাচও ঐ সঙ্গে ছিল।

সুতরাং ডেক্সটার হ্যামণ্ডের মত সর্বাত্মক রাজকীয় মর্যাদা নিয়ে মাঠে নেমেছেন, যদিও তার যথাযোগ্য পরিণতি ঘটবে কি না কেউ বলতে পারে না। ডেক্সটার ব্যাটিং করেই সন্তুষ্ট থাকতে চান না। তাঁর ফিল্ডিং একদিন হাসি আনত; গলফ্-আসক্ত এই ব্যক্তি ক্রিকেট বল নিয়ে নাকি আউটফিল্ডে গলফ্ খেলতেন। আজ তিনিই কভারে বা সর্টলেগে হায়েনার চোখ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। বোলিংও তিনি ভালভাবে করতে চান, কিথ মিলার বা ডেভিডসনের মত হতে তাঁর বাসনা, তবে কি না 'ব্যাটিংয়ে নিজের বিশিষ্ট স্থান বজায় রাখার জন্য লড়াই করার পরে সে রকম বোলিং করা খুবই শক্ত'—ডেক্সটার সবিনয়ে জানিয়েছেন।

সাসেক্সের, এবং ইংলণ্ডের, তরুণ অধিনায়ককে তাই খুশী মনে কলকাতার ইডেন উদ্যানে আমরা অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। দক্ষিণ ইংলণ্ডের সূর্যতাপে তপ্ত সাসেক্সের ক্রিকেট—তার সেই রৌদ্রালোকের সঙ্গে ভারতের অত্যুজ্জ্বল আলোককে যোগ করেছিলেন রণজিৎ সিংজী,—ডেক্সটার সেই মাঠেরই নতুন নায়ক। রণজি ছোট রাজ্যের অধিপতি ছিলেন কিন্তু সম্রাট ছিলেন একটি বিরাট খেলার। ডেক্সটার কোনো কাউন্টির লর্ড না হয়েও আজ একটি বিরাট খেলার লর্ড। সাসেক্সের অ্যামেচার ব্যাটিংয়ের বিরাট ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার তাঁর উপরে। তিনি সাসেক্সের মাঠে ভারতীয় রণজির পরিত্যক্ত অগ্নি থেকেই কেবল উত্তাপ গ্রহণ করেন নি, ভারতবর্ষ থেকে আরো একটি অগ্নি নিয়েছেন, যার মধুর প্রভায় তাঁর শয়নকক্ষ আতপ্ত; ইতিমধ্যে আমরা সকলেই জেনে গিয়েছি শ্রীযুক্ত ডেক্সটারের পত্নীর জন্মস্থান এই ভারতবর্ষে, বাংলার প্রাক্তন অধিনায়ক লংফিল্ডের তিনি জামাতা। আমরা তাই আশা করব টেড ডেক্সটার যৌতুকরূপে প্রাপ্ত অগ্নির কিছু প্রত্যর্পণে শীতের

ইডেনকে উদ্ভাসিত করে তুলবেন। আমরা কিছু আলো চাই, সত্যই আমরা কিছু খেলা চাই। এ দেশে সে খেলায় বাধা অনেক। ভারতবর্ষের মাঠ এখন মুদিখানায় টাঙানো ফ্যাকাসে শ্লেটের মত, তাতে পাঁচদিনের সওদার যোগবিয়োগ কষা হয়। এ মাঠে কল্পনার বিকাশ সম্ভব নয়। তবু কল্পনা যার স্বভাবে, রচনা যার রক্তে, সে সৃষ্টিতে স্থগিত থাকে না। ইডেন নামক ক্রিকেটের স্বর্গোদ্যানে কিছু ভুল করার এবং করতে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা যদি এডওয়ার্ড ডেক্সটার না করেন তবে তাঁর সম্বন্ধে সকল পূর্ব ধারণা ভুল বলে প্রমাণিত হবে এবং পত্নীর জন্মস্থানে তিনি নিতান্ত বেরসিক জামাতা বলে ধরা পড়বেন।

কিন্তু আমার বিশ্বাস, ডেক্সটার তেমন হবেন না। যুদ্ধোত্তরকালে কম্পটন ছাড়া ইংলণ্ডের মন লুঠতে তাঁর মত কেউ পারে নি। তিনি ইংলণ্ডের পালিয়ে যাওয়া দর্শককে ব্যাটের বাড়িতে তাড়িয়ে এনেছেন মাঠে,—আমরা না হয় ভারতবর্ষের দর্শক, ফাঁপানো পয়সার চাপে কিংবা আদেখলের লোভে যে কোনো খেলা দেখতেও মাঠে মারামারি করি,—তবু ডেক্সটারকে অনুরোধ, তিনি হঠাৎ-বড়লোকের কালোবাজারী টিকেটের দামকে মর্যাদা না দিন, মধ্যবিত্তের ধার করা পয়সার কিছু মূল্য যেন ফেরত দেন। ইংলিশ ক্রিকেটের 'মহাশয়' তিনি, চমৎকার পোষাকে ঢাকা তাঁর সুরূপ চেহারা দেখে মনে হয় 'যেন ফিল্মস্টার,' তিনি কলকাতায় এসেছেন অনেক রূপের আর রসের প্রতিশ্রুতি বহন করে। তিনি ক্রিকেটে ইংলণ্ডের নূতন উচ্চারণ, তিনি আনন্দের সর্বশেষ ঘোষণা। ক্রিকেট আবার লড়াইয়ের খেলা থেকে খেলার লড়াই হয়ে উঠেছে; এই নূতন পর্যায়ে অস্ট্রেলিয়ার নায়কত্ব করছেন রিচি বেনোড, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক ফ্রাঙ্কি ওরেল, ইংলণ্ড কি দ্বৈপায়ন সংকীর্ণতায় আবদ্ধ থাকবে, গালভরা আত্মপ্রঞ্চনায় যাকে বলা হয় সংযত ক্রীড়ারীতি? আধুনিক ইংলিশ ক্রিকেটের 'কপোতবক্ষকে' কপাটবক্ষে বিস্তৃত করবে কে?

ইংলণ্ডের অর্ধোক্ত উত্তর—এডওয়ার্ড র‍্যালফ্ ডেক্সটার।

ইংলণ্ড সাহসের সঙ্গে পূর্ণ কণ্ঠে নবনায়করূপে ডেক্সটারের নাম ঘোষণা করুক। একজন আকর্ষণায় ব্যাটসম্যান, উপযোগী বোলার, নিপুণ ফিল্ডার, কল্পনাপ্রবণ অধিনায়ক এবং সুসভ্য মানুষ, এক কথায় একজন ক্রিকেটারকে, টেড ডেক্সটারকে, তাঁর বিষয়ে প্রযুক্ত ঐ বিশেষণগুলিকে সার্থক প্রমাণ করবার জন্য সুপ্রাচীন ইডেন উদ্যান আহ্বান করছে।

আর বিলম্ব নয়—মাঠে নেমে পড়া যাক। প্রথম দিনের খেলা।

উমরিগর, পাতৌদি এবং লকের একটি ক্যাচ

জয়সীমা ব্যাকুলভাবে হাত পা নেড়ে আলোর আবেদন জানালেন। কাতরভাবে দেখাতে লাগলেন, গাছের ছায়ার কালো আঙুলগুলো তাঁর উইকেট ধরে ফেলেছে। সাত মিনিট আগে খেলা বন্ধ হয়ে গেল ইডেনে চতুর্থ টেস্টের প্রথম দিনে। সেই ছায়াসমাপ্ত প্রথম দিনের খেলার দুটি ছবি আমার মনে ফুটে আছে,—দিনের শেষে সব কিছুর মধ্যে সেই ছবি দুটিকেই বারে বারে ফিরে পেয়েছি,—একটি বিদায় এবং একটি আগমনের দৃশ্য।

বিষণ্ণ মানুষটি, ভারতীয় দলের অধিনায়ক নরী কণ্ট্রাকটার যখন অগৌরবের হাততালির মধ্যে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন, তখন সকল বিদ্রূপ ও বিরক্তির কলরবের ভিতর বসে এই কথাটিই মনে হচ্ছিল, অধিনায়কত্বের সর্বনাশ চাপিয়ে দেবার কি প্রয়োজন ছিল এই সুবিনয়ী সুদৃঢ় খেলোয়াড়টির উপরে? অষ্টম এডওয়ার্ড বলেছিলেন, মুকুটের ওজন যদি জানতে তাহলে অভিষেক উৎসবে রাজার আনন্দ নিয়ে উচ্ছ্বসিত হতে না। কণ্ট্রাকটারও মুকুটের ভারে মাথা নামিয়ে দিলেন। অধিনায়কের স্থান ছাড়া দলে আজ তাঁর সঙ্গত স্থান নেই।

দুটো পঁচিশ মিনিটের সময় মেহেরা আউট হয়ে যাবার পরে প্যাভিলিয়ন-গেট থেকে নিষ্ক্রান্ত শালপ্রাংশু মূর্তিটিকে দেখে স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে চীৎকার করে উঠল এক ব্যক্তি—'ঐ তো আমাদের স্বাভাবিক নেতা!' একজন পুরুষ—যাঁর নাম উমরিগর। ডেক্সটারের সঙ্গে সমানে দাঁড়িয়ে করমর্দন করবার মত একটি ব্যক্তিত্ব। জনতার দ্বারা নির্বাচিত ভারতীয় দলের অধিনায়কের নাম পলি উমরিগর।

কণ্ট্রাকটারের বিদায় এবং উমরিগরের উদয়—দুটি ছবি—ভারতীয় নির্বাচকদের চোখের সামনেই টাঙানো হয়েছে ইডেন গার্ডেনে।

আজ উমরিগর ৩৬ রান করেছেন। রানের সংখ্যা ভুলিয়ে দেওয়া অসামান্য কয়েকটি রান। বোলারের আত্মসমপর্ণের উপর স্পর্ধিত বিকাশ। অথচ সেই বোলারদের অন্যত্র কি প্রতাপ। পাতৌদিকে সম্মোহিত করে রেখেছিলেন যে লক, উমরিগর তাঁকে বিধ্বস্ত করে দিলেন। লেগস্পিনের চাতুরী নিয়ে এসেছিলেন যে বার্বার, তাঁর উপর বর্বর অত্যাচার করলেন তিনি। কোমর হেলিয়ে, সোজা হয়ে, লাফিয়ে যেসব বাউণ্ডারী করতে লাগলেন, তাদের বীভৎস স্পর্শ থেকে দূরে রইল অত্যন্ত পারদর্শী ফিল্ডারেরা। উমরিগর যখন খেলছিলেন মনে হচ্ছিল একটা বিপুলাকার শক্তি যেন অতিকষ্টে ক্রিকেটে নিজেকে আবদ্ধ করে রেখেছে। বাউণ্ডারীর কঠিন উচ্চারণে সকলকে সন্ত্রস্ত করে, সশ্রদ্ধ করে, একটি দুরূহ ক্যাচে ধরা পড়ে উমরিগর যখন বিদায় নিলেন, তখন ইডেনে নেমে এল মহানায়কের অন্তর্ধানের শূন্যতা।

শুক্রবার রাত্রে শাক্ত বাঙালী একটি প্রার্থনা করেছিল—'জয়ং দেহি যশো দেহি।' আমি বলেছিলাম জনৈক বন্ধুকে, 'মা ফলেষু কদাচন'—এই মহাবাণীকে অন্য সব ক্ষেত্রে স্বীকার করি, কেবল ক্রিকেটের ক্ষেত্রে নয়। ক্রিকেটের কর্মযোগীদের ফলাকাঙ্ক্ষী হতে হবে।

সে ফল-প্রাপ্তির পক্ষে প্রধান বাধা সকলেরই জানা আছে ভারতের

ক্রিকেট পিচ। একমাত্র ভরসা ইডেন গার্ডেন—যেখানে মাটির তলায় চাঞ্চল্যের কিছু ইঙ্গিত থাকে, থাকে পতনোত্থানের রোমাঞ্চের সম্ভাবনা। আমাদের প্রার্থনা শুনে ইডেন হয়ত মৌন কণ্ঠে বলেছে,—আগে আমার সৌন্দর্য ছিল অচঞ্চল, কিন্তু স্বভাবে ছিল চাঞ্চল্য। এখন বিপরীত। নতুন প্রভুদের হাতে পড়ে সৌন্দর্য ক্ষয়ের পথে, কিন্তু চরিত্র অক্ষয়। হয়ত সে কথা ঠিক, তবু যেহেতু ইডেন, তাই আমরা স্মরণ করবার চেষ্টা করেছি ক্রিকেটের প্রবাদ—'ব্যাট বলের অশান্তির নামই ক্রিকেট,'—চেয়েছি ইডেন তার প্রলোভনের আদিম পাপে মোহিনী হয়ে বেঁচে থাক।

ব্যাটসম্যানদের দর্শকেরা বলেছিল—হে অশান্ত। সে সঙ্গীতের মর্যাদা রক্ষিত হয়নি সর্বক্ষেত্রে। সবচেয়ে দুঃখের কথা, মুস্তাকের পরে ইডেনের নতুন দুলাল চাঁদু বোরদে দর্শকদের রসবাসনার মর্যাদা রাখেন নি। বোরদে উইকেট রক্ষা করছিলেন। বোরদেকেও দর্শকদের ব্যারাক করতে হয়েছিল। টেস্ট ক্রিকেট যদি বোরদের মত ব্যাটস-ম্যানের হাত বেঁধে দেয়, ধিক্ সে ক্রিকেটে।

বিজয় মেহরার ধীরতার কারণ আমরা বুঝতে পারি। মেহরা দল-সূচনা করেছেন; কণ্ট্রাকটার আউট হয়ে যাওয়ার পরে তাঁর উপর বিশেষ ঝুঁকি পড়েছিল, এবং তাঁকে দলের জন্য তো বটেই, নিজের জন্যও খেলতে হয়েছিল; বছর ছয়েক আগে তাঁকে একবার 'টেস্ট' করে তাঁর অস্তিত্ব ভুলে যাওয়া হয়েছিল; নির্বাচকদের চোখে ব্যাটের আঙুল দিয়ে তাঁকে নিজের যোগ্যতা দেখাতে হয়েছে, অতএব সাবধান হতেই হয়। অফের দিকে মারে পারদর্শী বিজয় মেহরা তাঁর ২২২ মিনিটের সুদৃঢ় ও মূল্যবান ৬২ রানের ইনিংসের জন্য দর্শকদের কাছ থেকে 'ভারতবর্ম' উপাধি পেয়েছেন। সকলেই স্বীকার করেছে—এই 'বিজয়', বিজয় মঞ্জরেকারের উত্তম সহযোগী এবং বিজয় হাজারের হয়তো উত্তরাধিকারী।

গত বারে বেগ, এবারে পাতৌদি। বেগের মতই বহু প্রত্যাশার

উপর পা ফেলে উইকেটে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন এই রাজকুমার। রাজার দুলালকে সম্মুখে দেখে অনেকেই গলার মুক্তা কল্পনাভরে সে পথে ছড়িয়ে দিয়েছিল। 'টাইগার' মনসুর আলি ব্যাটের যাদুদণ্ডস্পর্শে ভারতের যে ইন্দ্রজাল ছড়িয়ে এসেছেন ইংলণ্ডের মাঠে,সে ভোজবাজির খেলা দেখবার জন্য অপেক্ষা করছিল ভারতীয়রাই। 'ভারতের বাঘ', 'পিতারপুত্র' তরুণপাতৌদি দর্শককে নিরাশ করেননি। তাঁর প্রথম দিকের ৩০।৪০ রান সুন্দরেরহাতে লেখা কয়েকটি অক্ষর। স্নেহ আকর্ষণ করবার মত কমনীয় আর নমনীয় শরীর নিয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছেন ব্যাটের উপরে; মার শেষ করবার পরে দুহাতে ব্যাট ধরে মাথা,শরীর আর ব্যাট দুলিয়েছেন খেয়ালী আনন্দে—সকলে তখন উচ্ছ্বসিত হয়েছে,—উল্লসিত হয়েছে তাঁর পা বাড়ানো নয়নমোহন সুইপে, ঈষৎ লাফানো বলে ড্রাইভ করবার তেজস্বী ভঙ্গিতে, দ্রুত, সংক্ষিপ্ত ও সৌন্দর্যতীক্ষ্ণ স্পর্শের চাতুরীতে, সে সবই সত্য, কিন্তু সে পাতৌদি বাম্পার খেলতে পারলেন না ভালভাবে এবং টনি লক ওভারের পর ওভার তাঁকে সম্মোহিত করে রাখলেন। বোঝা গেল 'চক্ষু বড় ধন'। পাতৌদির চোখে আঘাত যদি না লাগত ক্রিকেট-পৃথিবীর মাথায় তাঁর সিংহাসন স্থাপিত হোত। প্রতিভায় প্রতিষ্ঠিত হবার অনেক পরে রনজির একটি চোখ গিয়েছিল, তারপরে পুরনো রনজি আর ফিরে আসেন নি। রনজির প্রত্যাবর্তন বোধহয় বিধাতার অভিপ্রায় নয়। নইলে যৌবনসূচনায় চোখে আঘাত পাবেন কেন পাতৌদি?

কলকতার উপর থেকে হিমপ্রবাহ সরে গিয়ে যে ক্রিকেটপ্রবাহ সুরু হয়েছে তারই ধাক্কায় ৪০ হাজারের উপর দর্শক ইডেনকে ঘিরে বসেছিল শনিবার। কুয়াশার চাদর খুলে নিজেকে অনাবৃত করে দিয়েছিল ইডেন। ঘণ্টা ও বিউগিলের ধ্বনির মধ্যে বোধন হয়েছে খেলার। সে খেলা দেখবার জন্য রঙ ফিরিয়ে দাঁড়িয়েছিল হাইকোর্ট। এধারে মাঠের মধ্যেও রঙের পরিবর্তন।

ইডেনের সুবিখ্যাত সবুজ স্ক্রীন রঙ বদলে সাদা। সাদা জমিতে সবুজের বর্ডার দেওয়া স্ক্রীনের কলেজ-সাড়িটি চমৎকার। স্টেডিয়াম পূর্ণ থাকলেও বেতারভবনের স্টেডিয়াম শূন্য। গ্যালারির ললিত-অঙ্গে বিজ্ঞাপনের 'বিকিনি'র ফালি। পুলিসব্যবস্থার বিরুদ্ধে যথারীতি কোলাহল, এবং পুলিস-পাথরের উপর দিয়ে চঞ্চল জন-স্রোতের মাঠের উপর আছড়ে পড়া। ধীর খেলার বিরুদ্ধে দর্শক ব্যারাক করেছে বহুবার, আবার গতিক মন্দ দেখলে নিজেদের ব্যারাক থামিয়েছে নিজেরাই। খেলার আকর্ষণীয়তা কমে গেলে হয় তারা দূরবীণে ৪২ টাকার রঙ্গ ও রঙ্গিনী দেখেছে, কিংবা লেবুর খোসাযুদ্ধ করেছে নিজেদের মধ্যে। তারা বিশেষ পছন্দ ক'রে ফেলেছিল অঙ্গ-ভঙ্গিপরায়ণ ব্যারিংটনকে। জনতার প্রতি সদ্ভাবশীল ব্যারিংটন যখন পাতৌদির ক্যাচ ছেড়েছেন, সোৎসাহে সেই বন্ধুকৃত্যকে সমর্থন জানিয়েছে নানাভাবে। স্টেডিয়ামে যতই রোদ বেড়েছে, রৌদ্রোজ্জ্বল ক্রিকেটের দাবিও ততই বেড়েছে, আবেদন করা হয়েছে তারস্বরে টনি লকের টাকের আয়নার বিরুদ্ধে। 'আম্পায়ার লককে টুপি পরিয়ে দাও'—তাদের সংঘবাণী।

স্টেডিয়ামের ঠিক উল্টোদিকে ৪২৲ টাকার ছায়াবাসীরা আরও ঠাণ্ডা খেলা চেয়েছেন। জনৈক ভীত বৃদ্ধ ব্যাটসম্যানের যে কোনো আত্মরক্ষামূলক 'পরিত্যাগ'কে চীৎকার ক'রে সমর্থন জানিয়েছেন এবং কয়েকটি বালকবৃদ্ধ ন্যাকা উচ্চারণে আক্রমণের বিরুদ্ধে কাতরোক্তি করেছে।

ইংলণ্ডের বোলিং ও ফিল্ডিংয়ে ধার ছিল যথেষ্ট। উপরের ক্যাচ পড়েছে, কিন্তু মাটিতে বল ধরায় ভুল হয়নি। ছিপছিপে আঁট চেহারার নাইট বল ঠুকে বলকে মাটি থেকে ওঠাতে পেরেছেন; অল্প দৌড় দিয়েও বলে জোর এনেছেন স্মিথ; ফ্লাইট ও স্পিনের সুচারু মিশ্রণে উৎকৃষ্ট বোলিং করেছেন অ্যালেন। অ্যালেনের বোলিং অ্যাভারেজ চমৎকার: ১৯·২—৪—৩৬—৩।

কিন্তু বিপজ্জনক ছিলেন টনি লক। আজ তিনি বল ঘোরাতে পেরেছেন, রান দিয়েছেন অল্পই এবং উইকেটের কাছে পা ঘষে বাম হস্তের বিষপাত্র থেকে যা বর্ষণ করেছেন—তার দংশনে অস্থির ছিলেন পাতৌদি। লক কোনো কিছুই ছেড়ে দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তার কারণ লকের নিজের মুখে শোনা যাক। ক্রিকেট-জীবনের সূচনায় লক সবে একটু বড় খেলা খেলছেন, এমন এক সময়ে—

"বাবা যে দলে খেলছেন তার বিরুদ্ধে খেলতে নামলুম। বাবা রীতিমত জোরে বল করছেন। আমি খেলতে নেমে তাঁর প্রথম বল কভারে পাঠালুম—সে কি অপূর্ব অনুভূতি! ড্যাডির পরের বল উইকেট তচ্‌নচ্‌ করে চলে গেল।

" 'অবাক কাণ্ড, তোমার বাবা তোমাকে এমন করলেন?'—পরমানন্দে চেঁচাল উইকেটকীপার।

" 'তাতে কি হয়েছে, সুযোগ পেলেই বাবাকে আমি সাহায্য করি'—আমি উত্তর দিলাম।

"একটি মূল্যবান শিক্ষা এর থেকে আমি নিলাম, যা আমি কখনো ভুলিনি। তা হল—খেলার সময়ে বোলার ও ব্যাটসম্যানের মধ্যে তারা পিতাপুত্র হলেও কোন সহানুভূতি থাকতে পারে না।"

প্রসঙ্গত একটা গল্প মনে পড়ে। স্কচ পিতা-পুত্রের কাহিনী।

পিতা-স্কচ বালক পুত্রকে বললেন, বাছা, ছাতের উপর ওঠো।

পুত্র ছাতের উপর উঠলে পিতা তলা থেকে সস্নেহে বললেন, বৎস, লাফিয়ে পড় তলায়।

পুত্র সভয়ে বলল, সে কি পিতা, আমার লাগবে যে—।

পিতা বললেন, বৎস, আমি তো আছি।

পুত্র সন্দিগ্ধ হয়ে তবু বলল, লাফালে ধরবে তো?

পিতা দুই হাত বাড়িয়ে অভয় দিয়ে বললেন,এই তো আমি আছি।

পুত্র লাফাল, পিতা হাত গুটিয়ে সরে গেলেন, ফলে হাত পা ভেঙে পুত্র অজ্ঞান।

কয়েক দিন পরে হাসপাতালে পুত্রের জ্ঞান ফিরেছে, পিতা গেছেন দেখা করতে। পিতাকে দেখে অভিমানে পুত্রের যন্ত্রণা বেড়ে গেল। ফুঁপিয়ে কেঁদে বলল, বাবা, ধরবে বলে ধরলে না ?

পিতা আনন্দে হাসলেন, পরে গম্ভীর হয়ে বললেন, বৎস মোর, একটি শিক্ষা নাও এর থেকে, জগতে কাউকে বিশ্বাস করবে না।

এই জীবনদর্শনে টনি লক নিশ্চয় বিশ্বাস করেন না, কিন্তু তাঁর ক্রিকেট-দর্শন ঐ গল্পজাতীয়, তা তাঁর বলা কাহিনী থেকে বুঝতে পারছি।

এই টনি লক পাতৌদিকে যেভাবে সর্টলেগে এক হাতে তিনটি ডিগবাজি খেয়ে ক্যাচে ধরেছেন, তাতে বোঝা গেছে, তাঁকে কেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সর্টলেগ ফিল্ডসম্যান বলা হয় এবং তিনি কি ধরনের ভারতশত্রু।

সেই শত্রুতার আর একটি কাহিনী সর্বশেষে উপহার দিচ্ছি। আমার পাঠক কি জানেন, টেস্ট ম্যাচে সর্বপ্রথম যে বল লক ধরেছিলেন, তা একজন ভারতীয়ের ব্যাট থেকে ছুটে এসেছিল ?

১৯৫২ সালে ম্যাঞ্চেস্টারে ভারতের সঙ্গে ইংলণ্ডের তৃতীয় টেস্ট। টনি লকের ক্রিকেটজীবনের প্রথম টেস্ট। লর্ডসের মহা-কীর্তির পরে ব্যাট করতে নেমেছেন ভীনু মানকদ, বেডসার করছেন বল। লককে তাঁর নিজ ভূমি সর্টলেগে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল। তারপর ?—

"বেডসারের প্রথম বল অফ স্টাম্পের উপর হাফভলি। ভীনু মানকদ কভারে সজোরে পাঠালেন, বাউণ্ডারী। চতুর্থ বল প্রায় হাফ ভলি, এবার লেগস্টাম্পে। মানকদ তীব্রভাবে ঘোরালেন লেগে, বলটি সজোরে নেমে এল—আমি নীচু হয়ে তুলে নিলাম। সুতরাং টেস্ট ম্যাচে আমি প্রথম যে বল হস্তগত করলাম—তা ক্যাচ।"

এবং তা ভারতীয়দের ক্যাচ।

কেশবিরল অথচ বর্ণোজ্জ্বল টনি লক চারটে পঁয়ত্রিশ মিনিট পর্যন্ত ভারতীয়দের বিরুদ্ধে 'ঘৃণাপণে আবদ্ধ'।

খেলায় একটা সুস্থ ঘৃণার স্থান আছে, আছে প্রতিযোগিতার উন্মাদনা, আমরা যেন তা ভুলে না যাই।

ভারত—প্রথম ইনিংস

*নরী কণ্ট্রাকটার ব ডেভিড স্মিথ	
বিজয় মেহরা কট পারফিট ব লক	৬২
মঞ্জরেকর ব অ্যালেন	২৪
পাতৌদির নবাব ক·লক ব অ্যালেন	৬৪
উমরিগর ক স্মিথ ব অ্যালেন	৩৬
জয়সীমা নট আউট	১২
বোরদে নট আউট	১৫
অতিরিক্ত	৪
মোট (৫ উইকেটে)	২২১

উইকেট পতন ১।৬ কণ্ট্রাকটার, ২।৫০ মঞ্জরেকর, ৩।১৪৫ মেহরা, ৪।১৮৫ পাতৌদি, ৫।১৯৪ উমরিগর। বোলিং : ডেভিড স্মিথ : ২১—৭—৩২—১ ; নাইট : ১৩—৩—৪৬—০ ; ডেক্সটার : ১৬—২—৪৯—০ ; অ্যালেন ১৯.২—৪—৩৬—৩ ; লক : ২৭—১৭—৩৭—১।

খেলাটি ক্রিকেট—সত্যই ক্রিকেট

টেস্টের দ্বিতীয় দিন অদ্বিতীয় হতে পারত, যদি—। যদির কথা থাক, এমনিতেই দিনটিতে স্পন্দন আছে। লাঞ্চপূর্ব খেলাকে বাদ দিচ্ছি, লাঞ্চের পর ভারতীয় ব্যাটিং মসলাগন্ধে ভরপুর, অপরদিকে চা-এর কিছু আগে ও পরে ইংলণ্ডের ব্যাটিং 'খাদ্যপ্রাণ'-হীন। ১০৭ রানে ইংলণ্ডের তিনটি উইকেট গেছে। বড় কথা এই, দর্শকের বন্ধু ব্যারিংটন দর্শকের আনন্দবিধান ক'রে সত্বর বিদায় নিয়েছেন। খেলাটা একেবারে মরে যায়নি। উইকেটের ঝরা পাতার বনে ক্রিকেটের বসন্ত উঁকি দিচ্ছে।

একেবারে সকালে একটি অভিনব আনন্দ জয়সীমার মূর্তি ধরে দেখা দিয়েছিল। প্রভাতের শিশিরভেজা মাঠে ভারত প্রথম ৩০

মিনিটে ৩০ রান করল। এবং সেই রান-গতি সেইভাবে আরো খানিক এগিয়ে গেল। এর মূলে ছিলেন জয়সীমা, স্কোয়ারকাটের বাড়ানো ব্যাটের ব্যবহারে তিনি আমাদের চমকে দিয়েছেন। এই কি সেই জয়সীমা, যিনি বলের লাইনে অকুতোভয়ে দিনের পর দিন দাঁড়িয়ে থেকেও রানের খাতাকে অকলঙ্ক রাখতে পারেন? না, সে জয়সীমা হারিয়ে গেছে—নতুন বলের আঘাত থেকে বোরদেকে বাঁচায় যে, যে উইকেটে থাকলেই রান করে, সেই খোলসছাড়া তরুণ সর্প—অভিনব জয়সীমা। পাকানো শক্ত শরীরে কোমর নীচু ক'রে যখন জয়সীমা ড্রাইভ করেন তখন তার মধ্যে একটা ঔদ্ধত্য থাকে, যা বিপক্ষের কাছে আরো অসহনীয় হয়ে ওঠে কারণ নিজের মার জয়সীমা নিজে উপভোগ করেন উৎসাহভরে।

স্টেডিয়ামের দর্শকদের ক্রীড়াবোধ সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধা কখনো গোপন করতে পারিনি, করা সম্ভব নয় বলে। বিপরীত প্রান্তের সুশীতল-দর্শকেরা যখন ঘণ্টায় ভারতের ৪০ রান হলেই সুখী, তখন স্টেডিয়াম পাঁজির পাতা ছিঁড়ে ফেলে বেআইনী কিছু করবার জন্য ভারতের নওজওয়ানদের আহ্বান করেছিল একস্বরে। নওজওয়ানেরা যখন সে কথায় কান দেয়নি, তখন কিছু কিছু মুর্দাবাদ ধ্বনিও উঠেছিল। এতে নাকি বিয়াল্লিশাদি ভব্যেরা ভয়ানক বিরক্ত। আমি শুনে স্তম্ভিত, স্টেডিয়ামের ঐ কাজ নাকি দেশদ্রোহিতা! প্রশংসনীয় ও সক্রিয় নিরপেক্ষতা বলে যাকে গ্রহণ করা উচিত, তার বিরুদ্ধে এই বিষোদ্গার আমার মনকেও বিষিয়ে দিয়েছে। একটি কথা জানাতে চাই অবিনয়ে, দেশপ্রেম আসে এই স্টেডিয়াম থেকেই। স্টেডিয়াম যখন যুদ্ধে প্রাণ দেয়, বিয়াল্লিশ টাকা তখন ক্ষুদ্র বৃহৎ সেনাপতি সেজে ঐ সৈন্যদের রসদ চুরি ক'রে ব্যবসা করে।

নিমন্ত্রণ বাড়ীতে খাওয়ার যখন সুরু তখন কোলাহল, যখন শেষ তখন দই সাপড়ানোর হাপুস হুপুস শব্দ। ভারতের ইনিংসশেষে সেই পরমানন্দের পরিতৃপ্তি। শেষের দিকে ডুরানী-ইঞ্জিনীয়ার-দেশাই-রঞ্জনে বাউণ্ডারীর ভূরিভোজের আয়োজন করেছিলেন মাঠে। বোলার রঞ্জনে মনোরঞ্জনে অসাধারণ পারদর্শিতা দেখিয়েছেন লকের বলে ওভার বাউণ্ডারী করে। এক লাফে ইডেন-লঙ্ঘনের মহাবীরত্ব এই ইনিংসে রঞ্জনেই দেখাতে পেরেছেন। অপর পক্ষে রমাকান্ত দেশাই প্রাণকান্ত হয়েছেন ওড়াপথে না হলেও ছোটাপথে বার বার দর্শকদের কাছে বল পাঠিয়ে। 'বল পড়ে, ব্যাট নড়ে'—ক্রিকেটের এই যে বর্ণ পরিচয় ফাস্ট বেঞ্চের ছেলেরা ভুলে গিয়েছিল, তাকেই লাস্ট বেঞ্চের বালকেরা যখন মনে করিয়ে দিল তখন দর্শকদের আনন্দধারা বাঁধ মানেনি।

তার মানে, শেষের দিকের ব্যাটসম্যানদের ব্যাটে বল লেগেছে। তার মানে নিশ্চয় আগে এমন একটা সময় গেছে যখন ব্যাটে বল লাগেনি। ঠিক তাই। বোরদে ও ডুরানীর ব্যাট করার গোড়ার দিকে ব্যাটের শূন্যচালনা মনে রাখবার মত। বাতাসের জঞ্জাল পরিষ্কার করার ব্যাপারে ডুরানীর ব্যাট-সম্মার্জনীর ঘন ঘন ব্যবহারে চমৎকৃত সকলে। বোরদে ও ডুরানী লাঞ্চের আগে বোলারদের অনুমতি নিয়ে মাঝে মাঝে রান করেছেন। অধিকাংশ সময় আত্মসমর্পণযোগে 'প্রভু যেমনি খেলাও তেমনি খেলি' খেলেছেন। ঐ সময়ে অ্যালেনের বলে ফ্লাইট, ডুরানীর ব্যাটে ফ্লাইট।

ডুরানীর কথা এখানেই শেষ করা গেলনা। ডুরানীর আরো দুর্দশা হয়েছে। গোড়ার দিকে ব্যাট চালিয়ে ফসকাবার পরে ডুরানী ব্যাট বাড়িয়ে বল আটকানোর বেশী কিছু করতে পারেন নি। তখন অনেকে বলেছে, ডুরানী এখন হাত জমাচ্ছেন, পরের টেস্টে মেরে খেলবেন।

ডুরানীর আরো দোষ! সকালের অস্বস্তি কাটিয়ে বোরদে যখন চমৎকার খেলছেন, দলের সর্বোচ্চ রান (৬৮) করেছেন, তখন বোরদে রান আউট হয়ে গেলেন ডুরানীর চেষ্টার অভাবে। ডুরানীর শনি দশা তখন। দর্শকমনে 'ডুরানী' শব্দের বিকৃতি—দুয়োরানী। তখন ডুরানীর সমস্ত কিছু ব্যঙ্গের বস্তু,—আঁকাবাঁকা চেহারা, ত্রিভঙ্গ দাঁড়ানো, এমনকি তাঁর মনোহারী বাউণ্ডারী পর্যন্ত।

ডুরানী কিন্তু এগিয়ে গিয়েছিলেন। দর্শকের ব্যারাকে ও নিজের অপরাধবোধে 'উদ্দীপ্ত' ডুরানী যখন একটির পর একটি বাউণ্ডারীর আতসবাজি জ্বালিয়ে চললেন, পরিশেষে একটা কুড়ি মিনিটের মত সময়ে প্রথম দিনের 'মেডেনস্বামী' লকের বলকে যখন এক পা বাড়িয়ে কভার আর মিড অফের মধ্যে চালিয়ে দিলেন বিদ্যুৎবেগে—তখন তার দীপ্তিতে উদ্ভাসিত দর্শক সব বিরূপতা ভুলে সংবর্ধনা জানিয়েছে ভেঁপু বাজিয়ে। দুয়োরাণী তখন অজান্তে হয়ে গিয়েছে সুয়োরাণী।

রাণী নয় রাজা, রাজা নয় সম্রাট।—কেবল দর্শকেরা নয়—খেলোয়াড়রা পর্যন্ত ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরে সেকথা জানিয়ে দিল মাঠের মধ্যে, যখন ডুরানীর বলে বোল্ড হয়ে গেলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের রান-গৃধ্নু জমিদার ব্যারিংটন।

চা-পানের পরেই কিন্তু ভারতের পক্ষে আসল ক্রিকেট। অবশ্য চায়ের আগেই 'কম্পটন যুগের পরবর্তী মিডলসেক্সের শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান' এরিক রাসেল বোল্ড হয়েছিলেন রঞ্জনের ইনসুইঙ্গারে, কিন্তু ভারতের চোখে আশার প্রদীপ জ্বলে উঠেছিল অপরাহ্নের ছায়াধূসরতার অন্তরে। উত্তেজনার সীমা ছিলনা তখন। একদিকে উইকেট পড়ছে, অন্যদিকে পড়ছে ক্যাচ। যেমন বোলিং স্পেল এল ডুরানী ও বোরদের, তেমনি ক্যাচ মিসের স্পেল এল অনেকেরই, বিশেষত অধিনায়ক কন্ট্রাকটরের। সেই সময়কার অবস্থার কিছু বিবৃতি দেব, তার আগে বলে নিই, চা-এর আগেও চান্স নষ্ট হয়েছে ভারতের—

রান আউট হতে হতে বেঁচে গেছেন ব্যারিংটন, কিংবা দেশাইয়ের বলে লেগ স্লিপে জয়সীমার সামনে বল মাটিতে পড়েছে এবং এই রকম আরো।

চা-এর পরে। রঞ্জনের বলে কন্ট্রাকটারের সামনে ক্যাচ উঠল ব্যারিংটনের। কন্ট্রাকটার পারলেন না। অবস্থা দেখে ব্যাকুলভাবে বাবা তারকনাথের দয়া প্রার্থনা করল দর্শকেরা। ডুরানী বল করতে এলেন হাইকোর্ট-প্রান্তে। তৃতীয় বলে অপূর্ব সুইপে বাউণ্ডারী করলেন রিচার্ডসন। ডুরানীর দ্বিতীয় ওভারের তৃতীয় বলে ব্যারিংটন বোল্ড। দর্শকেরা পাগল। পারফিট এলেন। কন্ট্রাকটার মাঠ ত্যাগ করে গেছেন আঙুলে আঘাত পেয়ে। প্রসন্ন তাঁর বদলে ফিল্ডিং করতে মাঠে নেমেছেন। প্রথম বলেই পারফিট লেগস্লিপে সহজ ক্যাচ তুললেন। প্রসন্ন মিস করলেন। জীবনের প্রথম টেস্ট-বল প্রসন্নর হাত থেকে গলে গেল। কন্ট্রাকটারের ত্রুটির উত্তরাধিকার পেয়েছে এই ছোকরা। একটা বাউণ্ডারী হল। পরের ওভারে রঞ্জনের বলে কভারে কঠিন ক্যাচ দিলেন রিচার্ডসন। বোরদে ছাড়লেন। অতিথিদের উদ্দেশ্যে ভারতীয় খেলোয়াড়দের এই বলাগুলি দেখে দর্শক ক্ষিপ্ত। জল এল। ডুরানী মারাত্মক বল করছেন। 'বলহরি' বল। ময়দানের দিকে বল করতে এলেন বোরদে। লেগস্পিনের চাতুরীতে ভারতের একান্ত বিশ্বাস এখন। বোরদের দ্বিতীয় ওভার একটি অপূর্ব ওভার। প্রথম বলে রিচার্ডসন পরাভূত হয়েও জীবিত। দ্বিতীয় বলে মিড অনের কাছ দিয়ে বাউণ্ডারী। তৃতীয় বলে এল বি-র প্রচণ্ড গর্জন। পরের বলে, কন্ট্রাকটার এসেছেন, সর্ট স্কোয়ারে শুয়ে পড়ে ধরে নিলেন রিচার্ডসনকে। ইংলণ্ড—৩-৯১। ডেক্সটার এলেন। মাঠ প্রমত্ত। চল্লিশ হাজার বুকের ঢেউভরা একটি মহাসাগর। বোরদের যেমন স্পিন তেমনি আকাশ-ছোঁয়া ফ্লাইট। ডুরানীর একটা ফুলটস বলে ডেক্সটার কভারে বাউণ্ডারী করলেন। খেলা থেকে কেউ চোখ তুলতে পারছে না। ব্যাটের পিছনে বুক রেখে ব্যাটিং করছেন

পারফিট। ইংল্যাণ্ড ইন ডেনজার। জয়সীমার ফিল্ডিংয়ের দোষে বাউণ্ডারী হলো। মাঠে ছায়া নেমেছে। আলো কমের আবেদন বুঝি হয়। এই বুঝি শেষ ওভার। দর্শকেরা লাফিয়ে উঠল—বোরদের বলে সর্ট স্কোয়ারে পারফিট ক্যাচ তুলেছেন।

কণ্ট্রাকটার কায়দা করে ফেলে দিলেন।

যদি পারফিটের ক্যাচটি ধরা হত?

কণ্ট্রাকটারের কোনো ক্ষমা নেই। বোঝা গেল, খেলা তাঁর কর্ম নয়, মাঠে লোক খাটানোর কণ্ট্রাকটার তিনি।

যদি ঐ ক্যাচটি ধরা হত তা হলে—বল্ মা মেরী দাঁড়াই কোথা?

ধরা যদিও হয়নি, তবু বলি, আজ অপরাহ্নে মনে হয়েছে, খেলাটা ক্রিকেট। সত্যই ক্রিকেট।

ভারত—প্রথম ইনিংস

জয়সীমা ক মিলম্যান ব স্মিথ	৩৭
বোরদে রান আউট	৬৮
সেলিম ডুরানী ব অ্যালেন	৪৩
ফারুক ইঞ্জিনীয়ার ক পারফিট ব লক	১২
দেশাই নট আউট	১৩
বসন্ত রঞ্জনে ক বার্বার ব অ্যালেন	৭
অতিরিক্ত	১০
মোট	৩৮০

উইকেট পতন—৬।২৫৯ জয়সীমা, ৭।৩১৪ বোরদে, ৮।৩৫৫ ডুরানী, ৯।৩৫৭ ইঞ্জিনীয়ার, ১০।৩৮০ রঞ্জনে।

বোলিং: (সমগ্র ইনিংসের) স্মিথ; ৩১-১০-৬০-২; নাইট: ১৮-৩-৬১-০; ডেক্সটার: ২৯-৭-৮৩-০; অ্যালেন: ৩৪-১৩-৬৭-৫; লক: ৩৬-১৯-৬৩-২; বার্বার: ৩-০-১৭-০; রাসেল: ৫-০-১৯-০।

ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস

রিচার্ডসন ক কন্ট্রাকটার ব বোরদে	৬২
রাসেল ব রঞ্জনে	১০
ব্যারিংটন ব ডুরানী	১৪
পারফিট নট আউট	১০
ডেক্সটার নট আউট	১১
মোট (৩ উইঃ)	১০৭

উইকেট পতন : ১।২৬ রাসেল ; ২।৬৯ ব্যারিংটন; ৩।৯১ রিচার্ডসন।

বোলিং : দেশাই : ১০-১-৩৪-০ ; রঞ্জনে ১২-২-৩৪-১ ; ডুরানী ৮-৩-২২-১ ; বোরদে ৫-১-১৭-১।

বলো হবে জয়

স্বাগত নববর্ষ !

চল্লিশ হাজার হৃদয়, আশী হাজার বাহু ১৯৬২ সালের পয়লা জানুয়ারীকে স্বাগত জানিয়েছে ইডেন গার্ডেনের মধ্যে। সে নমস্কার সমস্ত ভারতবর্ষের।

সুখ দুঃখের মালা গলায় অবতরণ করে নববর্ষ। তারই একটি মুক্তো খসে পড়েছিল ইডেন গার্ডেনের উপর। মুক্তোয় হাসি আছে, তার মধ্যে আবার টলটলে একটা কান্নাও আছে। ভারতবর্ষ হাসলেও নতুন বছরের প্রথম দিনটি বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে ইংলণ্ডের পক্ষে, বিশেষত পয়লা জানুয়ারীর নববর্ষ যখন ইংরেজদের নিজস্ব এবং ভারতের আত্মকৃত। আজ নৈশ ভোজের সময়ে পানপাত্রে কয়েকটি বিষণ্ণ বিদেশী মুখের ছবি ফুটে উঠবে আমরা তা জানি।

নববর্ষে আমাদের অভিনন্দন কয়েকটি মানুষকে—বোরদেকে, ডুরানীকে ও জয়সীমাকে।

এবং ইংলণ্ডের অধিনায়ক ডেক্সটারকে। লককেও বটে, কিছু পরিমাণে অ্যালেনকে।

কী অপূর্ব একটি প্রভাত, কী অসাধারণ সেই মধ্যাহ্ন !

বিলেতী নববর্ষে বোরদে ও ডুরানী পয়লা বৈশাখের প্রতিজ্ঞা নিয়ে মাঠে নেমেছিলেন—'নব বৎসরে করিলাম পণ লব স্বদেশের দীক্ষা।' কণ্ট্রাকটারকে অন্তত একটি ধন্যবাদ—তিনি স্পিনার দিয়ে আক্রমণ সূচনা করবার বিবেচনা দেখিয়েছিলেন।

বোরদে এবং ডুরানী ইংলণ্ডের ভিতরে বল হয়ে ঢুকে ফাল করে ছেড়ে দিলেন।

মাঝে একবার রঞ্জনেকে আনা হয়েছিল; অকারণে অনেকক্ষণ আটকে রাখাও হয়েছিল, উমরিগরকে বল না দেওয়ার কারণও বোঝা যায়নি,—শেষ পর্যন্ত বোরদে ও ডুরানী ইংলণ্ডের সংহারে জোটবদ্ধ হলেন।

উইকেট পড়ার রোমাঞ্চকর দৃশ্য উত্তাল হৃদয়ে দর্শক দেখতে লাগল। একের পর এক উইকেটের দ্বার ভাঙ্গছে,—জয়কন্যার নিভৃত কক্ষের ততই নিকটবর্তী হচ্ছি আমরা। বোরদে ছুটছেন, সঙ্গে আছেন ডুরানী। লেগ স্পিনের চমৎকার যমজ।

উইকেটের দুই দিকে বোরদে ও ডুরানীর চেহারা দেখে নেবার মত। দীর্ঘাকার ছিপছিপে তীক্ষ্ণনাসা ডুরানী, বাঁ হাতের টানা ধাঁচের ছোট ছোট লেগব্রেক তীরের মত ছুঁড়ছেন। ব্যাটসম্যান মারতে গিয়ে থেমে পড়ছে। একটু অসাবধান হলেই বুকে বিঁধে উইকেট লুটিয়ে পড়ছে। অন্যদিকে বোরদে, আঁট গড়ন, চুলে পালিশ —চটপটে দু'চার পা দৌড়ের পর লাল আপেল ঝুলিয়ে দিচ্ছেন সামনে। সে আপেল নাচাচ্ছে ব্যাটসম্যানকে। কিন্তু লোভ করেছ কি গেছ। লোভ না করেও উপায় আছে? আপেল পড়ে সাপ হয়ে যায় তাকি কেউ জানে? বোরদের হাতে ছিল সেই লাল জুজুর বিভীষিকা। ব্যাটসম্যানকে যথেচ্ছ পরাভূত-করা সেই বোলিংয়ের প্রচুর নমুনা দেওয়া যায়। স্পর্শদোষ ঘটেনি বলে ব্যাটসম্যানেরা বহু ক্ষেত্রে বল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সারল্য দেখিয়েও বেঁচে গেছেন। ডুরানী ও বোরদে ফিল্ডিংয়ের কৌতুক দেখালেন, ঘিরিয়ে দিলেন অসহায়

ব্যাটসম্যানকে অর্ধচন্দ্রাকারে। তাঁদের বোলিংয়ের নমুনা দেওয়া উচিত, ধরা যাক, আঘাতে, অবজ্ঞায় ও আশু বিনাশের বাসনায় অধীর বোরদের একটি ওভার,—থাক, সে রকম অনেক ওভারই তো আছে।

বোরদে এবং ডুরানী যখন ইংলণ্ডের টেস্ট খেলোয়াড়দের নিয়ে এই রকম নাড়াচাড়া করছেন, তখন সেই অবমানের পটভূমিকায় একটি দীর্ঘ দেহের দৈর্ঘ্য গেল বেড়ে। অধিনায়ক টেড ডেক্সটার সত্যই অধিনায়ক। পতনের মধ্যে মহান সেই মূর্তি। পারফিটের সঙ্গে শিশিরে ভেজা ঘাস মাড়িয়ে যখন তিনি উইকেটের দিকে হাঁটতে সুরু করেছিলেন, তখন তাঁর মনে এই প্রতিজ্ঞা ছিল,—লেগব্রেকের বক্রতাকে ব্যাটের ডাণ্ডায় সোজা করে দেব। সুরুও হয় সেইভাবে, রান উঠতে লাগল দ্রুতবেগে। ১২ মিনিটে ১৯ রান। কিন্তু সব সাধ পূর্ণ হয় না। বোরদের হাত থেকে 'আর আমায় ঘুরাবি কত' গুঞ্জন তুলে যে বল ছুটছিল, বিপক্ষের বাড়ানো ব্যাটের ফলাকে ফাঁকি দেবার পক্ষে তারা যথেষ্ট বক্র আর চতুর ছিল। ডেক্সটার দাঁড়িয়ে দেখলেন অন্য প্রান্তের ক্ষয়। তোপ অধিকার করিয়া ডেক্সটার ডাকিয়া বলিলেন, আইস, ক্রিকেটের সন্তান আমরা, প্রাণ যায় যাক—প্রাণই গেল, যুদ্ধে জয় হল না।

কিন্তু ডেক্সটার যুদ্ধ করেছিলেন। তাঁর ৫৭ রানের এই ইনিংস তাঁর একটি শ্রেষ্ঠ ইনিংসের মধ্যে পড়বে। পরাজয়ের শিথিল ভূমির উপর দাঁড়িয়ে ডেক্সটার আত্মরক্ষায় যে শক্তি এবং সুযোগমত আঘাতের যে সাহস দেখিয়েছেন, তা তাঁরই যোগ্য, এইটুকুই শুধু বলা যায়। প্রতিনায়কের অভিমানী সংগ্রামের মহিমাকে সকলের মনে গেঁথে দিয়েছিলেন টেড ডেক্সটার।

১৬৮ রানের উদ্বৃত্ত সঞ্চয় নিয়ে ভারত দ্বিতীয় ইনিংস সুরু করল। ইংলণ্ডকে ফলো-অন করানো যায়নি। তাতে ক্ষতি নেই। হাতে

আড়াই দিনেরও বেশী সময়। তা ছাড়া উইকেট স্পিন নিচ্ছে। ফলো অন করাতে পাবলে তা আশীর্বাদ নাও হতে পারত। এই উইকেটে চতুর্থ ইনিংস খেলা মারাত্মক। এখন একমাত্র কাজ দ্রুত রান তুলে ইংলণ্ডকে সময় থাকতে মাঠে নামানো। চঞ্চলা জয়লক্ষ্মীর আঁচলটা মুঠোয় ধরা গেছে, ছেড়ে দেবে কোন্ অধম সন্তান?

দেখা গেল দর্শকের মনের সঙ্গে জয়সীমার মন এক তারে বাঁধা। ইনিংস সূচনা করতে এসে জয়সীমা নতুন আলোকপাত করলেন। জয়সীমা ব্যাট চালালেন। স্কোয়ারকাটের ভুলে যাওয়া মারে মার মার ক'রে উঠল তাঁর ইনিংস। ঘড়ির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে রানের দৌড়! কণ্ট্রাকটার মারেরদৌড়ে না পারলেও পায়ের দৌড়ে সহযোগী। সর্টরানের উত্তেজনায় সারা মাঠ মথিত। আকাশে প্রসন্ন সূর্য, মহাকরণের উপর আনন্দিত পতাকা, শীতের শিহর-মধুর বাতাস। আবেগ অধীর নানা বাদ্যে কার্ণিভালের পরিবেশ। মুখে-হাতে-যন্ত্রে সুরের ঐকতান। যে দর্শক ইংলণ্ডের ইনিংসে চার বার মিডলস্টাম্পের পশ্চাৎঅপসারণ দেখেছে (বার্বার ও ডেক্সটার বোরদের দ্বারা, অ্যালেন ও স্মিথ ডুরানীর দ্বারা), যারা ইংলণ্ডের শেষ দুই উইকেটকে শেষ দুই বলে যেতে দেখেছে, দেখেছে ভারতের সম্পন্ন ৩৮০-'র পাশে ইংলণ্ডের দরিদ্র ২১২-কে, তারা এখন আবার জয়সীমার মধ্যে দেখছে রানের মুক্ত গতিকে। খুসীর হিল্লোলে ভাসছে সবাই।

হঠাৎ ছন্দপতন। কণ্ট্রাকটার আউট। অ্যালেনের প্রথম ওভারের পঞ্চম বলে স্টাম্পড্।

কণ্ট্রাকটার যাক। কাটা শরীর জুড়ে যে মাঠে এসেছে, সে ফাঁকি দেবে কতক্ষণ? চলে যাও কণ্ট্রাকটার, দমিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছু দিতে পারনি, এখন বিদায় হও, তোমার জন্য বিশ্রামসময়ে বসে 'তারকার অপমৃত্যু' বলে একটা কবিতা লিখে দেওয়া যাবে।

জয়সীমাও গেলেন। দুটো চল্লিশ মিনিটের সময় ৩৬ রানের মাথায় লকের বলে জয়সীমা বোল্ড হয়ে গেলেন। দুঃখের কথা,

কিন্তু প্রবল হাততালিতে দর্শকেরা এই কথাই জানাল, খেলাটিকে 'প্রাভাতিক অবসাদ' থেকে জয়সীমাই তুলে দিয়ে গেছেন একথা সকলের মনে আছে। তাঁর বিদ্যুচ্চারগুলিকে কেউ ভোলেনি, ভোলেনি অ্যালেনের বলে তাঁর ওভার বাউণ্ডারীটিকে, যার জন্য লক তাঁর হ্যাণ্ডসেক করেছিলেন এবং আম্পায়ার উর্ধ্ববাহু হয়ে যখন সেই সুউচ্চ সৃষ্টিটিকে স্বীকার করেছিলেন, তখন প্রেমানন্দে মাতোয়ারা হয়েছিল হাজার হাজার মর্ত্যের জীব।

এখনো অনেক খেলোয়াড় আছেন। আছেন স্ট্রোকসিদ্ধ মঞ্জরেকার, সৌন্দর্যবিদ্ধ পাতৌদি, প্রবলপ্রতাপ উমরিগর, সুকুশলী বোরদে এবং আরো অনেকে।

মঞ্জরেকার-পাতৌদি খেলতে লাগলে। দিনের শেষ ওভারের তৃতীয় বলে আউট হওয়া পর্যন্ত মঞ্জরেকার খেললেন। পাতৌদি অপরাজিত রইলেন।

মঞ্জরেকার খেলেছিলেন ১২৭ মিনিট, পাতৌদি ৯৭ মিনিট।

তাঁরা কত রান করেছিলেন ?

মঞ্জরেকার ২৭, পাতৌদি ২৪।

ক্রিকেটে এতবড় জঘন্য অন্যায় আমি অল্পই দেখেছি, যা মঞ্জরেকার করেছেন। ১২৭ মিনিটে ২৭ রান, যখন জয়ের গলায় আমাদের আঙ্গুল বসে আছে!

মঞ্জরেকার আউট হলে উৎফুল্ল দর্শকেরা সংকীর্ণ দেশপ্রেমকে অস্বীকার করল আনন্দরবে। ক্রিকেটকে নষ্ট করার অধিকার নেই দেশপ্রেমের। কিংবা দেশপ্রেমবশেই তারা মঞ্জরেকারের অন্যায়ের প্রতিবাদ করল।

আমি জানি মাঠ স্পিন নিচ্ছিল। আমি জানি অ্যালেনের বলে লেংথ এবং চাতুরী দুইই আছে। সে বস্তু আরো প্রখরভাবে আছে লকের লেগস্পিনে। আরো জানি যে, ইংলণ্ডের ফিল্ডিং সচরাচর ভুল করে না। 'হিমালয়ের ভয়ঙ্করের' থাবা বাড়িয়ে লক আছেন মাঠে।

চাবুকের মত শরীর নিয়ে প্রস্তুত আছেন ডেক্সটার ও তাঁর সহযোগীরা। তবু নিশ্চয় গর্তে ভরে যায়নি মাঠ, যদি যেত তাহলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা উইকেটে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হত না। দাঁড়িয়ে থাকা যদি সম্ভব হয় তাহলে রান করাও সম্ভব। অন্তত প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড়ের পক্ষে। শ্রীযুক্ত মঞ্জরেকার কি স্বেচ্ছায় প্রথম সারি থেকে নেমে পড়েছেন ?

সুতরাং দর্শকেরা চীৎকার করবেই। হাতের মুঠোর জয় কেন তারা খোয়াতে দেবে ? মঞ্জরেকারের বিরোধী চেষ্টা সত্ত্বেও হয়ত জয় হবে, কিংবা ড্র, কিংবা কি হবে অনিশ্চিত ক্রিকেট সম্বন্ধে কেউ বলতে পারে না, তবু ন্যায়সঙ্গত প্রয়াস থাকবে না কেন ? রক্তের স্বাদ পাবার পরে দর্শকেরা শাকান্নে সুখী নয়। তারা অজস্রভাবে বিপক্ষের বোলারদের সহযোগিতায় মঞ্জরেকারকে হয় মারাবার নয় তাড়াবার চেষ্টা করেছে। (মঞ্জরেকারের কাণ্ড দেখে বিউগিল বুকভাঙা ধ্বনি তুলেছে, দর্শকেরা চেঁচিয়ে বলেছে 'মঞ্জরেকার না খঞ্জরেকার'।) অদ্ভুত খোঁড়ানো ব্যাটিং। মঞ্জরেকার-পাতৌদির তিতিক্ষা-মার্কা খেলা দেখে এক মহিলা খর গলায় ঝঙ্কার দিয়েছিলেন,—উইকেট নিয়ে উনুনে আঁচ দিও, ক্রিকেট খেলে কাজ নেই। এক বৃদ্ধা বলেছেন, আহা, রাগ কর কেন, বাছা আমার কাঁটা বেছে মাছ খাচ্ছে। তাতে তাঁর নাতনি বলেছে, ঠিক বলেছ দিদা, অ্যালেন আর লকের বলে বড্ড কাঁটা। এক শাস্ত্রবিৎ দর্শক বলেছেন, 'বিজয়' বাবুর ছাড়ন-মন্ত্র জানা আছে মারণ-মন্ত্র জানা নেই। এদের মধ্যে সবচেয়ে তীক্ষ্ণ একটি রসের বচন,—হায়, ভারতীয় ব্যাটিং এখন পরিবার-পরিকল্পনার অধীন।

মঞ্জরেকার আউট হতে বিষাক্ত আনন্দবোধ হয়েছিল মনে।

তবু এখনো নৈরাশ্যের কারণ নেই। খেলা সম্পূর্ণ হাতছাড়া হয়নি ভারতের। চতুর্থ দিন সকালে দ্রুত রান তুলে প্রায় চারশোর মত ব্যবধান যদি ভারত আনতে পারে তাহলে ইংলণ্ড হয়ত আত্মরক্ষা করতে পারবে না! শুভ সূচনা তাহলে ব্যর্থ হবে না। প্রতিদিন

প্রভাতে হাজার হাজার মানুষ ইডেন গার্ডেনে আসছে আশার আকর্ষণে। সেটা যেন আশার ছলনা না হয়। চতুর্থ কি পঞ্চম দিনের কোনো এক সময়ে আমরা যখন ফিরে যাব, তখন যেন আমাদের সেই প্রত্যাবর্তনের পদধ্বনিতে জয়সঙ্গীত বেজে ওঠে—বলো হবে জয়, বলো নাহি ভয়।

ভারত প্রথম ইনিংস ৩৮০

ইংলণ্ড প্রথম ইনিংস

পিটার পারফিট ক অতিরিক্ত (কস্তুরীরঙ্গন) ব বোরদে	২১
টেড ডেক্সটার ব বোরদে	৫৭
বব বার্বার ব বোরদে	১২
বেরী নাইট স্টাম্পড্ ইঞ্জিনীয়ার ব ডুরানী	১২
ডেভিড অ্যালেন ব ডুরানী	১৫
মিলম্যান ক ইঞ্জিনীয়ার ব ডুরানী	০
টনি লক নট আউট	২
ডেভিড স্মিথ ব ডুরানী	০
অতিরিক্ত	৪
	মোট ২১২

উইকেট পতন: ৪।১৩০ পারফিট; ৫।১৫৫ বার্বার; ৬।১৮১ নাইট; ৭।২০৮ ডেক্সটার; ৮।২০৯ অ্যালেন; ৯।২১২ মিলম্যান; ১০।২১২ স্মিথ।

বোলিং (সমগ্র ইনিংসের) দেশাই: ১০-১-৩৪-৩; রঞ্জনে: ২১-৩-৫৯-১; ডুরানী ২৩'২-৮-৪৭-৫; বোরদে ২৫-৮-৬৫-৪।

ভারত—দ্বিতীয় ইনিংস

কন্ট্রাক্টর স্টাঃ মিলম্যান ব অ্যালেন	১১
জয়সীমা ব লক	৩৬
মঞ্জরেকর স্টাঃ মিলম্যান ব লক	২৭
পাতৌদি ব্যাটিং	২৪
ইঞ্জিনীয়ার ব্যাটিং	৪
অতিরিক্ত	৪
	মোট (৩ উইঃ) ১০৬

উইকেট পতন: ১।৩৯ কন্ট্রাক্টার; ২।৫৫ জয়সীমা; ৩।১০২মঞ্জরেকর;

বোলিং: স্মিথ: ৩-০-১৫-০; অ্যালেন; ২৩-১০-৩৪-১; লক: ২৪-১০-৪০-২।

ভারত ও জয়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন টেড ডেক্সটার।

ইডেনে চতুর্থ টেস্ট ভারত যদি জয়ী হয়, টেড ডেক্সটারের ছায়া মাড়িয়ে ভারতীয় খেলোয়াড়দের প্যাভিলিয়নে প্রবেশ করতে হবে।

আজও খেলা শেষ হয়েছে নির্ধারিত সময়ের কয়েক মিনিট আগে। ডেক্সটার 'আলোর আবেদন' জানিয়েছিলেন।

প্রসন্ন গম্ভীর কণ্ঠে এক বহুদর্শী দর্শক বললেন, ও আবেদনের প্রয়োজন ছিল না—ডেক্সটার তুমি মাঠ আলোকিত করে ছিলে।

ডেক্সটার দিনশেষে ৬১ রান করে অপরাজিত আছেন।

একজন পুরানো ক্রিকেট-রসিক আমাকে বলেছেন, আপনি গতদিন ডেক্সটার সম্বন্ধে অনেক লিখেছেন, কিন্তু কিছু মনে করবেন না, ডেক্সটারকে প্রকাশ করতে পারেন নি।

আমার ত্রুটি আমি স্বীকার করছি।

ডেক্সটার ক্রিকেটের ভুলে যাওয়া মহিমাকে ইডেনের উপর বর্ষণ করেছেন। এখন ব্যাকফুট ড্রাইভের যুগ। উপযোগিতায় অদ্বিতীয় এই ব্যাকফুটের খেলা। কিন্তু ক্রিকেটের রাজারা আসেন সামনে পা বাড়িয়ে। ডেক্সটার খেলার রাজা।

অথচ পটভূমিকায় অন্ধকার। সামনেও কালো পর্দা। সেই নৈরাশ্যের কৃষ্ণ যবনিকার ভিতর থেকে কতকগুলি হাত কতকগুলি বল ছুঁড়ে যাচ্ছে। ডেক্সটার তারই ভিতরে সহযোগী খেলোয়াড়দের পিতৃ-স্নেহে রক্ষা করে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন।

ডেক্সটার যতক্ষণ ক্রীজে থাকবেন, ততক্ষণ ভারত শান্তিপতাকা দেখবে না।

তবু জয় 'প্রায়' ভারতের মুঠোয়! অনিশ্চয়ের গর্ভে একটি 'নিশ্চয়' শিশু জন্ম নিয়েছে, এখন ভূমিলাভের প্রতীক্ষা। এই শিশুটি ভারতের পক্ষে দেবশিশু। সুতরাং শুভলগ্ন ছাড়া ভূমিষ্ঠ হবে না।

আগামীকাল চারটে পঁয়ত্রিশ মিনিটের পরে কালবেলা পড়ে যাবে। তারই মধ্যে যাতে শুভাশৌচ হয় দেখা দরকার।

ভারত কি জয়লাভ করবে ? লক্ষ কণ্ঠে একই প্রশ্ন। জয়ের পক্ষে পার্থিব সকল কারণ বর্ত্তমান, কিন্তু—

হে 'কিন্তু', পৃথিবীর সমস্ত রক্ষণশীলতার মূলে তুমি আছ। জয় না পাওয়া পর্যন্ত ভারত-প্রেমিকদের তুমি যন্ত্রণা দেবেই।

ভারতের জয় যারা চায়, আজ বিকালে তাদের বড় অস্বস্তি গেছে। জয় হবে না জোর করে বলবার কারণও নেই, ইচ্ছে তো নেই-ই, কিন্তু জয় হবেই একথাই বা না জিতে বলা যায় কি করে ? 'মনে রেখো'—একজনকে বলতে শোনা গেছে,—'দশ জন আউট হবার পরে তবে ইনিংস শেষ হয়, ইংলণ্ডের মাত্র চারজন আউট হয়েছে'। এই পরিস্থিতিতে দর্শকবিচারে ইংলণ্ডের খেলোয়াড়ের উৎকর্ষবৃদ্ধি ঘটে গেছে। ডেক্সটার বা পারফিট ছাড়াও যাঁরা আছেন, যেমন নাইট, অ্যালেন—কাউন্টি-রেকর্ড আউড়ে পড়ুয়া দর্শক জানিয়েছেন—তাঁরা মস্ত মস্ত ব্যাটসম্যান। তাছাড়া বিপদের মুখে লক অঘটনবিলাসী। ঐ 'পণ্ডিত' ব্যক্তিই বলেছেন,—বলা যায় না, মাটি ফুঁড়ে ইংলণ্ডের পরিত্রাণকর্তা বেরিয়ে পড়তে পারেন। তাতে ভদ্রলোকের বন্ধু বলেছেন, জেনো রেখো, তাহলে আমার নাম জুডাস ইসক্যারিয়েট।

না, সত্যি কি ভয়ের কিছু আছে ? আগামী কাল শেষের কয়েকটি দুরন্ত ইংরেজ বালককে নিয়ে ভারতজননীকে অস্থির হতে হবে ? ইডেনের লড়াই কি ইডেনগ্রাডের লড়াই হয়ে দাঁড়াবে ? আমরা জানি তা হবে না, তবু আজকের মনোভাব, পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার খবর ভিতর থেকে জানা গিয়েছে তবু রেজাল্ট আউট হয়নি—সেইরকম।

মাঠে আমার পরিচিতজন জিজ্ঞাসা করেছেন,—আজ কি লিখবেন ? আমি বলেছি নতুন কিছু লেখবার নেই, যদি নাটকীয় কোনো মুহূর্ত চান। আজ যা ঘটেছে সবই ষোল আনা প্রত্যাশিত, কম বা বেশী নয়। ভারত সকালে দ্রুত রান তুলেছে, তা সত্ত্বেও লাঞ্চের পরে

ক্যাপ্টেন ইনিংস ডিক্লেয়ার করেন নি, গতকাল মঞ্জরেকার পাতৌদির মাঠে বসে থাকার জন্য তা করা কঠিনও ছিল ; ইংলণ্ডের উইকেট পড়েছে, সংখ্যায় তা 'সামান্য' দুই হয়নি, কিংবা চাঞ্চল্যকর সাতও নয়। সবই জানা ব্যাপার। সুতরাং ঘটে যাওয়া বস্তুর সহজ বর্ণনা করলেই চলবে।

আমার পাঠক এতে সন্তুষ্ট না হতে পারেন—নিশ্চয় রোমাঞ্চকর কিছু ছিল! তাই দেখবার জন্যেই তো সর্বাধিক সংখ্যক দর্শক সর্বাধিক আবেগে আজ মাঠে হাজির। সকালে খেলার আগে ইডেন গার্ডেনের উপর মানুষ আর গাড়ীর ঢেউ আছড়ে পড়েছে, ইডেন-ক্যানিউট তাদের থামিয়ে দিয়েছে মাঠের ধারে। সকালের রোদে গাড়ীগুলি 'প্রদীপ্ত মনিখণ্ডবৎ জ্বলিতেছিল।' যে মানুষগুলির প্রবেশাধিকার আছে তারাও জ্বলছিল আশায় ও আনন্দে। যাদের নেই, তারা কেউ ফিরে যাচ্ছিল বাড়ির রেডিওর পাশে, কেউ বা মাঠের বাইরে ইডেনের ঝাউয়ের তলায়, সেখানে জলের ধারে পা ছড়িয়ে বসে ট্রানজিস্টারের রসকথা। অবশ্য নিভৃতে বেতারগুঞ্জন শোনার উপায় নেই, সেখানে এবং সারা ভারতের নানা স্থানে, যেখানেই রেডিও খোলা থাকবে সেখানেই গুড়ের ফোঁটার চার পাশে পিঁপড়ের মত মানুষের ভীড়। এই অগণিত উদ্‌গ্রীব মানুষ যে নাটক চায়, আমি বলতে বাধ্য সে নাটক আজ ছিল না।

তবু ছিল। সকালের একটা সময়।

চমৎকার সূচনা করলেন পাতৌদি। অ্যালেনের প্রথম ওভারের প্রথম ও পঞ্চম বলে পাতৌদির নবাব কাট করে দুটি বাউণ্ডারী করলেন। ভারতের হাসির অবস্থা। দলের রান তিন উইকেটে ১১৯।

অ্যালেনের দ্বিতীয় ওভারের পঞ্চম বল—ফারুক ইঞ্জিনীয়ার উইকেট-কীপারের হাতে কট।

এক বল পরে—লকের দ্বিতীয় ওভারের প্রথম বল—পাতৌদি উইকেটকীপারের হাতে কট।

চার বল পরে—লকের পঞ্চম বল—ডুরানী পারফিটের হাতে কট।

১১৯ রানের মাথায় ৭টি বলের মধ্যে ভারতের তিনটি উইকেট গেল। ভারত এখন ৬ উইকেটে ১১৯।

এই সময়ে দর্শকদের অবস্থা? কাঁদ কাঁদ মুখে হারার হতাশা, ধুকুপুকু বুকে মৃত্যু করোনারী। দুঃসাহসীরা ইংলণ্ডের সঙ্গে ফিফটি ফিফটি ভাগাভাগিতে রাজী। মঞ্জরেকার সম্বন্ধে আর শোনো বিদ্বেষ নেই। ভারতীয় ব্যাটিংয়ের 'শূন্য'তায় বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস—ক্রিকেট! অয়ি সর্বনাশিনী!

দর্শকদের এই আধ্যাত্মিক সঙ্কটের কালে অন্য প্রতিজ্ঞা নিয়ে দুই ব্যক্তি মাঠে নামলেন। একজনের নাম উমরিগর, উদয়মাত্রে রোমান সেনাপতির সংবর্ধনা যাঁকে দেওয়া হল, অন্যজনের নাম বোরদে, যে দুলালকে মনের কোলে সকলে তুলে নিল। বোরদে বিপদের বীর। শত্রু এসে কড়া নাড়বার পরে তিনি যুদ্ধসাজে দ্বার খুলে বেরোন।

বোরদে এবং উমরিগর, উমরিগর এবং বোরদে।

উমরিগর নেমেই অ্যালেনের দ্বিতীয় বলে পা বাড়িয়ে মিড অনের বাউণ্ডারীতে বল পাঠিয়ে দিলেন সুগভীর অবহেলায়। সে বাউণ্ডারীটি অ্যাক্রোমাইসিনের বড়ি, দর্শকের জ্বর নামিয়ে দিল মুহূর্তমধ্যে।

তবু আবহাওয়া বিদ্যুৎস্পৃষ্ট। উমরিগর-বোরদেই শেষ উল্লেখযোগ্য জুটি। একজন আউট হলেই,—মাইকে শোনা গেল, Attention please,····· Car on fire. মরুকগে গাড়ীতে আগুন, মালিক হয়ত ভাবলেন,—এখন ভারতের ঘরে আগুন,—বসে খেলা দেখি! ইন্সিওর করা গাড়ী সম্বন্ধে মালিক যদি তাই না ভাববেন, তাহলে মাইকে তারো পরে পুনঃপুনঃ তাঁকে ডাকাডাকি করতে হবে কেন?

উমরিগর আবার দেখালেন, তিনি কত বড় খেলোয়াড়। বল যদি ঘোরে তাহলে শরীর ঘুরিয়ে ব্যাট নেড়ে চালাতে হয়। চোখ থাকা চাই, বুদ্ধি থাকা চাই, আর থাকা চাই সাহস। সব কিছুই আছে

তাঁর। আজ লক বল করেছেন মারাত্মক। লেংথ ও স্পিনে লক্‌লক্‌ করছে লকের বল। থুতুর বিষ মাখিয়ে যেসব শর তিনি ছেড়েছেন তারা সপ্ততাল ভেদ করতে পারে। অ্যালেনের বলেও ছিল টর্পেডোর ভেদশক্তি। উপরন্তু ইংলণ্ডের ফিল্ডিং—বিশেষত ঐ লকেরই। ক্রীড়ারাজ উমরিগর যেসব বজ্রক্ষেপ করছিলেন, যেন কিছু নয়, এই ভঙ্গিতে সর্টলেগ থেকে সেগুলি ধরছিলেন লক। উমরিগর খেলেছেন এই পরিস্থিতিতে। খেলেছেন দেখে দেখে। বলে এত বেশী স্পিন ছিল, এবং লেংথে সুবিধাজনক হ্রাস-বৃদ্ধি প্রায় ছিল না বলে উমরিগর শরীরের ভারে বা কাঁধের জোরে অনেক সময়েই মারতে পারেননি—মেরেছেন শুধু কব্জির জোরে। সেই তাঁর প্রতিভা।

আর বোরদে। একটা কথা বললেই যথেষ্ট হবে, আধুনিক ভারতীয় ক্রিকেটের সর্বশ্রেষ্ঠ অলরাউণ্ডার চাঁদু বোরদে প্রথম ইনিংসে ৬৮ করার পরে দ্বিতীয় ইনিংসেও ৬১ করেছেন, এবং নির্ভুল সে খেলা। বোরদের প্রথম যৌবনের পিছুটানহীন বোহেমিয়ান খেলা গেছে (যেটা অবশ্য আমাদের বেশী প্রিয় ছিল), এখন বোরদের ইনিংসে নির্মেঘ মধ্যাহ্নের সুনিশ্চিত কিরণ।

উমরিগর-বোরদের জুটি-ব্যাটিংয়ের মধ্যে একটা লক্ষণীয় বিষয়, ছোটো রানের ছুটোছুটি। যখন বোলিং নিখুঁত ও উপদ্রবশীল, ফিল্ডিং নেগেটিভ, তখন বাউণ্ডারীর সীমানায় রান থাকে না, উইকেটের মধ্যে দৌড়ে রান জোগাড় করতে হয়। উমরিগর ও বোরদে তাঁদের সুপটু শরীর নিয়ে উইকেটের মধ্যে যেসব দৌড় দিয়েছেন, তা একজন দর্শকের মতে মঞ্জরেকর-শিক্ষা ('মঞ্জু, শিখে নাও')। ঐ দৌড়ের গতি আর একটু বাড়িয়ে দিলে 'উড়ন্ত শিখ' মিলখা সিংকে নিজের রেকর্ড সম্বন্ধে চিন্তিত হতে হবে। দর্শকেরা ব্যাপারটা পরমানন্দে উপভোগ করেছে। বিশেষত এই সর্টরান নিয়ে লকের সঙ্গে কৌতুকের মারামারিকে। ছদ্ম দৌড়ে লককে এই দুজনে নাচিয়েছেন অবিরত।

ভারতীয় ব্যাটিংয়ের শেষ ফলটি কিন্তু কেড়ে খেয়েছেন রমাকান্ত

দেশাই। দেশাই ঈর্ষাপরায়ণ মানুষ। প্রথম ইনিংসে সহযোগী রঞ্জনের ওভার বাউণ্ডারী তাঁর সহ্য হয় নি। সুতরাং দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁকে ওভার বাউণ্ডারী করতে হয়েছে এবং সেই ওভার বাউণ্ডারীটি দর্শনীয়তায় স্মরণীয়। দেশাই বল আকাশে উড়িয়ে দেননি, খানিক উঁচু করে বোলারের মাথার উপর দিয়ে সোজা চালিয়ে দিয়েছিলেন, এবং সেই ভাবে বলটি রকেটের গতিতে দর্শক-আসনে গিয়ে পড়েছিল। বাস্তবিক বিরলদৃশ্য ব্যাপার!

লাঞ্চের আগে দেশাই ১৮ মিনিটে ২৫ রান করলেন।

ইংলণ্ডের ব্যাটিংয়ে ডেক্সটারের কথা বলেছি। উপযোগী রিচার্ডসনের কথা যেন ভুলে না যাই। রিচার্ডসন প্রথম ইনিংসে করেছিলেন ৬২, দ্বিতীয় ইনিংসে করলেন ৪২। রিচার্ডসনের খেলায় রূপের বাহার নেই, কিন্তু কেজো মানুষের স্বাস্থ্য আছে। তিনি মূলত বল ঠেলে বা সরিয়ে খেলেন। তাঁর সেই পানা-সরানো ডুব থেকে অনেক রান উঠে আসে, এসেছেও।

কিন্তু হতাশ করেছেন ব্যারিংটন। ইডেন তাঁর পর পর টেস্ট-সেঞ্চুরীর রেকর্ড নষ্ট তো করেছেই, তাঁকে সুনামেও নামিয়েছে অনেকখানি। তৃতীয় টেস্ট পর্যন্ত ব্যারিংটন ভারতে পাঁচটি ইনিংস খেলেছিলেন, নট আউট ছিলেন তিন বার। রান আউট হয়েছিলেন একবার। সত্যকারের পরাভবের আউট মাত্র একবার। অ্যাভারেজ ছিল চমক লাগানো ২৫৪.৫। ইডেনের টেস্টের পরে দাঁড়িয়েছে—১৩১.২। ব্যারিংটন দর্শকদের আনন্দ দিয়েছেন ফিল্ডিং করে ও ব্যাটিং না করে। তাঁর ব্যাটিংয়ের আনন্দ এবারের মত পাওনা রইল।

লাঞ্চের পরে স্ত্রী পুরুষ সকল দর্শকের অবস্থা সোহাগী মেয়েব মত —গরবিনী ধনী। সকলেই খুব খুশী আহত কন্ট্রাকটারের জায়গায় উমরিগরকে অধিনায়ক পেয়ে। উমরিগর অধিনায়কত্বে কৃতিত্বও দেখিয়েছেন। তাঁর বোলিং-পরিবর্তন চমৎকার। উমরিগরকে সংবর্ধনার মত দর্শকেরা ডেক্সটারকেও সংবর্ধনা জানিয়েছে তাঁর জন্য বিউগলে একটি

গোটা গৎ বাজিয়ে। দেশাইয়ের ডাকাতে ব্যাটিংয়ের সময়ে বেণী, বায়না-কুলার, শাড়ী এবং শরীরের জনৈকা অধিকারিণী তাঁর এতগুলো সম্পদ সামলাতে অস্থির হয়েছিলেন। ভারতের ইনিংস শেষে দামী আসনের গৃহিণী মহিলাটি আঁচলে মেয়ের মুখ মুছিয়ে, চুল আঁচড়ে দিয়ে বলেছিলেন, বেশী নাচানাচি করো না যেন। তিনিই আবার ব্যারিংটন আউট হলে তাঁর পার্শ্ববর্তিনী মূল্যবান মশারি-পরিহিতা মহিলাটির মতই সটান দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়েছেন। রেডিও-ভবনের জানালায় অবরোধবাসী পুরুষের তৃষ্ণার্ত নয়নে নানা আলোকপাত হয়েছে এবং প্রথম দিকে ভারতীয় ফিল্ডিং যখন আধো তন্দ্রায়, তখন এক তিরিক্ষি বৃদ্ধ কর্কশ গলায় বলেছেন—বাবার রানের জমিদারী আছে—যত পারো ওড়াও।

সুতরাং আগামীকাল।

রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না 'উইন'?

একটু ছন্দপতন হল। হোকগে কাজটা হলেই হল।

ভারত প্রথম ইনিংস—৩৮০

ইংলণ্ড প্রথম ইনিংস—২১২

ভারত—দ্বিতীয় ইনিংস

পাতৌদি ক মিলম্যান ব লক	৩২
ইঞ্জিনীয়ার ক মিলম্যান ব অ্যালেন	৯
উমরিগর ব অ্যালেন	৩৬
ডুরানী কট পারফিট ব লক	০
বোরদে কট ব্যারিংটন ব অ্যালেন	৬১
দেশাই কট পারফিট ব নাইট	২৯
রঞ্জনে কট লক ব নাইট	০
মেহরা নট আউট	৭
অতিরিক্ত	৪
মোট	২৫২

উইকেট পতন: ৪।১১৯ ইঞ্জিনীয়ার; ৫।১১৯ পাতৌদি; ৬।১১৯ ডুরানী; ৭।১৯২ উমরিগর; ৮।২৩৩ দেশাই; ৯।২২৩ রঞ্জনে; ১০।২৫২ বোরদে।

বোলিং (সমগ্র ইনিংসের) স্মিথ: ৩-০-১৫-০; নাইট: ৭-২-১৮-২; লক: ৪৬-১৫-১১১-৪; অ্যালেন: ৪৩·২-১৬-৯৫-৪; বার্বার: ২-০-৯-০।

ইংলণ্ড-দ্বিতীয় ইনিংস

রিচার্ডসন ব উমরিগর	৪২
রাসেল ব রঞ্জনে	৯
ব্যারিংটন কট ডুরানী ব দেশাই	৩
ডেক্সটার নট আউট	৬১
বার্বার কট জয়সীমা ব ডুরানী	৬
পারফিট নট আউট	২
অতিরিক্ত	১
মোট (৪ উইঃ)	১২৫

উইকেট পতন: ১।২০ রাসেল; ২।২৭ ব্যারিংটন; ৩।৯২ রিচার্ডসন; ৪।১০৭ বার্বার।

বোলিং দেশাই: ৭-১-১৪-১; রঞ্জনে ৭-০-২৪-১; বোরদে: ৯-৩-৩০-০; ডুরানী: ১৪-৩-৩৩-১; উমরিগর: ১০-৩-২৩-১।

ইডেনে আজি জয়োৎসবে

আমি একটি মহাসমুদ্রে স্নান করে এসেছি। মানবের মহাসাগর। আমি বলছি না, মহামানবের সাগর।

সত্যই সাগরের উপমাটি বার বার মনে এসেছিল পঞ্চম টেস্টের পঞ্চম দিনের ইডেন উদ্যানে দাঁড়িয়ে। ইডেন থেকে উত্থিত যে গভীর ঘন আলোড়িত ধ্বনির মহিমা নাড়া দিয়েছে আমার সত্তাকে, তা আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল আমার বাল্যস্মৃতির মধ্যে। পুরীতে আমার প্রথম প্রভাত। অজ্ঞাত বিরাটের উচ্চারণ দূর থেকে সেদিন আমাকে মথিত করেছিল, সেই স্মৃতি ফিরে এসেছিল আবার আজ।

কেউ আমাকে যেন ভুল না বোঝেন। ভারতের জয়ে ভারতীয়রূপে আনন্দিত হলেও ক্রিকেটকে জাতীয়তায় দাঁড় করাতে আমার ইচ্ছা নেই। পরাধীন অবস্থায় শীল্ডে মোহনবাগান কর্তৃক ইস্টইয়র্কের পরাজয়ের এক অর্থ, স্বাধীন ভারতে ভারত কর্তৃক ইংলণ্ডকে পরাভূত

করার ভিন্ন অর্থ। এটা এখন খেলার জয়-পরাজয় মাত্র। তবু—গোছালো চিন্তার কথা বাদ দেওয়া যাক—আমি দেখেছি মানুষের আনন্দ—সেই আনন্দের বিশালতা আমাকে আচ্ছন্ন করেছে—বারবার ভীত হয়ে নিজেকে প্রশ্ন করেছি, সমষ্টির এ আনন্দকে প্রকাশ করব কী করে? প্রকাশ করা কি আদৌ সম্ভব? কোথায় আরম্ভ করব, শেষ করব কোথায়?

একটা উত্তর খুঁজে পেয়েছি, আমার সংকোচের অহঙ্কার তাতে লজ্জিত হয়েছে। একটি বৃষ্টিবিন্দু নাকি কেঁদেছিল সমুদ্রে পড়বার আগে। সে হারিয়ে যাবে এবার। সমুদ্র সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল—ভয় নেই, আমার মধ্যে এলে তুমিই সমুদ্র হয়ে যাবে। আমাকে সেই কথাই বলেছিলেন আমার বন্ধু—সুরু করে দাও—আজ যেখান থেকেই উঠে এসো না কেন তোমার গায়ে সমষ্টির বর্ণ লেগে থাকবেই।

সুরু করতে পারি খেলার মাঠে উপস্থিত হওয়ার কাহিনী থেকে। মাঠে হাজির হতে কিছু দেরী হয়েছে। ডেক্সটার আউট হয়ে গেছেন গোড়ার দিকে। পাড়ায় পাড়ায় বেতার-নির্ঘোষ। শীতের সূর্যকে আড়াল করে ছিল যে বড়ো গাছটা তার গোড়ায় কোদাল চালিয়ে দিয়েছেন সেলিম ডুরানী। সেলিম ডুরানী মানকদের কাছে খেলা শিখেছেন; মানকদের মতই বাঁ হাতে বল, এবং মানকদের মতই নিজের বলে চিতাবাঘের ফিল্ডিং। ব্যাটিংয়েরও উন্নতি হচ্ছে। তফাৎ অবশ্য কিছু আছে, ভীনু আধা দক্ষিণ আধা বাম, তাঁর বাঁ হাতে বল, ডান হাতে ব্যাট,—সেক্ষেত্রে ডুরানী সর্বাংশে বাম—বল, ব্যাট, কলম ধরা পর্যন্ত। ভীনু দিতেন বাঁ হাতে অফব্রেক (চায়নাম্যান), ডুরানী দেন লেগব্রেক। সেই ডুরানী ভীনুর উত্তরাধিকার এবং নিজস্বতার অধিকার নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটে অবতরণ করেছেন—তিন প্রভাতেই বলযোগে ডেক্সটারের পাদস্পর্শ করে আম্পায়ারকে বললেন,

এবার যেতে বলুন ওঁকে। আম্পায়ারও তাই বললেন। ডেক্সটার ডুরানীর বলের নমস্কার নিয়ে প্যাভিলিয়নের দিকে হাঁটতে সুরু করলেন।

সেই বার্তা যখন ঘোষিত হল, তখন শাঁখ বেজেছিল গৃহস্থঘরে, আমার পাঠক বিশ্বাস করুন একথা আক্ষরিকভাবে সত্য, এবং পুকুরঘাটে জনৈকা কুলবধূ রাশিকৃত ময়লা কাপড় আছড়ানোর ফাঁকে সেই কথা শুনে, আঁচলে হাত মুছতে মুছতে পরম আহ্লাদে বলেছিলেন—গিয়েছে, বেশ হয়েছে, বড্ড জ্বালাচ্ছিল।

দাদার শয়নঘর থেকে আরম্ভ করে বৌদির রান্নাঘরে ও পুকুরঘাটেও ক্রিকেট ঢুকিয়ে দিয়েছেন যাঁরা—সেই কমল-অজয়—পুষ্পেন—প্রেমাংশুর গলায় তখন সপ্তসুরের বাহার।

অত্যন্ত চড়া তারে বাঁধা দিনটিতে কেউ সুস্থির থাকতে পারল না। অধ্যাপককে ক্লাস থেকে সমাদরে বিদায় দিল ছাত্ররা, বড়বাবুর স্মিত (!) মুখের সামনে দিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে গেল কেরানী, কারখানার মধ্যে ট্রানজিস্টার আনার জন্য কর্মচারীকে মাইনে কাটার ভয় দেখিয়ে নিজের ঘরে ঢুকলেন কড়া মেজাজের মালিক, ঢুকেই লেডি টাইপিস্টকে জিজ্ঞাসা করলেন, লেটেস্ট স্কোর কত, যাবার আগে তিনি নিজেই ট্রানজিস্টারের ছিপি মিস্-এর কানে লাগিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন, এবং সেই একই ট্রানজিস্টার বিপত্তি বাধাল স্কুলে অঙ্কের ক্লাসে; শিক্ষক মহাশয় যখন অ্যালজেব্রা বোঝাচ্ছিলেন, তখন একটি ছেলে পিছনের বেঞ্চ থেকে বিকট চীৎকার করে লাফিয়ে উঠে বলল—আউট! আউট!—ডেক্সটার আউট!

ছেলেটি বইয়ের মধ্যে রেডিও সেটটি লুকিয়ে রেখেছিল। কানে ছিপি লাগিয়ে কানের উপর হাত চাপা দিয়ে মনোযোগের সঙ্গে অঙ্ক বুঝছিল। ডেক্সটারের আউট তাকে ভুলিয়ে দিল স্থান-কাল-পাত্র।

পথে আসতে আসতে আমার ট্যাক্সি-ড্রাইভার বলল, পারফিট সাব্ কি এখনো রুখে আছে? আমি বললুম, তুমি জানলে কি

করে? শিখ সর্দার গোঁফ-দাড়ির মধ্যে লুকোচুরি হাসি দিয়ে বলল, বাবুজি, কবার সকাল থেকে ইডেনে এসেছি জানো?

গতকাল বলেছিলাম, ডেক্সটারকে না মেরে দুর্গপ্রবেশ করা যাবে না। আজ দেখলুম, ষোল আনা সত্য বলিনি। যাদের চারা গাছ মনে হয়েছিল তাদের শিকড়ে কি জোর! প্রথম ইনিংসে 'বোরদের পুতুল' পারফিট দেখিয়ে দিলেন তাঁর পুতুলদেহে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। পুতুলটি এখন বড় জাগ্রত দেবতা। বলের নৈবেদ্যে অরুচি নেই মোটে। 'ন্যাটা কম্পটন' কথাটা পারফিটের সম্বন্ধে শুনে হঠাৎ হাসি এসেছিল। পারফিটের লড়াই দেখে ঠোঁটের হাসি ঠোঁটেই শুকিয়ে গেল। আর নাইট খেলোয়াড়টিই বা কি! ডেক্সটার-ব্যারিংটন-রিচার্ডসন যেখানে পলায়িত, সেখানে নাইটের সফরী-বিক্রম দেখতে হবে?

নাইট দেখালেন তিনি কেবল বিশ পা দৌড়ে লাট্টুর মত লাফিয়ে বল করেন না, ব্যাট ধরে দাঁড়িয়ে থাকার বা মারবার ক্ষমতাও তাঁর আছে। নাইট দেখালেন তিনি খুব সামান্য খেলোয়াড় নন,—এই তরুণ নাইট নাইটের বর্ম ও তরবারি নিয়ে মাঠে নেমেছেন। মনে পড়ল নাইট সম্বন্ধে বিখ্যাত ট্রেভর বেইলীর কয়েকটি কথা—

"এসেকসের দ্রুত বোলার-বাহিনীর নবতম সংগ্রহ হল বেরী নাইট। আমার আনন্দ এই, নাইটকে একেবারে স্কুল থেকে দস্তখত করিয়েছিলাম আমাদের দলের জন্য। অত্যন্ত অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রের মধ্যে এটি হল একটি যখন আমি সুনিশ্চিতভাবে অনুভব করেছিলাম যে, বালকটি প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটার হবে। তার বোলিংয়ের হিসেব পর্যন্ত নেবার দরকার হয়নি, তার ব্যাটিংই প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। তার সেরা দিনগুলি ভবিষ্যতের গর্ভে। সে ইতিমধ্যেই তার কাউন্টির ঐতিহ্যপথে একজন অলরাউণ্ডার।"

বেইলীর কথাগুলো হাড়ে হাড়ে সত্য বলে বোধ করেছে ইডেনের

শেষ দিনের দর্শক। ভবিষ্যতের গর্ভাসীন সেরা দিনগুলির একটিকে অকালে আকর্ষণ করে নাইট আমাদের উপর নিক্ষেপ করেছেন।

সেই পৌনে দু'ঘণ্টার অসহ্য অবস্থা। পারফিট ও নাইট ভারতের শ্বাসনালীতে ঢুকে এমন বিষম খাওয়ালেন যে, দর্শকদের কথা বলবার অবস্থা রইল না। 'মাগো, ভরাডুবি হবে ?'—বুক ফেটে কেঁদে উঠল হঠাৎ-আস্তিক এক ছোকরা। মানতের মানস-পাঁঠায় কালীঘাটের মন্দির প্রাঙ্গণে ঠেলাঠেলি। 'অরে-রে লক্ষ্মণ'—স্টেডিয়ামে যাত্রার মোশন। উমরিগর নিজের অধিনায়কত্ব ও উদ্বেগ দেখাতে লাগলেন ঘন ঘন বোলার পরিবর্তনে। পারফিট আর নাইট ভারতীয়দের জানালেন, তোমাদের বিলম্বিত জয়কে সস্তা হতে দেব কেন ? এ পর্যন্ত ইংরেজদের কেউ বিনা খেসারতে হটাতে পারেনি।

লাঞ্চের ঠিক আগে পারফিট বিদায় নিলেন। তাই যা হোক লাঞ্চের সময়ে ভারতীয় খেলোয়াড়দের মুখে দু'টুকরো রুটি উঠল।

লাঞ্চের পরে সুরু হল ইংরেজদের অসাফল্যের সহিত পশ্চাৎ-অপসরণ। একে একে গেলেন অ্যালেন, লক, মিলম্যান, স্মিথ। শেষ পর্যন্ত নট আউট নাইটও গেলেন—খেলার নিয়ম তাঁকে মাঠে থাকতে দিল না বলে।

ভারত জিতল ১৮৭ রানে।

জয়! সে কী বস্তু!

আমি যদি ইডেনের গ্যালারিকে ভাষায় প্রাণ দিতে পারতুম, তাহলে হয়ত ভবিষ্যতের জন্য জয় কি বস্তু তা অক্ষয় হয়ে থাকত। ইংলণ্ডের ইনিংস যখন শেষ হয়ে আসছে—তখনকার মাঠের অবস্থা এক কথায়—বাসনা-ভীষণ। এক একটি আউটের সম্ভাবনা সৃষ্টি হচ্ছে অথচ সফল হচ্ছে না—অমনি একটি বিচিত্র বিশাল শূন্য নিঃশ্বাস হা হা ক'রে উঠছে চারিদিকে। কে যেন চল্লিশ হাজার হৃৎপিণ্ডকে রবারের বলের মত মুঠিতে পিষে আবার ছেড়ে দিচ্ছে। সমস্ত ইডেন

গার্ডেন একটা বিরাট পশুর আকার ধারণ ক'রে কারাগারের ভিতরে প্রচণ্ড ক্ষুধায় লেজ আছড়াচ্ছে আর গর্জন করছে। কিংবা মনে হল, হাজার হাজার লোককে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে অদৃশ্য শৃঙ্খলে। তারা লাফিয়ে পড়তে চাইছে অথচ পারছে না। ভারতীয় স্বভাবেও জিগীষা আছে প্রমাণিত হল ঘনশব্দে বারংবার।

তারপর জয়। থর থর করে কাঁপছিলেন আমার পাশের মানুষটি। আমার হাত চেপে বললেন—আমি কী করব—কী যে মনে হচ্ছে।

বাজি ফুটছে, কাগজ উড়ছে, বিউগল বাজছে। শাঁখের শব্দ, চীৎকার, দৌড়াদৌড়ি, নৃত্যগীত, খেলোয়াড়দের দ্রুত প্রস্থান, ফটোগ্রাফারদের হুটোপুটি, জনতা সামলাতে পুলিস হিমসিম, পুষ্পবর্ষণ, লেবু বর্ষণ, খোলা বর্ষণ, নৃত্য আর নৃত্য আর নৃত্য, ছেলে নাচল, মেয়ে নাচল, খোকা নাচল, খুকি নাচল—সব চেয়ে নাচলেন এক বুড়ো দিদি হাতের পুতুল উঁচু করে? গ্যালারির বাঁশ বেয়ে উঠে কয়েক জন এই ঐতিহাসিক কনসার্ট পরিচালনা করতে লাগল; 'চলো ইডেন' ধ্বনি তুলে যারা দিনের পর দিন, রাতের পর রাত অসহ্য কষ্ট সহ্য করেছে, তারা আজ এই মহা মুহূর্তে ইডেনের লাল কেল্লার উপরে ত্রিবর্ণ পতাকাকে দেখে আত্মসংবরণ করতে পারল না।

জনতার মধ্যে ঘুরে এসে আবার উঠে দাঁড়িয়েছিলুম উঁচু প্রেস-বক্সের উপরে। দেখছিলুম অনেক কিছু, দেখতে দেখতে সব দেখা একাকার হয়ে যাচ্ছিল। কিছু আগে দেখেছি, খেলাশেষে জনতাকে ঘিরে আটকে রাখল পুলিসবাহিনী, সেই পুলিসের বাঁধে ধাক্কা খেয়ে উচ্ছ্বসিত হতে লাগল মহাকল্লোলে জনরাশি—খেলোয়াড়দের ঘিরে ফেলেছে কর্মকর্তা ও ফটোগ্রাফারে—মাঠের মাঝখানটা প্রায় শূন্য—আম্পায়াররা তখন এধার ওধার দেখে পরিত্যক্ত স্টাম্পগুলি উপড়ে হাতে তুলে নিলেন; বিচিত্র লাগল। আম্পায়ারের ছবি তুলতে কারো উৎসাহ নেই। এতক্ষণ তাঁদের বিচারের কাছে বারবার আবেদন করা হয়েছে। তখন দর্শকের চোখের উপরে তাঁরা দাঁড়িয়ে ছিলেন।

দর্শকের আবেদনে সাড়া দিলেও তাঁরা বেশী প্রশংসা পাননি, এবং যখন দেননি, তখন তাঁদের সাদা টুপির তলায় বেবাক ফাঁক—এই কথাই দর্শকেরা বলেছে রাগে—সেই প্রয়োজনীয় অথচ সমাদরহীন দুই ব্যক্তি তাঁদের মতই আঘাতের লক্ষ্য উইকেটগুলি সংগ্রহ করে ফিরতে সুরু করলেন, গৃহকর্তারা যেমন উৎসবশেষে ছেলেদের ছড়ানো খেলনা কুড়িয়ে গুছিয়ে তুলে রাখেন ভবিষ্যতের জন্য।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি আম্পায়ারদের হৃদয়ের কথা ভাবছিলুম, তাঁদেরও একটা হৃদয় আছে যাকে মুঠিতে চেপে গান্ধারীর মত 'যতো ধর্মস্ততো জয়' ঘোষণা করতে হয়; ভাবছিলুম, খেলোয়াড়দের মনোভাবের কথা—এই গণমনের নদীতে পড়া তৃণখণ্ডের মত খেলোয়াড়গুলির মনের অবস্থা—এমন সময় আনন্দের প্রলয়রোল। নায়ক এসেছে—উমরিগর এসেছে! মাঠের চারপাশে গোল হয়ে ঘিরে আছে জয়মুষ্টি দর্শকেরা—তারা খেলার নায়ককে দেখতে চেয়েছে—উমরিগর তাই এসেছেন। উমরিগর মাঠের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত হাত তুলে বিজয়ের পতাকা বিলি করে গেলেন—এক একটি হাতের ভঙ্গিতে জনতা দুলেছে, আনন্দ দুলেছে,—দোলেরে আনন্দ দোলে!

আমি আবার দেখলুম বিজয়ী রোমান সেনাপতিকে—অদৃশ্য রথটি পর্যন্ত আমার ভাবাচ্ছন্ন দৃষ্টির সামনে চিত্রবৎ ফুটে উঠল।

আরো কয়েকটি ছোটো ছোটো দৃশ্য, ঐ জনতারই হাজারের কাছে দাবি—উমরিগরকে অধিনায়ক চাই। কিংবা যে-পুলিস জনতা আটকেছে, তাদেরই খেলা দেখায় উঁকিঝুঁকি লোভ, খেলা দেখার জন্য ঘোড়ার পিঠে ঘোড়সওয়ারের উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে ওঠা, কিংবা ভারতের চারজন অধিনায়ক সি-কে—ভিজি—হাজারে—মানকদের আনন্দ-প্রফুল্ল মুখ। কিংবা খেলার পরে চায়ের আসরে চেয়ারে গা এলিয়ে ক্লান্তভাবে বসে থাকা বিমর্ষ ডেক্সটার অথবা একপাশে নিঃসঙ্গ করুণ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যারিংটন।

আবার প্রেসবক্সে উঠলুম। একটু আগে সেখান থেকে তলায় দেখেছি মানুষ মানুষ মানুষ—এখন সে মানুষ ছড়িয়ে পড়েছে মাঠের বাইরে চারপাশে—পদধূলির মেঘে আচ্ছন্ন মধ্যাহ্ন সেখানে। পাঁচদিনের ঠাসাঠাসি প্রেসবক্স ভাল করে দেখবার চেষ্টা করলুম ফিরে। এখান থেকেই বার্তা ও ব্যাখ্যা বিতরিত হয়। এখান থেকেই লেখা হয়, ভারত পাঁচদিনের টেস্টের উপযুক্ত নয়, তাদের জন্য বিলেতের যে-কোনো কাউন্টি দলই যথেষ্ট। আবার এখান থেকেই লেখা হবে, ভারত "ইংলণ্ডের সর্বাপেক্ষা সম্ভাবনাপূর্ণ ক্রিকেটদলকে" পরাভূত করেছে দারুণভাবে। এখন প্রেসবক্সও প্রায় খালি। দীর্ঘচক্ষু বীভৎসদর্শন ক্যামেরাগুলো গুটিয়ে ফেলা হয়েছে। উৎফুল্ল ভারতীয় সাংবাদিকরা নেমে গেছেন। পকেটে হাত দিয়ে বিখ্যাত এক ইংরেজ সাংবাদিক এধার ওধার পায়চারি করছেন এবং তাঁর আর দু'জন স্বদেশবাসী টাইপ রাইটারের উপর দ্রুত আঙুল বুলিয়ে যাচ্ছেন। শুধু টাইপ রাইটারের শব্দ খট্ খট্ খট্—তা বলছে, ইংলণ্ড হেরেছে হেরেছে হেরেছে—লজ্জা লজ্জা লজ্জা।

ইংলণ্ডের পরাজয়ের কথা এখনি পাঠাতে হবে লিখে, তার জন্য বিষণ্ণতা বুকে চেপে কর্মব্যস্ত ইংরেজ সাংবাদিক।

খেলা যখন অনেকক্ষণ শেষ হয়েছে, তখন ধীর পায়ে আমি একটি মানুষের সন্ধানে বের হলাম। প্যাভিলিয়নের এক প্রান্তে তার সাক্ষাৎ পেলাম। তার নাম বংশী। ইডেনের এবারের পিচ তারই তৈরী। বোলার ও ব্যাটসম্যানকে সমান সুযোগ দিয়েও পাঁচদিনের শেষে চরিত্র বজায় রেখেছে যে পিচ—সেই বস্তুর স্রষ্টার হাত আমি চেপে ধরলুম আবেগে। কালো শক্ত চেহারার বংশী, বাবুর আবেগে হাসল, আন্তরিক খুসী তার হাসিতে ফুটে উঠল। সে নমস্কার করল তার দুই গুরুকে—ক্লেটন সাহেব ও ফাগুরাম মালীকে।

সেখান থেকেও চলে এসেছি। আমাকে আচ্ছন্ন করেছে সন্ধ্যার

অন্ধকার। হাওয়ায় দোলা ইডেনের প্রাচীন একটি বৃক্ষের ডালের উপর রূপকথার কাহিনী সুরু করে দিয়েছে ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমী।

আমি রোমাঞ্চিত হয়ে যেন শুনলুম—ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমী ১৯৬২ সালের ৪ঠা জানুয়ারীতে সমাপ্ত একটি টেস্ট ম্যাচের কথা বলছে। ইডেনে ভারতের প্রথম টেস্ট জয়।

ইডেনের পুরাণ-কথায় ইতিমধ্যেই তোলা হয়ে গেছে এই খেলার কাহিনী।

ভারত প্রথম ইনিংস ৩০৮

ইংলণ্ড প্রথম ইনিংস ২১২

ভারত দ্বিতীয় ইনিংস ২৫২

ইংলণ্ড দ্বিতীয় ইনিংস

ডেক্সটার এল বি ব ডুরানী	৬২
পারফিট এল বি ব উমরিগর	৪৬
নাইট নট আউট	৩৯
অ্যালেন কট মঞ্জরেকর ব দেশাই	৭
মিলম্যান ব রঞ্জনে	৪
লক রান-আউট	১
স্মিথ কট মঞ্জরেকর ব ডুরানী	২
অতিরিক্ত	১২
	মোট ২৩৩

উইকেট পতন : ৫।১২৯ ডেক্সটার ; ৬।১৯৫ পারফিট ; ৭।২০৮ অ্যালেন ; ৮।১১৭ মিলম্যান ; ৯।২২৪ লক ; ১০'২৩৩ স্মিথ।

বোলিং (সমগ্র ইনিংসের) : দেশাই : ১৭-৪-৩২-২ : রঞ্জনে ১৪-৩-৩১-২ ; বোরদে : ২২-১০- ৪৬-০ ; ডুরানী : ৩৩'২-১২-৬৬-৩ ; উমরিগর : ৩০-১০-৪৬-২।

আনন্দ আনন্দ আনন্দ রে !

"টেলিগ্রাম! টেলিগ্রাম! পড়ুন বাবু পড়ুন, উমরিগর 'ভারত-রত্ন' পেয়েছেন।" এস্‌প্ল্যানেড ট্রাম-গুমটির সামনে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার মুখে চেঁচাচ্ছিল।

ছেলেটি কিন্তু হকার নয়, হতে পারে না, তার কাঁধে ঝোলানো ন্যাকড়ার ব্যাগ ও কপালে পিচবোর্ডের হুড দেখিয়ে দিচ্ছিল—সে ইডেনে 'ভারতের টেস্ট-জয়ে পাগল হয়ে যাওয়া হাজার হাজার দর্শকের একজন।

তার নকল চেঁচানিটুকু—সে চমৎকারভাবে হকারের নকল করতে পেরেছিল—অনেকের মুখেই চকিত হাসি ফোটল, তার মনের সঙ্গে সাধারণের মন এক তারেই বাঁধা ছিল।

দুপুরে এক বৃদ্ধ অনেকগুলি বাচ্ছার দ্বারা পরিবৃত অবস্থায় পার্কে বসেছিলেন, তাঁর ছড়ানো পায়ের পাশে ট্রানজিস্টার। সন্ধ্যায় দেখা গেল. তিনি বাচ্ছাদের মধ্যে মেঠাই বিলোচ্ছেন, কারণ তিনি বাজি হেরেছেন। তিনি বলেছিলেন, ইংলণ্ড হারবে না।

এত মিষ্টান্ন বিতরণের কারণ কি ?—মিঠাই বিলোব না ? আমি যে সেই দিনটিকে আবার ফিরে পেয়েছি যেদিন ১৯১১ সালে মোহন-বাগান প্রথম শিল্ড পেয়েছিল।

উপরের বিবরণটি ইংরেজী সংবাদপত্র থেকে সংগ্রহ করা। সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা সংবাদপত্র 'ভি-ডে'র কথা লিখতে গিয়ে আনন্দে কৌতুকে আরও উচ্ছ্বসিত। বর্ণনাকারী লেখক সেদিন বেলা দশটায় কলকাতার ট্রামে অভূতপূর্ব কাণ্ড প্রত্যক্ষ করলেন। লেডিজ সিটে উপযুক্ত লেডিজ ছিলেন অথচ তাঁর চারপাশ ঘিরে ভদ্রসন্তানদের চৌকি ছিল না। ট্রাম কি শূন্য ? ভদ্রসন্তানেরা কি ট্রাম বয়কট করেছেন? কদাপি না। তাঁরা ধরা দিয়েছিলেন এক জরাতুর বৃদ্ধের আকর্ষণে, যাঁর কোলে তারস্বরে চীৎকারকারী একটি বাচ্ছা রেডিও।

"সুতরাং কোনোদিন কোনো পেছনের যাত্রীর আবেদনে যা হয়নি, কোনোদিন কোনো কণ্ডাক্টারের সাধনায় যা হতে দেখা যায়নি, কলকাতার ট্রামে গতকাল বেলা দশটায় তাই হয়েছিল : দর্শনীয়া

সহযাত্রিনীকে তুচ্ছ করে একগাড়ি মানুষ একজন বুড়োকে ঘিরে মন্ত্রমুগ্ধের মত ঠায় দাঁড়িয়েছিল।"

উক্ত লেখক দেখলেন, বিদেশী ক্রিকেট কিভাবে ভারতীয় জাতীয়তাকে ঠেলে তুঙ্গে তুলল। শুধু কি ন্যাশনালিজম্, ক্রিকেট কিছু সময়ের জন্য ভারতে কমিউনিজম্ পর্যন্ত এনে দিল।—"এমন হাওয়া আপিসপাড়ায় কদাচিৎ আসে। সেখানে রাশিয়ারও অভাবিত সমাজ। বেয়ারা থেকে বড়া সাহেব সব এক জাত—ভারতীয়।"

লেখকদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এড়ায় না কিছু। একটি রেডিওর স্বর্গপ্রাপ্তির ক্ষণটিও তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন—

"শুধু এইটুকু জেনে রাখুন, বাঁধা কপির ঘণ্টটাকে সজ্ঞানে পুড়তে দিয়ে, এ সি তথা মৃত্যু-কারেন্টের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে একটি বঙ্গ-ললনা কাল আমার চোখের সামনে এম সি সি-র শেষ দুর্গরক্ষকের পতনসংবাদ গ্রহণ করেছিলেন—রেডিওটাকে সোজা এক ঝটকায় টেবিল থেকে তুলে নিয়ে বুকে চেপে ধরে।"

এ সকল কৌতুক আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল এক মহান আবেশে। লেখকের ভাবাবিষ্ট চোখের সামনে ভারতের জয়ে লেকের জলে শালুক পাপড়ি মেলে ফুটেছে, পঞ্চম জর্জের মূর্তির উপর থেকে পাখী উড়ে গেছে মহাকরণের ত্রিবর্ণ পতাকার দিকে, পায়ে পায়ে রাঙা ধূলির মেঘ উড়িয়ে মাঠ থেকে বেরিয়ে এসেছে বিজয়ী ভারত, বিপুল জনতরঙ্গের সামনে সন্ত্রস্ত ক্যানিং পাথুরে ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরেছেন এবং ময়দানের অনেক উচ্চ কীর্তিস্তম্ভের চেয়ে উচ্চতর মনে হয়েছে একটি মাথা, জনতার মাথা,—

"তাদের সকলের মাথা ছাপিয়ে কাল একমাত্র চোখে পড়ছিল—গড়ে সাড়ে পাঁচ ফুট উঁচু সেই জনতার মাথাটি, সগৌরবে যেটি মাঠ থেকে বাড়ীর পথে হাঁটছিল।"

ইডেনে টেস্টজয়ের পরে লেখায় রেখায় ভরে গেল সাময়িকপত্র।

কার্টুন এবং রসরচনার শেষ রইল না। বাংলায় ক্রিকেট-সাহিত্যের শূন্যের মহাকাশে রচনা-রকেট দৌড়াদৌড়ি করে সাময়িক পত্রের বুক আলো করে রইল কিছুদিন। অন্যদিকে আবার কার্টুনের ছড়াছড়ি। সিংহ বৃটিশ-প্রতীক হওয়ার কার্টুনিস্টদের বড়ই সুবিধা ঘটল। বৃটিশ সিংহ এতদিন মজাসে অপরের ঘাড়ের উপর সিংহাসন করেছে, এবার ধরা পড়ে ঢুকে পড়ল কার্টুনের চিড়িয়াখানায়। সিংহকে পায়ে দড়ি বেঁধে কাঁধে ঝুলিয়ে কার্টুনিস্ট কে সরকারের তুই হাতী দারুণ দৌড় দিয়ে নিজেদের গজগমন কথাটা একেবারে মিথ্যে করে দিলে। রেবতী-ভূষণের ব্যাটহস্ত জনৈক মহাহস্তী প্রসন্নভাবে নিঝুম সিংহের মাথায় শুঁড়ের হাত বুলোল সান্ত্বনাচ্ছলে ; অন্য চিত্রে দেখা গেল সিংহ সান্ত্বনা পায়নি, অপমানে বেদনায় বিমর্ষভাবে প্রস্থানপর। কুট্টি দেখালেন সার্কাসের খেল—বুড়ো সিংহের দন্তহীন মুখের মধ্যে মাথা পুরে সহাস্যে দাঁড়িয়ে আছে ব্যাটের যাতুদণ্ডহাতে ভারতীয় ওস্তাদ।

বৃটিশ সিংহের ঐ বিমর্ষ প্রস্থানটা নিছক ছবির ব্যাপার নয় বলেই জানালেন শ্রীযুক্ত বেরী সর্বাধিকারী : "দমদম বিমানঘাঁটি যাত্রার পথে এম সি সি দলের মুখে তেমন হাসি নেই, এমনকি সদাহাস্যময় ব্যারিং-টনের মুখেও নয়। শুধু বিষণ্ণ নয়, একটা থমথমে ভাব—যেন শোকার্ত। স্বাভাবিক। টেস্টে পরাজয়ের ব্যথা সহজে কমে না, তাও ভারতের কাছে।"

বিলেতী সংবাদপত্র থেকে ঝুড়ি ঝুড়ি অভিনন্দন আসতে লাগল, বলা চলে ঝুড়ি ঝুড়ি ছদ্মবেশী আক্ষেপ। কিন্তু যথার্থ ভদ্র ও ন্যায়-সঙ্গত কথা বললেন এম সি সি সভাপতি স্যার উইলিয়ম উরসলে। তাঁর মুখ থেকে প্রয়োজনীয় স্বীকারোক্তি শোনা গেল। সভাপতিরূপে স্যার উইলিয়ম দল পাঠিয়েছেন, সে দলের গুণাগুণের দায়িত্ব নেবার মত মর্যাদাবোধ তাঁর ছিল। তিনি দৃঢ়ভাবে জানালেন, এ দল মোটেই ইংলণ্ডের তু'নম্বর দল নয়, এইটাই এ বছরের এক নম্বর।

মহাখুশী হলেন 'ভারতরত্নেরা', খুশী হলেন নেহরু, খুশী হলেন

রাধাকৃষ্ণন,—আরও বহু ক্রিকেটপ্রিয় রাজনীতিক। প্রাক্তন ক্রিকেটাররা আনন্দে বিগলিত। বাম্পার ও সাংবাদিক উভয়ের সম্বন্ধে সমভাবে সন্ত্রস্ত হিমু অধিকারী মুখ খুলতে না চাইলেও অমরনাথ ভাষণে নিঃসঙ্কোচ। অমরনাথের আনন্দের যথার্থ হেতু ছিল। ৬ মাস আগে ইংরেজদলের প্রতি তাঁর চ্যালেঞ্জের উল্লেখ আগেই করেছি। আর সি কে নাইডু।

মহান সি কে নাইডু ইডেন গার্ডেনে একলা দাঁড়িয়ে মাটির ভাঁড়ে চা খেয়েছেন, সম্বর্ধনা সভায় আমন্ত্রণ জোটেনি। ভারতীয় ক্রিকেটের পিতা সে লজ্জা ও অপমান একেবারে ভুলে গেলেন যখন দেখলেন—তাঁর উত্তরাধিকারীরা জিতল, সত্যই জিতল। সি কে নাইডুর আত্মস্থ গম্ভীর কণ্ঠও ভিতরের আবেগকে সংযত রাখতে পারেনি। তরুণ ভারতীয় ক্রিকেট তার চরম অভিনন্দন ও আশীর্বাদকে পেল পিতৃকণ্ঠে : 'আমি কোনো টেস্ট খেলায় জিততে পারিনি। তোমরা পেরেছ। তোমরা ধন্য।'

ফিরে যাওয়া যাক সাহিত্যের মধ্যে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ক্রিকেট-মঙ্গল লিখতে কলম তুলে নিলেন। সাহিত্য এবং ক্রিকেট উভয়ই যাঁদের প্রিয়, এ তাঁদের পক্ষে একটা সংবাদ। আমার পূর্ব গ্রন্থ 'রমণীয় ক্রিকেটে' অচিন্ত্যকুমারের একটি পুরাতন রচনা উদ্ধৃত করে বলেছি, লেখাটি বাংলা ক্রিকেট-সাহিত্যের প্রথম পরিচ্ছেদের এক উল্লেখযোগ্য পৃষ্ঠা। সেদিনকার অচিন্ত্যকুমার উৎফুল্ল আবিষ্ট তরুণ, রোমান্টিক। কালগতে অচিন্ত্যকুমার মিস্টিক হয়েছেন। তিনি বুঝেছেন, জীবনের পরম অর্থ পরমার্থে। তবু তিনি ক্রিকেটকে ত্যাগ করতে পারেন নি, কারণ তাঁর মতে ক্রিকেটের মধ্যে আছে 'এক অধ্যাত্ম আনন্দের আস্বাদ।'

অচিন্ত্যকুমারের 'একেই বলে ক্রিকেট' লেখাটি অন্তত একটি কারণে উল্লেখযোগ্য হয়ে থাকবে—ক্রিকেটের ভাষায় ধর্মীয় শব্দের ব্যবহারে। তাই বলে কি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ গুঁড়ো হাসির ঝিকিমিকি

শব্দগুলি কম মনোহারী?—মাটি-কামড়ানো মঞ্জরেকরকে দর্শকের আবেদন: "এখন এটা হুমড়িগড় মানে হুমড়ি খেয়ে গড় হয়ে পড়বার সময় নয়, উমরিগড় হবার সময়"। একই মঞ্জরেকরকে নিয়ে নাতি-ঠাকুর্দার ভাষাচর্চা: "ছোট নাতি ঠাকুর্দাকে বললে—দাহু ও 'স্খলিত' হয়ে গিয়েছে।—'স্খলিত' কি রে? ঠাকুরদাদা শাসনের সুর আনল: 'স্খলিত' আবার হয় নাকি?—খুব হয়। পীড়িত হয়, আহত হয়, স্খলিত হতে পারবে না কেন? বিজ্ঞের মত মুখ করল নাতি: দেখছ না, সিঙ্গলস্ পর্যন্ত নিচ্ছে না।" বেচারা মঞ্জরেকর লকের বলে খোঁচা মারতে চেয়েছিলেন, ব্যাটে-বলে না হওয়ায় বেঁচে গেলেন যখন, তখন কেঁচে না যাওয়ার জন্য সকলের কত দুঃখ। তারপর যখন সত্যই কেঁচে গেলেন, তখন দর্শকের হর্ষবর্ষণ দেখে মনে হল, তাদের 'ফোড়া ফাটার উপশম।'

আরও নানা শ্রবণরোচন শব্দের সমাহার: "পারফিটের টাটকা ক্যাচটা"; "খুকখুকে কাশি হয়েছে ব্যাটের;" "ডুরানী হৃদয়-জুড়ানী"; "এঞ্জিনীয়ার এঞ্জিন ওলটালে"; "ব্যাটসম্যান 'শম্বুক' গতি অবলম্বন করলেই এদিকে ওদিকে পাঠাতে হয় 'গুগলি'।"

ইংরেজী ক্রিকেটকে বাংলার ঘরে তুলতে অচিন্ত্যকুমারের বাণী-বন্দনা অবশ্য যথার্থ দেবীপ্রসাদ পেয়েছে অধ্যাত্ম পরিভাষার ব্যবহারে। নমুনা দেবার লোভ সামলানো কঠিন। প্রথমেই ধরা যাক মঞ্জরেকরের প্রণত ব্যাটিংয়ের দীনতার বিরুদ্ধে শক্তিবাদ; অচিন্ত্যকুমার তাঁর পরম গুরুবন্দনা করে নিয়েছেন একই সঙ্গে, সুকৌশলে—

"কিন্তু এ কী দরিদ্র দশা! কোথায় মারো কাটো লোটো, হর-হর ব্যোম-ব্যোম শুনব, তা নয়, ঠুক ঠুক ঠুক।...এ যে গোঁসাইটি হয়ে আছে। আমাদের গোঁসাইয়ের চেয়ে কসাই ভালো। মুরলীধরের চেয়ে গদাধরকে বেশী পছন্দ।"

একই কথা অন্যত্র—

"কোথায় মারে মারে মাঠ সরগরম করে তুলবে, তা নয়, ধুক্ পুক্

ধুক্ পুক্,—ঠুক ঠুক ঠুকুং। যেন শেষশয্যায় শুয়ে মালা ফেরাচ্ছে বৈরাগী।"

"সে কি জানে না, মার ছাড়া ব্যাট ভক্তিছাড়া ভজনের মতই আলুনি? সে কি জানে না, যার ব্যাটে 'চার' মার আছে, সেই আসলে 'চার্মার'? কোথায় তার সেই ইন্দ্রজাল? সে কি ঠুঁটো? সে কি ধরো-লক্ষ্মণ?"

চঞ্চল রূপ ছাড়াও ক্রিকেটের একটা গভীর রূপ আছে, যেখানে সে সাধনায় ধারনায় সুগম্ভীর।—

"ক্রিকেটের অর্থ যে নির্বিচলের তপস্যা। ধ্যান ভেঙে মুনিরা তপস্যার ফল দিয়ে দিতে পারে কিন্তু তুমি ক্রিকেটার কোনো কটাক্ষ-পাতেই চঞ্চল হতে পারো না। তুমি শান্ত স্থির সুগম্ভীর। সহিষ্ণুতার শালীনতার প্রতিমূর্তি।"

"কিন্তু উপায় কি, তুমি ক্রিকেটার, তুমি এক মহৎ সাধনে উদ্যত, সমস্ত দৌরাত্ম্য তোমাকে সয়ে যেতে হবে। 'যে সয় সে রয়, যে না সয় সে নাশ হয়'।"

"এল ডেক্সটার। নিবাত দীপশিখার মত নিষ্কম্প। সমস্ত মাঠ আলো করে দাঁড়াল। কার সাধ্য তাকে হটায়, নড়ায়, প্রলুব্ধ করে। বীতরাগ ভয়ক্রোধ· নিয়তব্রত পুরুষ। দেখে কার না আনন্দ হয়েছে! তার সতেজ ব্যক্তিত্বকে কে না প্রশংসা করবে, তার সহজ যোগস্থিতিকে?"

পাঠক হয়ত ভয় পেয়ে যাচ্ছেন। ক্রিকেটকে বড়জোর রসতত্ত্ব পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া যায়, তাই বলে রাসতত্ত্ব? না, অতটা আশঙ্কার কারণ নেই, মিস্টিক অচিন্ত্যকুমারের মিস্টিসিজম্ ও রোমান্টিসিজমে অচিন্ত্যভেদাভেদ। 'একেই বলে ক্রিকেট' শেষ হয়েছে সুলতার কাহিনী দিয়ে। সেই তরুণী কুমারী সুকুমারী সুলতা—চোখে কালো চশমা, কাঁধে ঝোলানো বায়নাকুলার—তার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল

লেখকের সিট বদলাবদলির সময়ে। ‘ওমা তুমি এখানে! তুমি কি করতে এসেছ, দেখতে?’ লেখকের এই হর্ষবিস্ময়ের উত্তরে সুলতা তির্যক বলেছিল—‘না, দেখাতে।’ সুলতাকে সত্যই দেখাতে আনা হয়েছিল। ‘জু, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল পুরনো হয়ে গিয়েছে, আধুনিক পাত্র খেলার মাঠে নবীন পরিবেশে দেখতে চায় পাত্রীকে। সেই খাতিরে তাকে একখানা বিয়াল্লিশ টাকার টিকিট জোগাড় করে দিতে হয়েছে। খেলা দেখতে দেখতে সে দেখে নেবে খেলাঘর।’

নেগোসিয়েসন ম্যারেজের এই সুবিধা। সাড়ির সঙ্গে এগিয়ে আসে গাড়ি, চিরজীবনের দ্বারী পেয়ে যায় পাহারা দেবার সাজানো বাড়ী। এখানে যে-হাত ধরবে টিকি, সেই হাতেই ধরা আছে টিকিট। এতো আর শচীন করের চালচুলোহীন লব্-করা পাত্তর নয় যে, বৌকে ভাত-কাপড়-টিকিট জোগাতে পারবে না?

কিন্তু কে জানতো পরিণতি দু’পক্ষেই সমান?

“সুলতাকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘পাত্র এল দেখতে?’

“মামা জয়দীপ বললেন ‘কই, ছোকরাকে দেখতে পেলাম না। বোধ হয় আসেইনি মাঠে। টিকিট ব্ল্যাকমার্কেট করেছে।’

“সুলতা হাসল। বললে, ‘ব্যাটে বলে হয়নি, বেঁচে গেছি এ যাত্রা।’ ”

আমরাও বেঁচেছি। অমন ছেলের কাছে সুলতা আউট হোক আমরা কেউ চাই না।

ইডেনে হারবার পরে স্থিরবুদ্ধি সমালোচক অ্যালেক্স ব্যানিস্টার লিখলেন—“ভারতের জয়লাভ আমি দিব্য চক্ষুতে দেখতে পাচ্ছি। ইংলণ্ডের খেলার মান ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছে। আর ভারতের খেলায় দৃঢ়তা ও মনোবল বাড়ছে।”

অধিনায়ক টেড ডেক্সটার বললেন—“ভারতীয় দল যেরূপ শক্তিশালী তাতে তাদের দুবার আউট করা কঠিন।”

কলকাতা টেস্টের পরে ব্যানিস্টার ও ডেক্সটার কি দিব্যদৃষ্টি পেয়েছিলেন? নচেৎ ক্রিকেটের মত অনিশ্চিত খেলা সম্বন্ধে নিশ্চিত ভবিষ্যৎবাণী কি করে করতে পারলেন তাঁরা? ব্যানিস্টারের কথামত মাদ্রাজে ভারত জিতল, ডেক্সটারের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী ইংলণ্ড ভারতকে দুবার আউট করতে পারল না।

মাদ্রাজের শান্ত সমুদ্রও সেদিন উত্তাল হয়েছিল, আগুন ধরেছিল মাদ্রাজীদের নিরামিষ রক্তেও। আগুন ধরবে না? ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম রাবারলাভ! ইতিহাসটা সংক্ষেপত এই।---

১৯৬২ সালের ১০ই জানুয়ারী শুভ প্রভাতে কণ্ট্রাকটারের কাজ কণ্ট্রাকটার করলেন—টসে জিতলেন। সাহেবরা ফিসফিস করে বলল —গড্! ইণ্ডিয়ান ইয়োগীকে ক্যাপ্টেন করেছে না কি? যে মাটিতে স্পিন ধরবে সেখানে টসে জয় অর্ধেক জয়। কণ্ট্রাকটার শুধু টসে জিতলেন না, এই প্রথম আরও কিছু কাজ করলেন, কিছু রান করলেন—৮২।

আসল নবাবিয়ানা অবশ্য জাত নবাবের আচরণে দেখা গেল! পাতৌদির তরুণ নবাব সেঞ্চুরী করলেন, যে সেঞ্চুরীতে সৌভাগ্য ও সামর্থ্যের মনোরম সীবন। তাঁর নরম কব্জিতে বাঁধা ছিল ইন্দ্রজাল, তাঁর উচ্ছল আঘাতে ছিল তরুণের বিদ্রোহ। জলতরঙ্গের সুরে রানতরঙ্গ বেজেছিল তাঁর ব্যাটে। সৃষ্টির হাসিতে, আনন্দের বাঁশীতে মেশানো এই খেলাটি ভারতীয় ইনিংসকে গতির রথে তুলে দিয়েছিল। প্রথম দিনে হয়েছিল ৭ উইকেটে ২৯৬, ঘণ্টায় গড়ে ৫৫ রান।

প্রথম দিনের ক্রিকেট শেষ হবার পরে শোনা গেল, কণ্ট্রাকটার আবার অধিনায়কত্ব অধিকার করেছেন আগামী ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জন্য। সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচন, অনিবার্য নির্বাচনও বটে, কারণ অধিনায়ক কণ্ট্রাকটার পূর্বে কোনো টেস্টে হারেন নি, এখন রাবার লাভের মুখে দাঁড়িয়ে আছেন, তরুণ ভারতীয় দলের প্রীতি ও শ্রদ্ধা যথেষ্ট আছে তাঁর প্রতি। সেই বোধহয় যথেষ্ট। কিন্তু ক্রিকেট-সামর্থ্য? সেকথা পরে।

দ্বিতীয় দিনে ভারতের লেজ ফুলে উঠল রানের গর্বে। ৭ উইকেটের ২৯৬ বাকি উইকেটের সাহায্যে এগিয়ে গেল ৪২৮ পর্যন্ত। ইংলণ্ড সুরু করে ১০৮ রানে খোয়ালো চার উইকেট। খেলার সুচনা থেকেই ভারত উদ্দীপিত উৎসাহিত উগ্র। ইংলণ্ড তাল রাখতে পারছে না আপ্রাণ করেও। সে থামাতে পারেনি অষ্টম উইকেটে ভারতের রেকর্ড রানকে। ফারুক ইঞ্জিনীয়ার এবং বাপু নাদকার্নি ১০১ রান করে অষ্টম উইকেটে ভারতের পক্ষে নতুন রেকর্ড করলেন। আগের রেকর্ড ছিল রামচাঁদ-তামানের ভাওয়ালপুরে, ৮২ রানের।

ইঞ্জিনীয়ার করেছিলেন ৬৫, মিলিটারী ইঞ্জিনীয়ারের ভঙ্গিতে। প্রথম ওভারেই মেজাজ দেখালেন। বেরী নাইটের ৬ বলে ১৬ রানের ধাতানি। কাণ্ডখানা এইরকম—

"তাঁর প্রথম স্ট্রোক বজ্রগর্জিত সোজা ড্রাইভের বাউণ্ডারী। তৃতীয় বলে হুক—বাউণ্ডারী। চতুর্থ বলেও হুক—দু'রান। পঞ্চম বলটি ফুলটস, তাতে চারের হাতুড়ি। ষষ্ঠ বলকে মিড উইকেটে ঘুরিয়ে দুই।"

ইঞ্জিনীয়ারের এই ধাত যাতে বিপক্ষের ধাত-ছাড়া। এমন মানুষের ভুল হয়, ভুল ধরা হয় না।

অপরদিকে ছিলেন ৬৩ রানের নিঃশব্দ সঙ্গী নাদকার্নি। মেঘে মেঘে বেলা হয়, চুপি চুপি রান সরিয়ে রান হয়। নাদকার্নি যাবার আগে বলে গেলেন, বাপু, আমি নাদ করিনি, তাই আমার নাম বাপু নাদকার্নি—কিন্তু কাজ করিনি কেউ বলুক দিকি।

ইংলণ্ডের ব্যাটিং প্রত্যাশিত হল না, অথবা প্রথম শ্রেণীর স্পিন বোলিংয়ের বিরুদ্ধে প্রত্যাশিত দুর্বলতা দেখাল। বোরদে ও ডুরানী অর্থাৎ নাকানি ও চোবানি।

তৃতীয় দিন ভারতের দুঃখদিন। তার উদ্দীপনা হ্রাস পেয়েছে। দুর্বলতা দেখা গেছে ফিল্ডিংয়ে, ব্যাটিং কেঁপেছে থরহরি। অপরদিকে ইংলণ্ডের ধমনীতে রক্তপ্রবাহ। সে চার উইকেটের ১০১ রানকে টেনে নিয়ে যেতে পেরেছে ইনিংসশেষে ১৮১ রান অবধি। তার মধ্যে

মাইক স্মিথ চশমা পরেও ভারতের বল যাচাই করেছেন ভালভাবে, ৭৩ রানে, এবং ডেভিড স্মিথ ও মিলম্যান বিনা ভূমিকায় হুদ্দাড় করে রান বাড়িয়েছেন—৪৪ মিনিটে তাঁদের ৫০ রানকে ভারতের লেজ ঝাপটানোর উত্তর বলা যায়।

তবে বল করেছিলেন বটে অচিন্ত্যকুমারের 'হৃদয়-জুড়ানী' ডুরানী। ১০৫ রানে ৬ উইকেট। বল ফেলে ছড়িয়ে লুটে খাওয়া। ডুরানীর বলের ধাঁধায় ব্যাটসম্যানেরা কানামাছি খেলল।

দ্বিতীয় ইনিংস সুরু করে ভারত তৃতীয় দিনের শেষে করল তিন উইকেটে ৬৫। কন্ট্রাকটার অধিনায়ক হবার জন্য প্রথম ইনিংসে করেছিলেন ৮২, অধিনায়ক হয়েই নিজমূর্তি ধরলেন, দ্বিতীয় ইনিংসে—৩।

তৃতীয় দিনের শেষে ভারতের হাতে ৭ উইকেট, ভারত ২১২ রানে এগিয়ে।

চতুর্থ দিন মঞ্জরেকরের। ভারত যে দ্বিতীয় ইনিংসে ১৯০ রান করতে পেরেছিল টনি লকের মারাত্মক লেগস্পিনের বিরুদ্ধে, তার সমস্ত কৃতিত্ব মঞ্জরেকরের প্রাপ্য। অনবদ্য বোলিং করে লক ৬৫ রানে ৬ উইকেট নিলেন, অপূর্ব ব্যাটিং করে পতনের মুখে মঞ্জরেকর ছিনিয়ে নিলেন ৮৩। তাও গেছেন রান আউটে। মঞ্জরেকরের শ্রেষ্ঠ ইনিংসের এটি একটি। এই বুড়োকর্তাকে খাতির করে বসিয়ে রাখার কারণ বুঝেছ?—নির্বাচকেরা চাপা হাসির সঙ্গে সম্ভবত জানাতে চাইলেন কলকাতার সমালোচকদের। কলকাতায় কিছু না করে মঞ্জরেকর কলকাতার উপর প্রতিশোধ নিয়েছেন, কিন্তু তাঁর সামগ্রিক সাফল্য এ বৎসরের রাবারলাভে শক্তি দিয়েছে। স্পিন-ধরা উইকেটে খেলার মেজাজ ও মনঃসংযোগ তাঁর ছিল; পিছল মাটিতে নাচা কিংবা পাড়ভাঙা তটে খেলা করবার মত কৌশল দেখিয়েছেন এই 'স্থূলিত' ব্যক্তিটি। মঞ্জরেকরের সমালোকদের মধ্যে আমি একজন—আমি তেমন একজন যাকে মঞ্জরেকর বারবার লজ্জিত করেছেন আমাদের মজ্জমান অবস্থায় উদ্ধারের ব্যাট বাড়িয়ে।

চতুর্থ দিনে দুটো রেকর্ড হল, একটা মঞ্জরেকরের, অন্যটা ব্যারিংটনের। এই টেস্টসিরিজে ৫৮৬ রান করে মঞ্জরেকর যেকোনো সিরিজের সর্বোচ্চ ভারতীয় রেকর্ড করলেন। পূর্বতন রেকর্ড ছিল মোদী ও উমরিগরের—৫৬০ রানের। এবং ব্যারিংটনও ৫৯৪ রান করে ভারতের বিরুদ্ধে ওয়াটকিন্সের ৪৫১ রানের রেকর্ড নষ্ট করে দিলেন।

উইকেটের অবস্থা আশাপ্রদ নয়, তার প্রমাণ ভারতের ও ইংলণ্ডের ব্যাটিং। ইংলণ্ড চতুর্থ দিনের শেষে করল ৫ উইকেটে ১২২। ভারতের সঙ্গে এখনো ২১৬ রানের ব্যবধান, হাতে উইকেট মাত্র পাঁচটি, যেখানে ফাটা মাটির মধ্যে বোরদে-ডুরানীর সাপগুলো লুকিয়ে আছে।

লক্ষ লক্ষ লোকের প্রত্যাশা পূরণ করে পঞ্চম দিনে ভারত পঞ্চম টেস্টে জিতল ১২৮ রানে। ২০৯ রানে ইংলণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের শেষ। এই শেষ ভারতের পক্ষে বেশ—সন্দেশ। প্রথম রাবার-লাভ ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে। আগেই বলেছি 'এসেছে সে এক দিনে' মাদ্রাজীদের রক্তে ধেয়ে এল বহ্নিবন্যা। কন্ট্রাকটার-উমরিগরের দর্শন-লালসায় মাদ্রাজীরা চেয়ার ভাঙল, গ্যালারি ভাঙল, লাঠি খেল, গুলি খেল না, এবং সবচেয়ে বড় যে কাজ করল, একজন অনুরাগীকে বলি দিল ক্রিকেটের আনন্দযজ্ঞে। তার বিবরণ এই।—

খেলার মাঠে ক্রিকেট-অনুরাগীর

মৃত্যু

মাদ্রাজ, ১৩ই জানুয়ারী—আজ কর্পোরেশন স্টেডিয়ামে ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে পঞ্চম টেস্ট খেলা দেখিবার সময়ে ৫৬ বৎসর বয়স্ক জনৈক অনুরাগী মারা যান।

খেলা যখন চলিতেছে তখন তিনি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন, এবং হাসপাতালে স্থানান্তরিত করিবার পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

উক্ত ক্রিকেট-অনুরাগীর নাম—শ্রীবিজয় রাঘবন। ভেলোরের খাদি বিভাগের তিনি একজন কর্মী। টেস্ট খেলা দেখিবার জন্য আজ সকালে তিনি এখানে আসেন।

এই মৃত্যুর দ্বারা মাদ্রাজ একটি সুবিখ্যাত অনুকরণকে পূর্ণাঙ্গ করেছিল। শ্রীযুক্ত বেরী সর্বাধিকারী যথেষ্ট নিন্দার সঙ্গে একটি সংবাদ পরিবেশন করেছেন—"মাদ্রাজের ক্রিকেট-অনুরাগীরা শব-বহনের একটি গাড়ী বার করেন। শবযাত্রার নিয়মগুলি পালিত হয়। বোধ হয় তাঁরা এর দ্বারা বোঝাতে চেয়েছেন যে, ইংলিস ক্রিকেটের মৃত্যু হয়েছে।"

মাদ্রাজীরা কোন্ সুবিখ্যাত ঘটনার অনুকরণ করেছিল তা পাঠক নিশ্চয় জানেন। ১৮৮২ সালের বিখ্যাত ইংলণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ম্যাচে মাঠের মধ্যে একজন অনুরাগীর মৃত্যু হয়েছিল এবং ইংলণ্ড হারলে ইংরেজ সমর্থকেরা ইংলণ্ডের ক্রিকেটের মৃতদেহকে চিতায় তুলেছিল। সেই চিতাভস্ম থেকেই অ্যাসেজের সৃষ্টি।

মাদ্রাজের ঐ সকল ক্রিকেট-অনুরাগীরা খুবই রসিক সন্দেহ নেই, তবে পানীয় একটু বেশী গেঁজে গিয়েছিল বলে তাদের পায়ের আর মাথার ঠিক ছিল না। তারা ভুলে গিয়েছিল যে সভ্য মানুষ নিজেকে চিতায় তুলতে পারে, কিন্তু অপরকে পারে না। সঙ্গত কারণেই শ্রীযুক্ত সর্বাধিকারী তাদের বীভৎস আনন্দে ঘৃণাবোধ করেছেন। ঐ সকল অনুরাগী যখন কয়েক মাস পরে কফিনটি খুলবে তখন দেখবে, সেখানে ইংলণ্ডের শবদেহের বদলে শোয়ানো আছে ভারতের শব।

কিছু উদ্ভ্রান্ত উল্লাসের কথা বাদ থাক, নির্বুদ্ধিতা মাদ্রাজ, কলকাতা, বোম্বাই সর্বস্থানেই সম্ভব, শেষ টেস্টের বাকি কথায় ফিরে আসি। শেষ পর্যন্ত ভারতের জয় স্পিনের জয়। ভারতের নবাবিষ্কার ডুরানী, বোরদের সহযোগে উৎকৃষ্ট স্পিনজুটি। হঠাৎ টেস্টে এসেছিলেন তিনি, পাঁচ টেস্টে সর্বাধিক ২৩টি উইকেট নিয়ে এবং বেশ কিছু রান করে প্রমাণ করলেন, তিনি যাবার জন্য আসেন নি।

ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা নাকি স্পিনিং হুইলের দান, সত্য মিথ্যা জানি না, কিন্তু ইংরেজদের বিরুদ্ধে ক্রিকেটীয় স্বাধীনতা যে ডুরানী-বোরদের স্পিনিং ফিঙ্গারের দান, সেটা সত্যি বলে মানি।

ভারতের চোখে আলো, বুকে সাহস, প্রাণে আশার সঞ্জীবনী।

সামনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের রমণীয় দ্বীপরাজ্য।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজগামী ভারতীয় দলের গুণাগুণ নিয়ে কিছু লিখে-ছিলাম। লেখাটির জন্য প্রশংসা ও অপ্রশংসা প্রভূত পেয়েছি। প্রশংসা পেয়েছিলাম তৎক্ষণাৎ, নিন্দা এসেছিল বিলম্বে। রচনার নাম 'এই ক্রিকেট দল সর্বশ্রেষ্ঠ'?

এই ক্রিকেট দল সর্বশ্রেষ্ঠ?

১৯৫২ সালের ১৫ই জানুয়ারী মাদ্রাজের কর্পোরেশন স্টেডিয়ামে ভারতীয় ক্রিকেট ইংরেজশাসন থেকে মুক্ত হয়েছে।

ভারতীয় ক্রিকেট দীর্ঘজীবী হোক।

ভারতের ক্রিকেট-বাহিনী এখন নূতন একটি অভিযানের জন্য প্রস্তুত। খেলার লড়াইয়ের সেই প্রতিপক্ষ অতি দুর্ধর্ষ। ভারত জিতলে খুবই ভাল,হারলেও লজ্জা নেই যদি সে পুরুষাজের মত হারে।

ভারতীয় দল ওয়েস্ট ইণ্ডিজে যাত্রার পূর্বে কিছুদিন কেরালায় কাটিয়ে গেলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রকৃতি-পরিবেশের কিছু নমুনা আগে থেকে পেয়ে যেত। নারকেল বন, সমুদ্র-বাতাস, বিস্তীর্ণ জল এবং জলে আলো ছায়ার আলিঙ্গন।

যাত্রার পূর্বে ভারতীর দল আরও একটি কাজ করলে ভাল করবে। নেট প্র্যাকটিসের সময়ে কোনো একটি টাইফুনকে যদি হাজির করতে পারে, তাহলে ভগ্নবুক, ধ্বস্তব্যাট এবং ক্ষিপ্তউইকেট হবার সম্ভাবনা কমে যাবে।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্র-বলশালী।

বর্তমান পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ক্রিকেটদলের বিরুদ্ধে তাদের নিজের মাঠে ভারত খেলতে যাচ্ছে—সুখের কথা নেকর্ডে ভারতের অবস্থা এখন তুঙ্গীতে।

যথার্থত সে ভারতীয় দল কোথায় দাঁড়িয়ে আছে?

আমার ধারণা, ইতিপূর্বে যত দল বিদেশে গিয়েছে তাদের কোনো দলের চেয়ে বর্তমান ভারতীয় দল পশ্চাদ্বর্তী নয়।

১৯৩২ দলের কথা বাদ দিই, সে দল সম্বন্ধে আমার কোনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই, কিন্তু পরবর্তী দলগুলির মধ্যে ১৯৪৬ সালের ইংলণ্ড-সফরকারী দল যে সর্বশ্রেষ্ঠ, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

১৯৪৬ সালের 'নাম'-মাহাত্ম্য অসাধারণ। সে দলে ছিলেন বিজয় মার্চেণ্টের মত প্রথম শ্রেণীর ক্ল্যাসিক্যাল ব্যাটসম্যান, মুস্তাক আলীর মত রোমান্টিক ওপেনার; ছিল হাজারের মত রান-যন্ত্র এবং অমরনাথের মত ইন্দ্রজাল; 'পৃথিবীর একনম্বর অলরাউণ্ডার' সম্মানের জন্য নির্বাচনপ্রার্থী ভীনু মানকদ সেই দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং অধিনায়করূপে বর্তমান ছিলেন পাতৌদির নবাব, যাঁর ব্যাটের জোর কমে গেলেও নামের জোর ছিল যথেষ্ট। মোদী, সি এস নাইডু, সারভাতে, সিন্ধে, সুঁটে ব্যানার্জি, হিণ্ডলেকর, গুল মহম্মদ, হাফিজ কারদার,—এ সবও বিশিষ্ট নাম সন্দেহ নেই।

ইতিহাসে উঠে গিয়েছে এমন কয়েকটি নাম-বাঁধানো দলের সঙ্গে আমি তুলনা করতে যাচ্ছি এমন একটি দলের যার একজনও এখনো পৌরাণিক চরিত্র হয়ে উঠতে পারেনি। বিজ্ঞ পাঠক বলবেন, ডেক্সটারের ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে এক সিরিজে কোনো টেস্টে না হেরে, দু' টেস্টে জিতে ও রাবার পেয়ে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর সঙ্গে বর্তমান লেখকেরও মাথায় গোলমাল হয়ে গিয়েছে নিশ্চয়।

হয়তো। কিন্তু—।

ক্রিকেট-বিচারে প্রতিপক্ষের হিসেব সব সময় নেওয়া উচিত।

ডেক্সটারের টিম? ছি! লজ্জায় কালির ঘোমটা টেনে বসেছেন ইংলণ্ডের কোনো কোনো ক্রিকেটলেখক। তাও তো বটে--ভেবেছেন কিছু এদেশীয়, বিদেশীর বেআক্কেলীও যাদের কাছে বেদ। তবে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সদ্‌বুদ্ধি থাকে। সে সদ্‌বুদ্ধি আছে এম সি সি-র সভাপতি স্যার উইলিয়ম উরসলের। ভাঁড়ার ঘরের হিসাব তিনি রাখেন। তাঁর মতে ইংলণ্ডের যথার্থ প্রতিনিধিস্থানীয় দল এটি। লেখকদের মধ্যে ব্যানিস্টারের তাই মত। ক্রিকেটারদের মধ্যে ডেক্সটারের। ইংলণ্ড হারবার পরে এঁরা বলেননি ইংরেজ সংবাদিকদের মত—আটজন সেরা খেলোয়াড় বাদ দিয়ে দল পাঠানো অনুচিত কিংবা তাঁরা 'ভারত বন্ধুকে' উদরস্থকারী ইঙ্গভারতীয় সংবাদপত্রটির মত ভারতের প্রতি সহানুভূতিতে কাতর হননি—আহা, ভারতীয়দের কী দুর্ভাগ্য, তারা মে-কাউড্রে-স্ট্যাথাম-ট্রুম্যানকে চাখতে পারল না!

ইংলণ্ড দ্বিতীয় দল পাঠিয়েছে? তার উত্তরে ইংলণ্ডের ক্রিকেটের কর্তাপ্রধান বলেছেন, বর্তমান অবস্থায় ঐ আমাদের অদ্বিতীয় দল।

ঈশ্বর না করুন, ওয়েস্ট ইণ্ডিজে আমাদের যদি কিছু ভাল-মন্দ হয়, তাহলে বলতে পারব, -এটি আমাদের 'দ্বিতীয়' দল বলেই এমন দুর্ঘটনা। আমাদের এই দলে গুপ্তে নেই, তিন ডব্লিউকে যে গুপ্তে ১৯৫২-৫৩-তে সর্বাধিক উদ্বেগ দিয়েছিলেন: দলে নেই আব্বাস আলী বেগ, ট্রুম্যানের বেগ ধারণ ও বর্জন করবার মত শক্তি যিনি দেখিয়েছেন; অরবিন্দ আপ্তেকে পাঠানো যায়নি, কিংবা মিলখা সিংকে, কিংবা কুমারকে, কিংবা—আমরা বিরাট বিরাট প্রতিভাকে আবিষ্কার করে নিজেদের লজ্জা ঢাকতে চেষ্টা করব, কারণ সে বিদ্যা ইংরেজ সমালোচকেরা আমাদের শিখিয়ে দিয়েছেন। এবং বলব, ব্রাডম্যানের অস্ট্রেলিয়া ১৯৪৭ সালে যে আমাদের হারিয়ে দিয়েছিল তার একমাত্র কারণ, মার্চেন্ট-মুস্তাক-মোদীর মত গ্রেট ক্রিকেটার সে দলে ছিল না।

ইংরেজ সমালোচকেরা একটা কথা স্বীকার করুন না কেন—ইংলণ্ডের ক্রিকেটে দুর্দিন এসেছে সত্যই। তেমন কথা মানলে সত্য

কখনও হয় আবার ভারতীয় ক্রিকেটের বেশী প্রশংসা করতে হয় না।

পুরনো কথায় ফিরে যাওয়া যাক। ১৯৪৬ সালের ভারতীয় দল ডেক্সটারের দলের চেয়েও বড় দলের সম্মুখীন হয়েছিল, যে দলে ছিলেন হ্যামণ্ড-হাটন-ওয়াসব্রুক-কম্পটন-এডরিচ-হার্ডস্টাফ। যে দলে সদ্য উঠে পড়েছেন আলেক বেডসার, পরে যিনি যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর সেরা মিডিয়াম ফাস্ট বোলার নামে চিহ্নিত হবেন।

তার উপর ঐ তারকাখচিত ইংরেজ দলের সঙ্গে ভারতকে খেলতে হয়েছিল তাদের নিজের মাঠে। ইংলণ্ডের মাঠ ইংরেজদের সাহায্য করে একথা সর্ববিদিত। কাদামাঠে সাদা ফ্লানেল ডুবিয়ে খেলে সেই মাঠের খেলার রাজা হয়েছে ইংরেজ ক্রিকেটাররা, আর অপরে কাদায় বেকায়দা হলে ত্নয়ো দিয়ে বলেছে—ইনি তাহলে ভাল মাঠের বড় খেলোয়াড় !

আমার বিশ্বাস, ১৯৪৬ সালের ইংলণ্ড দল ভারতের মাঠে খেললে ভারতকে হারাতে তো পারতই না উপরন্ত তাদের হারবার সম্ভাবনা থেকে যেত। এটা নিছক অনুমান নয়। ১৯৪৮-৪৯ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ভারতে এসেছিল, ঐ সিরিজে ভারত মাত্র একটি টেস্টে পরাস্ত হয়, শেষ টেস্টে যে জিততে পারেনি তার জন্য ওয়েস্ট ইণ্ডিজের নেতিমূলক খেলা দায়ী। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সে নেতি নীতিহীনতায় পৌঁছেছিল।

এতৎসত্ত্বেও বলব, ১৯৪৬ সালের ভারতীয় দলের তুলনায় ১৯৫২ সালের দল পেছিয়ে পড়বে না, অন্তত একটি কারণে, প্রথম পাঁচ ছয় জন খেলোয়াড়ের পরে ১৯৪৬-এর বাকি ব্যাটসম্যানেরা ব্যাটহাতে মাঠে নামলে মনে হত ছড়িহাতে সান্ধ্যভ্রমণে বেরিয়েছেন বাবুর দল, ১৯৫২ দল ব্যাটিংয়ে আগা-পাশ-তলা মজবুত।

১৯৫২ দলে অলরাউণ্ডার ধাঁচের অনেকগুলি খেলোয়াড় আছেন। তাতে দলের হঠাৎ ধ্বসার সম্ভাবনা কম। এই ভারসমতা ১৯৪৬ দলের

ছিল না। ১৯৪৬ দলে নামীর সংখ্যা ছিল বেশী, ১৯৫২ দলে কর্মীর সংখ্যা। ১৯৪৬ দল 'নামব্যূহ' সত্ত্বেও যে উল্লেখযোগ্য সাফল্যলাভ করতে পারেনি তার অনেক কারণের সঙ্গে আরো একটি কারণ দেখানো যায়—সে দলের অনেকেই খেলা শিখেছিলেন প্রকৃতির পাঠশালায়, আরণ্য মাদকতায় তাঁরা চমৎকৃত করতেন। ১৯৫২ সালের ভারতীয় খেলোয়াড়রা বিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে মাঠে ঢুকেছেন।

১৯৪৬ ও ১৯৫২-র খেলোয়াড়দের কাছাকাছি রেখে বিচার করা যায়। অসাধারণ বিজয় মার্চেণ্ট উপস্থিত না থাকলেও তাঁর উত্তরাধিকার নিয়ে বর্তমান আছেন বিজয় মঞ্জরেকার, মেদহ্রাসে যিনি কান্তিমান হয়েছেন এবছর। নয়নানন্দ মুস্তাক আলীর ক্ষতিপূরণ করছেন কমনীয় মনসুর আলী; মুস্তাকের বেহিসেবী চাবুক মনসুরের হাতে না থাকার ফল দলের পক্ষে আখেরে ভালই। অমরনাথকে নিশ্চয় পাওয়া যায় নি, অমরনাথদের পাওয়া যায় না সহজে, কিন্তু আমার ধারনা, চাঁদু বোরদে বলে-ব্যাটে অমরনাথের মতই কিংবা ততোধিক পরিমাণে সাহায্য করবেন দলকে। ভীনু মানকদ গেছেন, তাঁর বদলে এসেছেন দুটি ভীনু, একজনের নাম বাপু নাদকার্নি,—'দীন ভীনু' বা 'ভীনুদাস,' এর যেকোনো একটি নাম যিনি নিজের জন্য বেছে নিতে পারেন; অপরজন হলেন সেলিম দুরানী, ভীনুর হাতে হাত দিয়ে যাঁর মাঠে অবতরণ এবং যিনি একদিন সত্যিই 'প্রায় ভীনু' হয়ে উঠতে পারেন। তাছাড়া দলে আছেন, উমরিগর, যাঁকে মাঠে দেখলে ভরসা হয়, ব্যাট যাঁর মুঠিতে ধরা পড়ে ত্রাহি-ত্রাহি করে ওঠে। নরী কন্ট্রাকটারকে ভুলে যাওয়া উচিত নয়, কয়েকটি টেস্টে ব্যর্থতা যাঁর বিষয়ে শেষ কথা হতে পারে না। আছেন জয়সীমা, তিনি আগে খেলতেন ব্যাট লুকিয়ে এখন দেখিয়ে বেড়ান দরকার হলে। বিজয় মেহরার সঙ্গে যুক্ত হয়ে এঁরা হাজারের অভাব নিশ্চয় পূরণ করতে পারবেন। তাছাড়া দর্শকদের দর্শনীকে মূল্যবান করবার

মত ঝাঁঝালো ব্যাটিং দিতে পারবেন—সরদেশাই, সুর্তি, ইঞ্জিনীয়ার এবং দেশাই।

বোলিংয়ের দিকে চোখ ফেরানো যায়। দলের ভরসা লেগ স্পিনে। ভরসা বেড়ে গেছে ১৯৫৩ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজে লেগস্পিনে গুপ্তের সাফল্যে। গুপ্তে সেবার ২৭টি টেস্ট-উইকেট নিয়েছিলেন এবং ওরেল-উইকস-ওয়ালকটকে গুগলির গুপ্তবেগে অস্থির করেছিলেন। নানা কারণে ফর্ম থাকা সত্ত্বেও এবার সরকারী খরচে গুপ্তের শ্বশুর বাড়ীতে ঘুরে আসা সম্ভব হল না, কিন্তু ভারতীয় দলে যাচ্ছেন একটি চমৎকার লেগস্পিন জুটি—বোরদে ও ডুরানী। দুজনের ভঙ্গীতে আকর্ষণীয় পার্থক্য। নিখুঁত লেংথের অল্প ফ্লাইট ও স্পিনের ধারালো বলে ডুরানী ব্যাটসম্যানকে গেঁথে রাখেন। সেই শ্বাসরোধ থেকে মুক্তি আছে যেন—ব্যাটসম্যান অনুভব করে—বোরদের হাওয়ায় ওড়ানো বলগুলির মধ্যে। সেই চিন্তাগত বিভ্রান্তি যেই দেখিয়েছে সে, অমনি বোরদে উঁচু থেকে শকুনের মত হঠাৎ নেমে ছোঁ দিয়ে নিয়ে চলে যাবেন উইকেট। অপর পক্ষে বোরদের ভাসমান অভিশাপগুলির হাত থেকে কেউ যদি পরিত্রাণ পেতে চায় ডুরানীর মধ্যে আশ্বাসের সম্ভাবনা দেখে, বেশী দেরী হবে না—ডুরানীর নিখুঁত বক্রতা বিষ ঢেলে দিতে দেরী করবে না একটুও। জুটিতে লুটি—বোলারদের প্রবচন। ভারতীয় ক্রিকেটে তার প্রমাণ, ভীনু-অমরনাথ, ভীনু-গোলাম আমেদ, ভীনু-গুপ্তে জুটি। বর্তমানে বোরদে-ডুরানী।

অফস্পিনের ব্যাপারে কাজ চালিয়ে নেওয়াই ভারতের উদ্দেশ্য। ব্যাটসম্যানকে ঠাণ্ডা রাখবেন নাদকার্নি ও উমরিগর। বেশী উত্তেজনা দেখালে তাদের ভুলের সুযোগ নিতে দেরী করবেন না। তাছাড়া আছে রীতিমত অফস্পিনারের দাবিদার প্রসন্ন। প্রসন্ন রীতিমত সাফল্য বা দুঃখজনক ব্যর্থতা দুইই দেখাতে পারেন।

অফস্পিনের মতই দ্রুত বলেও কোনো উচ্চাভিলাষ নেই ভারতের। বলের রঙ চটানোই প্রধান উদ্দেশ্য, এবং তা যত কম রান

খরচ করে সম্ভব। ওরই মধ্যে যদি দু'একটা উইকেট পাওয়া যায়। সকালের মাঠ শিশিরে ভেজা কিংবা সকালের বাতাস কুয়াশায় ভারী, ব্যাটসম্যান হয়ত আলস্যে এলোমেলো, কাঁচা ঘুম ভেঙ্গে এসেছেন, ঘুমোতে চান ফিরে গিয়ে, সে ক্ষেত্রে রঞ্জনে বলে জোর বেশী দিতে না পারুন, সুইঙ্গ আনতে পারেন অনেকখানি। আর বললে কথাটা হাসির মত শোনাবে—রমাকান্ত দেশাইয়ের মধ্যে আছে শান্তিকামী ভারতের অল্পমাত্রার অস্ত্রসজ্জা। হল, গিলক্রিস্ট, ওয়াটসন অবশ্য কানের পাশ দিয়ে কামানের গোলা ছুঁড়বেন, সেক্ষেত্রে দেশাইয়ের বল সামান্য গুলি ছাড়া কিছু নয়, তবু ঐ বাঁটুলের গুলির জোর মালুম আছে অনেকেরই।\ ভারতীয় বোলারদের মধ্যে একমাত্র দেশাইয়ের বলেই দেহগন্ধ আছে।

এই ভারত। কিন্তু ওয়েস্ট ইণ্ডিজ কোন্ বস্তু? আগেই বলেছি সে দল পৃথিবীতে সেরা। সে দলের অধিনায়ক ফ্রাঙ্কি ওরেল। ওরেল ও বেনোড এখন পৃথিবীর ক্রিকেটে সবচেয়ে বড় দুটি নাম। প্রতিভার পরিমাণে বেনোডের অনেক উপরে ওরেলের স্থান।

সোবার্স ও কানহাই সম্ভবত এখন পৃথিবীর এক নম্বর ও দু নম্বর ব্যাটসম্যান। ন্যাটা হার্ভের মুখ প্যাভিলিয়নের দিকে আধখানা ফেরানো, ন্যাটা সোবার্স তাই অদ্বিতীয়। অদম্য অথচ নমনীয়, অনিবার্য ও উচ্ছ্বসিত কানহাইয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী অস্ট্রেলিয়ার ও'নীল, কিন্তু ও'নীলের লাল মুখ এখন কিছু ম্লান এবং কানহাইয়ের চিকন কালো মুখে এখন অনেক সতেজ আভা।

হাণ্ট নামক একটি ওপেনিং ব্যাটসম্যান আছেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজে, সূচনার দশ মিনিটের মধ্যে যাঁর খেলা দেখে মনে হয়--বোর্ডে বুঝি সাড়ে পাঁচশো রান চড়ে আছে। হাণ্ট প্রভাতী খেলোয়াড়, কিন্তু সকালেই তিনি দুপুরের রোদ উপভোগ করেন।

আলেকজাণ্ডার যদি খেলেন, ভারত পৃথিবীর সেরা উইকেটকীপার ব্যাটসম্যানের খেলা আবার দেখতে পাবে।

নর্স, সলোমন ইত্যাদি কয়েকজন আছেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজে, নামী খেলোয়াড়দের ব্যর্থতা পূরণ করবার স্থির প্রতিজ্ঞা নিয়ে যাঁরা নিয়মিত মাঠে নেমে থাকেন।

স্পিন বলে রামাধীন ভ্যালেন্টাইনের 'কিছু গুঁড়া' এখনো অবশিষ্ট আছে। ওরেল ও সোবার্স, তাঁরা যথার্থই অলরাউণ্ডার প্রমাণ করবার জন্য প্রথম শ্রেণীর বল করে যান এবং অফস্পিনার গিবস্—হ্যাটট্রিক করতে বড্ডই ভালো লাগে তাঁর।

সবচেয়ে ভয়াবহ ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ঘটোৎকচ-বাহিনী—ঐ হল, গিলক্রিস্ট, ওয়াটসনাদি। উক্ত ধাবমান বিভীষিকাগুলির রূপবর্ণনা করে বিভীষকা বাড়াবো না। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের নবাবিষ্কারগুলির কথাও তুললাম না। সেখানে কোন্ মাঠে ফুঁড়ে কে বেরিয়ে আসে কেউ জানে না।

ভারতীয় খেলোয়াড়দের একটি জিনিস স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। বর্তমান ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ভালো দল নিশ্চয়ই কিন্তু ১৯৫৩ সালের ওরেল-উইকস-ওয়ালকট-স্টলমায়ার-গোমেজ-ভ্যালেন্টাইন-রামাধীনের দল কিছু খারাপ দল ছিল না। সেই অসামান্য শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে ভারত অদ্ভুত খেলেছিল। হেরেছিল একটি মাত্র টেস্টে, ড্র করেছিল বাকিগুলিতে সম্মানের সঙ্গে। ঝাঁঝালো রোদে দুপুর বেলায় গুপ্তে ভেল্কি দেখিয়েছিলেন। উমরিগরের ব্যাটে দেখা গিয়েছিল অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। আপ্তে-পঙ্কজ-মানকদ-হাজারে দলের স্বার্থ-রক্ষার চেষ্টায় সচেষ্ট ছিলেন যোগ্যভাবে।

সেই গৌরবময় ১৯৫৩ সালের পিছনে ছিল ১৯৫২ সালের ঘনতম লজ্জা। ট্রুম্যানের হাতের থাবড়া খেয়ে 'শূন্য' হাতে কাঁদতে কাঁদতে ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা ফিরে এসেছিল।

তা সত্ত্বেও ঠিক পরের মরশুমে নিজেকে জাগিয়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল ভারতের পক্ষে।

আর এই ১৯৫২ সালে যে দল ওয়েস্ট ইণ্ডিজে যাচ্ছে—এর পট-

ভূমিকায় রয়েছে মহা গৌরবের উদ্ভাস। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে রানে ব্যাট ভরিয়ে ব্যাটসম্যান, হাতে উইকেট তুলে বোলার, এবং রাবার ঊর্ধ্বে তুলে সমগ্র দেশ মাঠ থেকে ফিরেছে প্যাভিলিয়ানে।

এই ১৯৫২ দলের কাছে দুটি অনুরোধ আছে। একটি ব্যক্তিগত। অনেক ভালো কথা আত্মহারা হয়ে লিখেছি তোমাদের সম্বন্ধে; দোহাই হে ভ্রাতৃগণ, ক্রিকেট-লেখকরা অবিরত ভিত্তিহীন ভবিষ্যৎবাণী করে, এই কথাটা প্রমাণ করবার জন্যই তোমরা যেন খারাপ খেলো না।

অন্যটি আমার নয়, দেশের অনুরোধ,—হারি জিতি লজ্জা নেই, ওয়েস্ট ইণ্ডিজে বলের স্পর্ধা সহ্য করব না, এই কথা যেন বলে আসে ভারতীয় নওজোয়ানেরা।

অনুরোধ নয়—সেটা দাবি।

সুখ দুখ দুটি ভাই

কয়েক মাস পরে। আমার ভীমদর্শন ফাস্ট বোলার বন্ধুটিকে হয়ত পাঠকের মনে আছে যিনি মিকসড্ ক্রিকেটের প্রস্তাবে আনন্দে নৃত্যগীত করেছিলেন,—একদিন প্রাতঃকালে তাঁর বাড়িতে হাজির হতেই তিনি আমাকে দু'হাতে বাগিয়ে ধরে দুটো ঝাঁকানি দিয়ে বললেন,—লজ্জা করে না—ছি ছি—পাবলিক সেন্টিমেন্ট নিয়ে খেলা? তোরা হলি ক্রিমিন্যাল নাম্বার ওয়ান!

হে পাঠক, দরিদ্র লেখক আমি, আমার কী বা সামর্থ্য? আমার দোষে আটায় ওষুধ মেশেনি বা আমি ওষুধেও আটা মেশাইনি, কলেরার টিকা দেবার ভারপ্রাপ্ত আমি ছিলুম না কিংবা সহরের আবর্জনা পরিষ্কারের দায় আমার ছিল না—তবু আমি পাবলিক এনিমি নাম্বার ওয়ান? হ্যাঁ, আমি যে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ভারতের রাবারলাভে লিখিত হর্ষ প্রকাশ করেছি এবং ১৯৫২ সালের ২৬শে জানুয়ারীর

আনন্দবাজার পত্রিকায় এক রচনায় বলেছি, ঐ বৎসর ওয়েস্ট ইণ্ডিজ-গামী ভারতীয় দল সফরকারী অন্য সকল ভারতীয় দল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

বন্ধুবর টেবিল থেকে স্টেনলেস স্টিল দিয়ে বাঁধানো একটি ক্রিকেট বল হাতে তুলে নিলেন। কোনো স্থানীয় ক্রিকেটে শূন্য রানে ৮টি উইকেট লাভ করায় এই বলটি তাঁকে উপহার দেওয়া হয়েছিল। যে আট জন তাঁর হাতে ঘায়েল হয়েছিল তাদের মধ্যে তিনজনকে পরবর্তী কয়েক মাস লেবু ও ফুলহাতে হাসপাতালে শুভেচ্ছা জানাতে যেতেন আমার এই স্পোর্টসম্যান স্পিরিটযুক্ত বন্ধুটি। বন্ধু এখনো দুঃখ করেন, বিপক্ষ দলের শেষ দুজন খেলোয়াড় যদি মাঠের ধারে উপবিষ্ট অবস্থাতেই পায়ের শিরায় টান না ধরাত তাহলে তিনি শূন্য রানে দশটি উইকেটই পেতেন।

স্টেনলেস স্টিল দিয়ে বাঁধানো সেই অষ্টতালভেদী বলটিকে হাতে তুলে নিয়ে বন্ধুবর আমার দিকে রান নিতে সুরু করে বললেন—তোকে আজ কণ্ট্রাকটার করে ছেড়ে দেব—

কণ্ট্রাকটার শহীদ হতে পারেননি ডাক্তারদের চেষ্টায়, আমিও হলুম না বন্ধুপত্নীর দিব্য আবির্ভাবে। একটি 'ছি', একটু 'ও কি' আমাকে সে যাত্রা বাঁচিয়ে দিল।

কিন্তু আমার অন্যান্য সমালোচক ও আমার মধ্যে সর্বক্ষেত্রে কোনো হৃদয়বতী বন্ধুপত্নীকে তো পাওয়া সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে উপায়? শ্রীযুক্ত হীরালাল বাজনাথ সেই উপায়।

সেকথা থাক, পরে হবে, আগের কথা আগে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজে হল কি?

যা হবার তাই হল, যা হবার নয় তাও হল। এক কথায় দেবী চৌধুরাণী হল।

তার মানে?

ওধারে ওয়েস্ট ইণ্ডিজে অপরিসীম চাঞ্চল্য—ভারতের বিজয়-সিংহেরা আসছে। বিজয়সিংহেরা প্রতিজ্ঞা করেছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের

নাম বদলে সিংহল করে ছেড়ে দেবে। বিজয়সিংহদের অধিনায়ক তো তাই জানালেন সদম্ভে—আমরা জিতবই। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সভয়ে প্রতীক্ষারত। কি হয়, কি হয়, বাঁচবার উপায় কি? অথচ সেখানে যেন কোনো প্রস্তুতি নেই। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ককে অনেকেই আত্মরক্ষার অনুরোধ জানাল, কিন্তু—

"প্রফুল্ল প্রস্তরময়ী মূর্তির মত নিস্পন্দ শরীরে ছাদের উপর বসিয়া রহিল। প্রফুল্ল ছিপ দেখিতেছিল না, বরকন্দাজ দেখিতেছিল না—দূর আকাশপ্রান্তে তাহার দৃষ্টি। আকাশপ্রান্তে একখানা ছোট মেঘ অনেকক্ষণ হইতে দেখা দিয়াছিল। প্রফুল্ল তাই দেখিতেছিল। দেখিতে দেখিতে বোধ হইল যেন সেখানা একটু বাড়িল। তখন 'জয় জগদীশ্বর' বলিয়া প্রফুল্ল ছাদ হইতে নামিল।"

এধারে ব্যাপার গুরুতর। কোম্পানীর সৈন্য দেবীর নৌকা ঘিরে ফেলেছে। নৌকায় উঠে এসেছে দেবীকে গ্রেপ্তারের জন্য কোম্পানীর সাহেব কর্তা। সেই সাহেবকে আবার ব্রজেশ্বর বিরাশী শিক্কা ওজনের চড় কষিয়েছে। সর্বনাশ! অন্ধকারের মধ্যে কোথায় আলোকশিখা?—

"হুজুর! তুফান উঠা। বলিয়া বাহির হইতে জমাদার হাঁকিল।

"সোঁ সোঁ করিয়া আকাশপ্রান্ত হইতে ভয়ঙ্কর বেগে বায়ু গর্জন করিয়া আসিতেছে শুনা গেল।

"কামরার ভিতর হইতে ঠিক সেই মুহূর্তে—যে মুহূর্তে সাহেবের গালে ব্রজেশ্বরের চড় পড়িল—ঠিক সেই মুহূর্তে আবার শাঁখ বাজিল, এবার দুই ফুঁ।

"বজরায় নোঙর ফেলা ছিল না,—পূর্বে বলিয়াছি, খোঁটায় কাছি বাঁধা ছিল, খোঁটার কাছে দুইজন নাবিক বসিয়াছিল। যেমন শাঁখ বাজিল, অমনি তাহারা কাছি ছাড়িয়া দিয়া লাফাইয়া বজরায় উঠিল। তীরের উপরে যে সিপাহীরা বজরা ঘেরাও করিয়াছিল, তাহারা উহাদিগকে মারবার জন্য সঙ্গীন উঠাইল, কিন্তু তাহাদের হাতের বন্দুক হাতেই রহিল, পলক ফেলিতে না ফেলিতে একটা কাণ্ড হইয়া গেল।"

কাণ্ডটা কি হল তা বাঙালী পাঠকমাত্রের জানা আছে। পাল-তোলা, খোঁটা-খোলা নৌকায় ঠিক সময় মত ঝড় এসে ধাক্কা দিল, কোম্পানীর সৈন্যকে বিমর্দিত করে নৌকা ছুটল নক্ষত্রবেগে, যে সাহেব ব্রজেশ্বরের চড়ের প্রত্যুত্তরে ঘুষি বাগিয়েছিলেন তিনি আছড়ে পড়লেন দিবাসুন্দরীর পাদমূলে, এবং আদর্শ বাঙালী পিতৃপুরুষ শ্রীযুক্ত হরবল্লভ 'মরিয়া যাইবার পর' শ্রীদুর্গাকে অপ্রয়োজনে আর কোনো নাম-ঘুষ দিতে রাজি হলেন না।

কাহিনীটা অক্ষরে অক্ষরে মিলবে না, কিন্তু মিল যে কোথাও একটা আছে তা সাহিত্যানুভূতিসম্পন্ন পাঠককে বুঝিয়ে দিতে হবে না। ভারত আসছে—এসে গেছে—সব কথা শুনে ওরেল মৃদু হাসলেন, তারপর স্বপ্নময় দৃষ্টিকে পাঠালেন বহুদূরে—দূর অস্ট্রেলিয়ার আকাশে একটি মেঘবিন্দু—ওরেল জানতেন সেই হল-মেঘ আসছে—ব্যস্ত হবার কিছু নেই—শুধু পাল তুলে বসে থাকা—

হলের ঝড় উঠল—

"সিপাহী সেনা ছিন্নভিন্ন হইল। দেবী তাহাদের পরাস্ত করিয়া পাল উড়াইয়া চলিল। নিমেষমধ্যে যুদ্ধজয় হইল। দেবী তাই আকাশ দেখিয়া বলিয়াছিল, আমার উপায় ভগবান করিতেছেন।"

শেষের অংশটি কিন্তু মিলে গেছে অক্ষরে অক্ষরে। কোনো একটা হল ভগবানের দান ছাড়া আর কিছু নয়। ভগবান তাঁর কৃপাপাত্রদের সাহায্যের জন্যই এমন হলোপায় প্রেরণ করেন।

পাঠকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে ক্লাসিক থেকে ক্রিকেটে ফিরে যাই আবার। এখানেও আমাদের জন্য একটা ক্লাসিক অপেক্ষা করছে—অ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্সের ক্লাসিক।

কিন্তু লোকটির কি অকুণ্ঠ ঔদ্ধত্য—প্রগল্‌ভতার পর্যায়ে যা প্রায় পৌঁছে গেছে! এই ভারতীয় দলকে সফরকারী সকল ভারতীয় দলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলার লজ্জায় যখন আমি মাটিতে মিশিয়ে আছি, কিংবা না থাকতে চাইলেও যখন আমাকে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে,

তখন কিনা ভারতীয় দলের পঞ্চ যজ্ঞনাশ স্বচক্ষে দেখেও সেই ব্যক্তি বললেন—

"উপসংহারে আমি আবার ঘোষণা করছি, ঐ একই ভারতীয় দল ওরেলের দ্বারা চালিত হলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে পরাভূত করতে পারত।"

এই দুঃসাহসী আশাবাদীর নাম হীরালাল বাজনাথ, ইনি জনৈক ক্রিকেট-সমালোচক, এঁর লেখাকে অর্থমূল্যে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং সযত্নে ছাপা হয়েছে সুবিখ্যাত স্টেটসম্যান পত্রিকায়। আরে ছি ছি!

হীরালাল বাজনাথের কথা সত্য হোক বা না হোক জনসাধারণের সামনে ভারতের পক্ষে বিয়োগান্ত ইতিহাসের পাতা খোলা আছে। ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে জয়ের পরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজে ভারতের মহাপ্রস্থান —একথাটি মুছে দেওয়া যাচ্ছে না।

পতনের নিম্নতম গহ্বর থেকে তথ্যগুলি তুলে আনা যাক।—

প্রথম টেস্ট—ভারতের পরাজয় দশ উইকেটে।

দ্বিতীয় টেস্ট -ভারতের পরাজয় এক ইনিংস ও ১৮ রানে।

তৃতীয় টেস্ট—ভারতের পরাজয় এক ইনিংস ও ৩০ রানে।

চতুর্থ টেস্ট—ভারতের পরাজয় সাত উইকেটে।

পঞ্চম টেস্ট—ভারতের পরাজয় ১২৩ রানে।

একে বলে সন্দেহ না রেখে হার এবং হারানো। এই অপমানিত চেহারা দেখার পরেও যদি কেউ পরাজিতের পক্ষে ওকালতি করে তবে সেটা বিরল মহাপ্রাণতার দুর্লভ দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

তবু একটা দুটো বিষয় বিচার করতেই হবে। আমার মত যাঁরা ওয়েস্ট ইণ্ডিজগামী ভারতীয় দলের গুণগান করেছিলেন, তাঁরা একটা কথা জানাতে ভোলেন নি—ভালো কিছু করতে হলে ভারতীয় দলকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের স্প্রিংসক্রীগের প্রথম ধাক্কা সামলাতে হবে। সমালোচকরা সচেতন ছিলেন একটি বিষয়ে—অস্বাভাবিক দ্রুত বলে ঠিকভাবে খেলা যায় না,বিশেষত সে দ্রুত বলের লক্ষ্য যদি উইকেট ও

শরীর দুইই হয়। কয়েকটি তথ্য ক্রিকেট-লেখকদের মনে ছিল, যথা একা লারউডের ধাক্কায় ১৯৩২-৩৩ সালের ব্রাডম্যানপূর্ণ অস্ট্রেলিয়ার ধ্বসে যাওয়া, যুদ্ধোত্তর কালে মিলার-লিণ্ডওয়ালের প্রহারে ইংলণ্ডের সক্রন্দন বিদায়, ঐ মিলার-লিণ্ডওয়ালের হাতেই ১৯৫১-৫২ সালে ওরেল-উইকস-ওয়ালকট-খচিত, ওয়ার্লড্-চ্যাম্পিয়ান বলে ঘোষিত, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পতন এবং পরবর্তীকালে ইংলণ্ডের টাইসন-টাইফুনে অস্ট্রেলিয়ার উড়ে যাওয়া,—অর্থাৎ ফাস্ট বোলিং এমন একটা পর্যায়ে উঠতে পারে যার বিরুদ্ধে অন্তত কিছু সময়েয় জন্য উপযুক্ত প্রতিরোধ আনা সম্ভব হয় না; বিশেষত যদি বলের দ্রুত গতির অস্বাভাবিকতার সঙ্গে অভিপ্রায়ের অসাধুতা যুক্ত হয়। ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান বোলিং আজ ঐ দুই ধনেই ধনী।

অস্ট্রেলিয়ার শেফিল্ড শীল্ডের খেলা শেষ করে হল যখন দেশে ফিরলেন তখন ঐ দূর-পাল্লার কামানটিতে নাজীদের ইহুদী-বিদ্বেষ। হল তখন সেই পর্যায়ের বোলার পৃথিবীর ক্রিকেট যায় অনুরূপ অল্পই দেখেছে—যদি সত্যই দেখে থাকে। হলের বলের মত হলের মেজাজেও টঙ্কার। অস্ট্রেলিয়ার শেফিল্ড শীল্ডের খেলায় কানহাই হয়ত হলের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরী করেছেন কিন্তু তাঁর সে সেঞ্চুরীজয় ভূষিত 'ক্ষতচিহ্ন অলঙ্কারে।' আমি যে আগে 'অভিপ্রায়ের' অসাধুতার মত কঠিন কথা ব্যবহার করেছি তার কারণ আছে এইখানে—অপরিমিত সংখ্যায় বাম্পার ও বীমার ব্যবহার করার ব্যাপারে। বীমার হচ্ছে অতিদ্রুত বল যা মাটিতে না পড়ে সোজা ব্যাটসম্যানের গায়ে পড়তে চায়; অর্থাৎ বলের ইঁটে ব্যাটসম্যানকে ঘায়েল করার চেষ্টা। এই বীমার, যা জনৈক রসিক ব্যক্তির মতে বেমার বা বিশিষ্ট মার, একদিন ছিল আকস্মিক, এখন হয়েছে আবশ্যিক; এমন একদিন ছিল যখন হাত ফসকে বীমার বেরিয়ে যাওয়ায় লিণ্ডওয়াল ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিলেন, সে বীমার আজ আর ক্ষমাপ্রার্থী নয়।

ফল যা হবার তাই হয়েছে, ভারতীয় ব্যাটিংয়ের মাথা ফেটে

চৌচির। মাথা-ভাঙা দল খেলতে পারে না, তাই সে যখন তখন যেখানে সেখানে ভেঙে পড়েছে। করোনারীর প্রথম স্ট্রোক হবার পরে সেরে উঠে মানুষটা ঘুরছে ফিরছে—হঠাৎ শোনা গেল, শুয়েছে এবং মরেছে।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজে বিপর্যয়ের পরে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের বিরুদ্ধে প্রধানত দুটি সমালোচনা শোনা গেল, প্রথম, বাম্পারে ঠিক কখন ডুব দিতে হয় তারা জানে না, দ্বিতীয়ত, হাতে ব্যাট থাকতে ভয় কি? প্রথম সমালোচনার উত্তরে বলা যায়, যথাসময়ে ডুব দেওয়ার ব্যাপারে খেলোয়াড়দের অসামর্থ্য সর্বদেশীয়, যাঁরা উ'কেটে নাচি নাচি করে খেলতে পারেন তাঁরাও ডোবার বা পালানোর ব্যাপারে ভুল করে ফেলেন,—সে ভুল যদি না হয় তাহলে হলের বলে কানহাই বারবার আহত হন কেন, কেনই বা ও'নীল মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েন ট্রু ম্যানের বলপ্রয়োগে? উডফুল, পন্সফোর্ড, হামণ্ড, জার্ডিন—সকলেই আহত হতে বাধ্য হয়েছেন। একটি কথা নিবেদন করা যায় নম্রভাবে— কোন্ বল ছাড়তে হবে তার হিসেব করতে যদি হাতের ব্যাট ভুল করে, তাহলে সে ভুল তো মাথার ব্যাটও করতে পারে, বিশেষত যখন ওভারে গোটা চারেক বোমার বাম্পার খুলি-বেলের দিকে ধাবিত? আর হাতে ব্যাট থাকতে আহত হও কেন? দোহাই, রণজিৎ সিংজীর ওকথাটা রণজিৎ সিং ছাড়া আর কারো মুখে মানায় না।

ভারতীয় দলের অভাবিত পরাজয়ের আরও নানা কারণ দেখানো হয়েছে—সফরের ক্রীড়াসূচী নির্ধারণে বিবেচনার অভাব, দলচালনায় পরিকল্পনাশূন্যতা, অধিনায়কের আঘাত ও অপসৃতি, অনভিজ্ঞ অর্বাচীনের অধিনায়ক হওয়া, খেলোয়াড় নির্বাচনে পুরনো পাপীদের প্রতি পক্ষপাত, এবং সমস্ত প্রতিকূলতার হিসেব নিয়েও দলের উপর-মহলে ব্যাটিংয়ে গাফিলতি! উল্টোদিকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দলের অবস্থিতি তো ছিলই, যে দল সামর্থ্যে ও আম্পায়ারে পুষ্ট।

খেলা চলাকালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের শক্তি সম্বন্ধে শ্রদ্ধা দুই অধিনায়কই প্রকাশ করেছিলেন। যে কণ্ট্রাকটার ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে হারাবেন বলেছিলেন, তিনিই দু' টেস্টে গো-হারান হারবার পরে বললেন, কি করব, উপায় নেই, দিগ্বিজয়ীদের কি রোখা যায়? চতুর্থ টেস্ট চলাকালে এক ভোজসভার শেষে অযথা বিনয়ে আক্রান্ত না হয়ে ওরেলও বললেন সরল ভাবে,--আমি অনেক ভেবে দেখেছি, অনেক বিচার করেছি, কিন্তু আমাকে একথা স্বীকার করতেই হচ্ছে—ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল হচ্ছে এইটেই—১৯৫০ দলের চেয়েও বড়, যে দল ইংলণ্ডকে হারিয়েছিল চূড়ান্তভাবে।

ভারতের পরাজয়ের পটভূমিকায় কথাগুলির বিশেষ মূল্য রয়েছে। বর্তমান পৃথিবীতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল যে শ্রেষ্ঠ, সেকথা 'এই ক্রিকেট দল সর্বশ্রেষ্ঠ' রচনায় আমি আগেই বলেছি। ১৯৫০ ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের চেয়ে ১৯৬২ দল শ্রেষ্ঠতর দুটি স্বতঃপ্রকাশিত কারণে, প্রথম, ১৯৫০ দলে উপযুক্ত ফাস্ট বোলার ছিল না, দ্বিতীয়, অধিনায়ক ছিল না প্রথম শ্রেণীর। বাকি ব্যাটিংয়ের ব্যাপারে, সোবার্স-কানহাই-হাণ্ট-সলোমন-ওরেল যে-দলে আছেন, স্পিন বলের ব্যাপারে গিবস ও সোবার্সকে যেখানে পাওয়া গেছে, সেখানে বিরাট কিছু অভাব আছে কেউ বলতে পারবে না। মূল কথা কিন্তু দুটি—ওরেল ও হল—অর্জুন ও গাণ্ডীব। যুদ্ধজয় অবশ্যম্ভাবী।

ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে এ হেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের একটি খেলার নমুনা তুলে ধরা যাক। ব্রিজটাউনে তৃতীয় টেস্ট। প্রথম দুই টেস্টে ভারত হেরেছে জঘন্যভাবে, একটায় দশ উইকেটে, অন্যটায় ইনিংসে। তৃতীয় টেস্টের অব্যবহিত পূর্বে ভারতের অধিনায়ক মৃত্যুশয্যাসীন। একুশ বছরের নবযুবক দলের কাণ্ডারী। ভারত প্রথমে ব্যাট করতে নেমে অনতিসংখ্যক ২৫৮ রানে ইনিংস শেষ করেছে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বিতীয় দিনে ৪ উইকেটে ভারতের রান পেরিয়ে করেছে—২৬৩। তৃতীয় দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ খেলতে সুরু করছে ৬ উইকেট হাতে

নিয়ে। তাদের পক্ষে এমন তৃপ্তিদায়ক পরিস্থিতি, তদুপরি তাদের দু'হাতে ওড়ানোর মেজাজ।

গোটা তৃতীয় দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ মোটমাট করল চার উইকেট খুইয়ে ১৬৪। চোখ রগড়ে ভাল করে চেয়ে দেখতে হয়—ব্যাপারটা সত্যি তো ?

বিস্ময়কর হচ্ছে, এই ধীর গতির প্রতিযোতির কূর্মাবতারের নাম ফ্রাঙ্কি ওরেল। এই অংশের ওরেল-কথা কিছু নিবেদন করা যাক,—

"সবচেয়ে অভাবিত কাণ্ড, এই ক্লান্তিকর খেলার স্থপতির নাম ওরেল। তিনি ১৫০ মিনিটে ১৯ রান করলেন, তা করে স্বর্গত অস্ট্রেলিয়ান টেস্ট-ক্রিকেটার মার্ডকের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ালেন, যিনি ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে মেলবোর্ণে একই সময়ে একই সংখ্যক রান করেছিলেন। ওরেলের ২৫ এল ১৬০ মিনিটে, ৫০ এল ২৮৬ মিনিটে।

"একদা পুরাকালে ফ্রাঙ্কি ওরেলের প্রতিটি মারের সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড উল্লাস ফেটে পড়ে কানে তালা ধরাত। আজ আধ ঘণ্টা ব্যাট করার পরে ওরেলকে ছুঁয়ো দেওয়া হল, তাঁর প্রত্যেকটি মারের পরে বিদ্রূপের চাপা হাততালি পড়তে লাগল। দর্শকের পা-ঘষা কখনই থামল না। এমনকি পঞ্চাশ পূর্ণ হলে যে চীৎকার উঠল তাতে বন্দনার বদলে ছিল ব্যঙ্গ।"

ওরেল কেন অমন করেছিলেন ? অন্যান্য কারণের মধ্যে মুখ্য কারণ—পারছিলেন না। না পারাটা তাঁর প্রতিভার বিলয়ের জন্য নয় সম্পূর্ণভাবে, আসল কথা ভারতীয় বোলিং করতে দেয়নি। নচেৎ ওরেলের খেলার ক্ষমতা হারায়নি তার প্রমাণ—পঞ্চম টেস্টে দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁর ব্যাটিং। দলের ৭৫ রানের মাথায় এসে তিনি শেষ-পর্যন্ত দাঁড়িয়ে ছিলেন, রান করেছিলেন ৯৮ নট আউট, দলকে দিয়েছিলেন জয়লাভের সামর্থ্য, দর্শকদের দিয়েছিলেন নয়নমোহন মারের সম্ভার।

এই একবার মাত্রই নয়, স্পিনসম্বল ভারতীয় বোলিং বহুবার

ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে তাদের রান-স্বর্গে আক্রমণ করেছে এবং ঐ সকল স্বর্গবাসীদের রান-নৃত্যের তালভঙ্গ ঘটিয়েছে। পরাজয়ের কালো মেঘের উপরেও যে-ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানদের ব্যাটের বিদ্যুৎ ঝলসে ওঠে ক্ষণেক্ষণে, তাদের সেই ভয়হীন, শান্তিহীন, শ্রান্তিহীন সোবার্স-কানহাইদের বেঁধে রেখেছিল কোন্ বস্তু? নিশ্চয় ভালবাসা নয় কিন্তু ভয়, নিশ্চয় প্রণতি নয় কিন্তু পরাক্রম,—এবং তা হচ্ছে কয়েকজন দুব্‌লা নরম চেহারার ভারতীয় ছোকরার বোলিং!

অথচ পাঁচটি টেস্টে জয়লাভ নামক সংবাদটি বিপক্ষের বোলিংয়ের উপর একচ্ছত্র আধিপত্যই ঘোষণা করে, বিশেষত প্রতিক্ষেত্রেই যদি প্রতিপক্ষের 'শোচনীয় পরাজয়' ঘটে থাকে। এই পাঁচ টেস্টে ভারতীয় বোলিংয়ের একটা চেহারা উপস্থিত করা যেতে পারে; সেই সূত্রে টেস্টম্যাচগুলিরও একটা সাধারণ পরিচয়।

প্রথম টেস্ট: পোর্ট অব স্পেন—ত্রিনিদাদ। আরম্ভ ১৬ ফেব্রুয়ারী। প্রথম দিনে প্রথম ইনিংসে ভারতের রান মাত্র ২০৩। ফাস্ট বোলার হল ও স্টেয়ার্সের উইকেট যথাক্রমে দুই ও তিন, স্পিনার সোবার্সের তিন। ভারতের ছোকরারা কম রানে আউট হলেও তারা হাজারের ১৯৫৩ সালের দলের চেয়ে অনেক হাত-খোলা, সকলে স্বীকার করল। তারা মারতে চায়। প্রথম দিনে ভারতের 'সামান্য' ২০৩ রানের উত্তরে দ্বিতীয় দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ করল কত? বিস্ময়কর হলেও সত্য—'যৎসামান্য' ১৪৮, ছয়টি উইকেট হারিয়ে। সব গৌরব ডুরানীর ও বোরদের, তারো মধ্যে ডুরানীর।

"ভারতীয় বোলিং, ফিল্ডিং ও উইকেটে বল ছোঁড়ার মত জিনিস এই ত্রিনিদাদ ওভালে আর দেখা যায় নি। চোখ মেলে দেখার জিনিস—কিভাবে ডুরানী, বোরদে এবং উমরিগর সোবার্স ও কানহাইয়ের মত পৃথিবীর সেরা ব্যাটসম্যানদের সম্মোহিত করে রেখেছিলেন।

"স্পিনারদের মোটেই সাহায্য করছিল না এমন পিচে ডুরানী

প্রবীণদের মত বলে ফ্লাইট দিচ্ছিলেন, আর বোরদে যেন সকল সময়ে মারাত্মক। তবে ডুরানীই দিনের হীরো। তিনি ভাল ব্যাট করেছেন, তাঁর ফিল্ডিং ত্রুটিহীন, উইকেটে বল ছোঁড়ায় তাঁর প্রত্যাশানুরূপ অভ্রান্ততা। তাঁর বোলিং?—তাঁকে মালা পরানো উচিত—সে বলে খেলা যায় না।

"চা-বিরতির পরেও ভারতীয় বোলাররা মুক্তস্বভাব ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানদের বেঁধে রাখলেন।...

"...ওরেল হান্টের সঙ্গে যোগদান করার পরেই ডুরানীর ইয়র্কারে বোল্ড হয়ে যাচ্ছিলেন। আজকের খেলার উল্লেখ্যতম বিষয়—ডুরানীর সুতো-মাপা লেংথ। এই বোলারটির বিরুদ্ধে ওরেল নিজেকে খুঁজেই পাচ্ছিলেন না—তার ফ্লাইটে বার বার এমন ভাবে পরাভূত হতে লাগলেন। সুতরাং পরপর তিনবার তার বলকে প্যাড দিয়ে ঠেকাবার পরে ওরেল যখন চতুর্থ বলটিকে সর্টলেগে সুর্তির হাতে তুলে দিয়ে গেলেন, তখন সেটাতে বিস্ময়ের কিছুই ছিল না। এক রান পরে ডুরানী হান্টকে প'পর তিন বলে পরাস্ত করলেন এবং তার পরেই তাঁকে ধাঁধা খাইয়ে সহজ ফিরতি ক্যাচ ধরে নিলেন।"

প্রথম ইনিংসে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ মোটমাট ২৮৯ রান করতে পারল তৃতীয় দিনে সলোমনের ৬৩, আহত হেনড্রিকসের ৬৪, ও বোলার হলের নট আউট ৩৭-এর জন্য। দলচালনায় কন্ট্রাকটার নৈপুণ্য দেখান নি।

প্রথম ইনিংসে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৮৬ রানে এগিয়ে, সেটা খুব বেশী কিছু না হলেও ভারত ঐ ম্যাচে হারল দশ উইকেটে, কারণ দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতের জন্য অপেক্ষা করছিল 'সর্বনিম্ন' রানের গৌরব। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতের রান ৯৮, হলের উইকেট ৩-১১ (৮-৩-১১-৩), সোবার্সের ৪-২২ (১৫-৭-২২-৪), আর দর্শকদের নিরানন্দ। খেলা দেখতে এসে ছেলেখেলা অসহ্য। দর্শকরা সমস্বরে আওয়াজ তুলল, কুইট সোবার্স, অর্থাৎ ওরেল, তোমার এত খিদে কিসের, ইঁদুর খেলাটা এখনি থামাচ্ছ কেন?

দ্বিতীয় টেস্ট জামাইকার কিংসটনে। প্রথমে সুরু করে ভারতের পুষ্ট সংখ্যার রান—৩৯৫। তথাপি এ খেলাতেও ভারতের হার এক ইনিংস ও ১৮ রানে। সেক্ষেত্রে স্বভাবতঃই প্রথম ইনিংসে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সুবিপুল রান—৮ উইকেটে ৬৩১—এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতের নাতিবৃহৎ রান—২১৮। ঐ ৬৩১ রানের ইনিংসটিতেই মাত্র ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান ব্যাটসম্যানেরা ভারতীয় বোলিংকে অসহায় অবস্থায় ছিন্নভিন্ন করতে পেরেছেন—চতুর্থ দিনে ছুটির মেজাজে খুসীর খেলা একবারের মতই দেখাতে পেরেছেন সোবার্স-মেনডোকার—কিন্তু এখানে স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার, ২ রানে সোজা ক্যাচ তুলে উইকেটকীপার ইঞ্জিনীয়ারের মুঠি এড়াবার পরেই সোবার্স ১৫৩ রান করতে পেরেছিলেন, এবং এই ইনিংসের মধ্যেও একটা গোটা দিন গেছে যখন ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান ব্যাটসম্যানেরা নয়, ভারতীয় বোলারেরা প্রাধান্য করেছে। সবচেয়ে বিস্ময়কর, সেই তৃতীয় দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ২৪১ রান প্রথম দিনে ভারতের ২৮০ রানের অনেক তলায় মাথা নামিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তৃতীয় দিনের ভারতীয় বোলিং—

"ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে তাদের ২৪১ রানের জন্য প্রতি ইঞ্চির সংগ্রাম করতে হয়েছে। আজকের রানের মধ্যে খুচরো রানের পরিমাণ ১০৭। লাঞ্চ ও চা-এর মধ্যে বোলিং সর্বোত্তম, যখন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ করেছে ১২০ মিনিটে ৬৭ রান, ৪টে উইকেটে হারিয়ে।

"আজকের প্রধান কর্তা প্রসন্ন, পাঁচ ফুটও হবে না এমন এক ছোকরা। ক্লান্ত বোরদে ও ডুরানীকে অব্যাহতি দেবার জন্য তার হাতে বল তুলে দেওয়া হয়, কিন্তু সেই খাটো মানুষটি অবিলম্বে সাফল্যলাভ করেন, আর সারাক্ষণ লেংথ বজায় রাখেন।

"ডুরানীর প্রাপ্তির হিসাবের মধ্যে তার নিখুঁত বোলিংয়ের রূপকে পাওয়া যাবে না। মরিয়া হয়ে তবে তার বলে রান করতে হয়েছে। সোবার্সকে ২ রানে তার পাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু ইঞ্জিনীয়ার ধরতে

পারলেন না। তারপর থেকে সোবার্সের প্রতিটি মারের শব্দ বজ্রবৎ বেজেছে ইঞ্জিনীয়ারের কানে।"

ভারতের ২১৮ রানের দ্বিতীয় ইনিংসে হল পেলেন ৬টি উইকেট (২০.৫-৫-৪৯ ৬), গিবস ৩ উইকেট (২৬-৮-৪৪-৩)।

তৃতীয় টেস্টের আগে সংবাদপত্রের স্তম্ভ কেঁপে উঠল ক্রিকেটের বীভৎসতম দুর্ঘটনায়। বার্বাডোজের সঙ্গে খেলার কালে অধিনায়ক কন্ট্রাকটার গ্রিফিথের ছুঁড়ে-মারা বলে কানের পাশে ঘা খেয়ে মৃত্যুশয্যায় শুলেন, যদিও সেই বরফ-শয়ন থেকে ব্যুত্থান তাঁর ঘটেছিল। সে ইতিহাসের কিছু কথা পরে বলব, এখন ভারতীয় বোলিং-কথায় ফিরে আসা যাক।

তৃতীয় টেস্ট বার্বাডোজের ব্রিজটাউনে। ভারতপক্ষে প্রায় বালক অধিনায়ক—২১ বছরের পাতৌদি; পরপর দুটো শোচনীয় পরাজয় এবং খেলার মাঠে প্রায়-মৃত্যুর মূর্তিদর্শন। ভারতীয় দলের মানসিক শক্তি ভূতলশায়ী।

ভারত প্রথম খেলতে নেমে নিজেদের মত করে একটা স্কোর করল —২৫৮। এই ইনিংসে বাম্পার পড়েনি।

ভারতের নিম্ন রান যেমন সংবাদপত্রের স্বাভাবিক সংবাদ তেমনি 'গতানুগতিক' আরও একটি সংবাদ--ভারতীয় বোলারদের নিখুঁত বোলিং। দ্বিতীয় দিনের বিবরণেও তাই প্রকাশিত হল। রানের সোনার সংসারে 'দীয়তাং ভুজ্যতাম্' হবার কথা,—সেখানে সারাদিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের রান ৪ উইকেটে ২৬৩! দু'টো টেস্ট জেতার পরেও স্বামীহারা দলের বিরুদ্ধে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের রান ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে হাঁটতে পারল না। নাদকার্নির বলের চুম্বক রানের কাঁটাকে টেনে রাখল সজোরে।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ অবশ্য শেষ পর্যন্ত প্রথম ইনিংসে তাদের রানকে ঠেলে তুলবে ৪৭৬-তে, এবং ভারত দ্বিতীয় ইনিংসে ১৮৭ রান করে

আবার ইনিংসে হারবে, কিন্তু ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংসের ঐ মেদস্ফীত দেহের মধ্যে নাদকার্নির বোলিং অম্লশূলের মত বিরাজ করেছে। ঐ ইনিংসেই ওরেল তাঁর ঘুমন্ত রানের রেকর্ড করেছেন যার উল্লেখ পূর্বে করেছি। নাদকার্নির বোলিংয়ের হিসেব—৬৭ ওভার বল, ২৮ মেডেন, ৯২ রান, ২ উইকেট।

দ্বিতীয় ইনিংসে সরদেশাইয়ের প্রশংসনীয় চেষ্টা সত্ত্বেও (৬০) ভারত গিবসের বলের সামনে জিভ বার করে দিল। গিবস পেলেন ৩৮ রানে ৮ উইকেট।—৫৩·৩—৩৭—৩৮—৮।

ব্যাপারটা সত্যই ঘটেছিল আমি এখনো বিশ্বাস করি না। এবং এই বিবরণ বিশ্বাস করা বা না করা পাঠকের হাতে।

দ্বিতীয় ইনিংসে তু'উইকেটে ১৪৯ রান করে ভারত তুপুরের ভোজ খেতে গেল। খুব কি গুরুভোজ হয়েছিল? কেউ কি 'ভাণ্ডারা' দিয়েছিল খেলোয়াড়দের? নচেৎ বাবুরা একের পর এক মাঠে নেমে প্যাভিলিয়ানে ফেলা-আসা ঘুমটাকে ফিরে পেতে অমন ব্যস্ত হলেন কেন? পূর্ব দিন সুরু করে এই দিন লাঞ্চ পর্যন্ত ৩৮ ওভার বল করেও যে গিবস কোনো উইকেট পাননি, লাঞ্চের পরে তাঁর রূপ—

"ল্যান্স গিবস ক্লান্ত সরদেশাই (৬০) ও মঞ্জরেকরকে (৫১) লাঞ্চের পরে মিনিটের ব্যবধানে ফিরিয়ে দিলেন, তার পাঁচ মিনিট পরে পাতৌদিকে, ফলে ভারতের ৫ উইকেটে ১৫৯।

"উমরিগর ও বোরদে ৩০ মিনিটের প্রতিরোধ আনলেন, কিন্তু উমরিগর বিদায় নেবার পরেই বাকি ব্যাটসম্যানেরা সুড় সুড় করে গিবসের ঝোড়ায় উঠে পড়ল। কী তুঃখের ছবি, অপমানের, মরি মরি কী ডিগবাজি!

"আটটা উইকেট খসে পড়ল গিবসের কাছে ১৫·৩ ওভারে, তার মধ্যে ১৪টা মেডেন, রান হয়েছে ৬! এক ঘণ্টা কুড়ি মিনিটের অবাক কাণ্ড!"

না, ভারতীয় খেলোয়াড়দের আমি দোষ দিতে পারি না—উইকেট

খারাপ না হতে পারে কিন্তু উইকেট লজিকেও যায় আবার ম্যাজিকেও যায়, আর ম্যাজিক দেখানো গিবসের অভ্যাসের মধ্যে। পাঠকরা ১৯৫০-৫১ সালে অস্ট্রেলিয়া-ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সিরিজ স্মরণ করুন,—সিডনির তৃতীয় টেস্টে গিবস ৪ বলে ৩ উইকেট নিলেন, এডিলেডে পরের টেস্টে আকস্মিককে স্বাভাবিক করে তুললেন হ্যাটট্রিক করে।

চতুর্থ টেস্ট ত্রিনিদাদের পোর্ট অব স্পেনে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথমে ব্যাট করতে নেমে দিনের শেষে—৬ উইকেটে ২৬৮। তার মধ্যে কানহাইয়ের ১৩৯ রানের সুমোহন রচনা। কিন্তু বাকি ব্যাটসম্যানেরা বিশেষ রসসুখ উপভোগ করতে পারেনি ভারতীয় বোলিংয়ের তাগিদে; দুরন্ত ডুরানী আঙুলে ঘা খেয়ে নম্র থাকলেও পিঠে-ব্যথা উমরিগর পেলেন ৩-৪৯, এবং বোরদে কোনো উইকেট না পেয়ে প্রমাণ করলেন ভালো বল উইকেট পায় এবং পায়ও না বটে। বোরদের নিষ্ফলা বোলিং প্রথম শ্রেণীর, ভারতের ফিল্ডিং প্রথম শ্রেণীতে প্রথম। পরদিন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৯ উইকেটে ৪৪৪ রানে ডিক্লেয়ার করল, তার মধ্যে দশম উইকেটে ওরেল-হলের ৯৮ রানের ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান রেকর্ড হয়েছে, যে রেকর্ড আগে ছিল ওরেল-রামাধীনের আয়ত্তে, ১৯৫৭ সালে নটিংহ্যামে, ৫৫ রানের।

প্রথম ইনিংসে ভারত আবার হলোৎপাটিত; মোট রান ১৯৭। হলের ৫ উইকেট --৯-৩-২০-৫।

দ্বিতীয় ইনিংসে ভারত সিরিজের সর্বোচ্চ রান করল, ৪২২। তার মধ্যে মেহরার ৬২, ডুরানীর সেঞ্চুরী (১০৪) এবং উমরিগরের জীবনের শ্রেষ্ঠ ইনিংস—১৭২ নট আউট।

তা সত্ত্বেও ভারত হারল ৭ উইকেটে। হারতে সে বাধ্য। কোনো ইনিংসে দুটো সেঞ্চুরী ও একটি ৬২ সত্ত্বেও যদি বাকি ৭ জন আন্তর্জাতিক খেলোয়াড় ৪৮ রান করে তাহলে দল হারেই।

পঞ্চম টেস্ট কিংসটনের সাবিনা পার্কে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ স্কুরু করে মাত্র ২৫৩ রানে নেমে গেল ভারতীয় বোলিংয়ের গুণে। ঐ রানের মধ্যে আবার সোবার্সের সেঞ্চুরী ছিল। এবারকার বীর রঞ্জনে—যিনি নির্বাচকদের মনোরঞ্জনে অপারগ হয়ে এতদিন দলের বাইরে ছিলেন। রঞ্জনের বোলিং—১৯'২-২-৭২-৪। রঞ্জনের ও ভারতীয় বোলিংয়ের প্রকৃতি—

"সত্যই অপূর্ব অনবদ্য ভারতের বোলিং,—যার শিখরে রঞ্জনে। এঁরা ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে ২৬২ মিনিটে শেষ করতে পেরেছেন। ঐ ইনিংস ৭৬ ওভার মাত্র টিকেছিল, সকল বোলারই সমবেতভাবে নিজেদের দায়িত্ব মানুষের মত পালন করেছে, যেখানে অপরদিকে ফিল্ডিংয়ের মান নীচুতে ছিল।…

"রঞ্জনে নতুন বলে চমৎকার বোলার। হাণ্ট, কানহাই, ওরেল, সোবার্সের জান নেওয়া কম কথা নয়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজে টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম পদার্পণে রঞ্জনে বিপুল কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

"উইকেট নিখুঁত, বোলাররা কোনই সাহায্য পাননি, কিন্তু তাঁরা একেবারে ধরাবাঁধা মাপে বল দিয়েছেন, তাতেই ব্যাটসম্যানেরা গত। এই সিরিজে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে সবচেয়ে কম রানে নামানোর গৌরব রঞ্জনের।"

যাই হোক ভারত আবার বৈরাগ্যের খেলা দেখাল। ঐ দিনের অবশিষ্ট সময়ে পাঁচটা উইকেট চলে গেল ৩৩ রানে, নবাগত লেস্টার কিং, রঞ্জনের উপর প্রতিশোধ নেবার জন্যই হয়ত, ২০ রানে পাঁচটি উইকেট ছিনিয়ে নিলেন।

ধন্য ভারত প্রথম ইনিংসে নেমে গেল ১৭৮ রানে। দ্বিতীয় ইনিংসেও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বিরাট রান করতে পারল না। তাদের ঐ ২৮৩ রান হত না যদি ওরেল ৯৮ (নট আউট) রানের 'অধিনায়কের ইনিংস' না দিতেন দলকে। এই ইনিংসেও ভারত 'সবিশেষ উল্লেখযোগ্য' বোলিং করল।

ভারত অবশ্য আবার হারল, এবার ১২৩ রানে, দ্বিতীয় ইনিংসে সে ২৩৫ রানের বেশী করতে পারেনি।

পাঁচটি টেস্টের একটা ছক তুলে ধরলাম ভারতীয় বোলিংয়ের দিকে চোখ রেখে। যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ অস্ট্রেলিয়াকে পিটিয়ে এসেছে, যারা কখনো বোলিংকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না, তাদের ঐভাবে বারবার পঙ্গু করে রাখল কিভাবে ভারতীয় বোলারেরা, যারা সকল সময় পরাজয়ের এবং নিজ দলের সামান্য রান-সঞ্চয়ের পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে বল করেছিল, এবং শেষ তিন টেস্টে যাদের সামনে ছিল অধিনায়কের অপসৃত মূর্তির বিমর্ষ শূন্যতা? আরও স্মরণ রাখতে হবে, ক্রিকেট-অভিজ্ঞ মাত্রেই জানেন, ফাস্ট বোলিংয়ের আঘাত নার্ভে না লাগলে স্পিনারদের পক্ষে সহজ সাফল্য মেলে না। যথার্থ ফাস্ট বোলিং ছ'ভাবে স্পিনারদের সাহায্য করে। প্রথমত তা গোড়ার দিকের কয়েকটি শক্ত খোঁটাকে উপড়ে দেয়, দ্বিতীয়ত, বাকি ব্যাটসম্যানদের এমনভাবে নাড়াচাড়া দেয় যে, তারা স্পিনারদের মধ্যে মুক্তি চায়। স্পিনাররা এমন পরিস্থিতিতে সত্যই মুক্তি দেয়, একেবারে চিরমুক্তি। ফাস্ট বোলিংয়ের হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছি, আত্মবিস্তারের সুযোগ এসেছে,—ব্যাটসম্যানদের এমন মানসিক উদ্‌ভ্রান্তির মুহূর্তের উপরে সুন্দর মৃত্যুকে টেনে দেন স্পিনাররা।

একথা বলাই বাহুল্য ফাস্ট-বোলারহীন ভারতীয় দলের স্পিনাররা ঐ ধরনের মানসিক বিভ্রান্তির কোনই সুযোগ পাননি, তবু তাঁরা কী আশ্চর্যভাবেই না সফল হয়েছিলেন,—কিছু ইতিহাস ইতিমধ্যে তুলে ধরেছি।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ধীর ব্যাটিংয়ের বিরুদ্ধে সমালোচনার উত্তরে ফ্রাঙ্কি ওরেল বললেন—কি করব, ভারতীয়দের বিরুদ্ধে এর চেয়ে দ্রুত রান করা যায় না, অস্ট্রেলিয়ানদের অপেক্ষাও এদের বিরুদ্ধে রান করা শক্ত।

ভারতীয় বোলিংয়ের আর কী প্রশংসা সম্ভব?

বোলিং ছাড়াও ভারতীয় ফিল্ডিং প্রশংসা পেল প্রচুর। এ রকম ফিল্ডিং নাকি কদাচিৎ দেখা গেছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজে। তবু ভারত হারতে বাধ্য, তার নানা কারণের কোনো কোনোটির উল্লেখ আগেই করেছি। ওয়েস্ট ইণ্ডিজপক্ষে ঐ কারণগুলির নাম—ওরেল, হল, কানহাই, সোবার্স, গিবস। আগে ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান কারণগুলির কথা সামান্যভাবে ব্যাখ্যা করে নেওয়া যাক। কানহাই, সোবার্সকে এখানে বাদ দিচ্ছি, মেনে নেওয়া যাক এঁরা এমন দুজন ব্যাটসম্যান যাদের চেহারাকে পর্যন্ত বোলাররা মাঠে ঘৃণা করেন। যে কোনো সময়ে যে কোনো পরিস্থিতিতে এঁরা হিংস্র। এঁদের মুখ প্যাভিলিয়ানের দিকে না ফেরা পর্যন্ত বিপক্ষের ভাগ্যের মুখ ফেরে না।

কিন্তু ওরেল? যাঁর হবার কথা নয় সেই সাঁয়ত্রিশ বছরের ওরেলও যদি দলের ব্যাটিংয়ের এতবড় নির্ভরদণ্ড হয়ে ওঠেন! ওরেলের ক্রিকেট-বোধ, দল-পরিচালনায় বুদ্ধি, বোলিং-সামর্থ্য, এসব না হয় বাদ দিলাম। ব্যাটিংয়ের দিক দিয়ে দেখা যাক তিনি কিভাবে দলকে বাঁচিয়েছেন, জয়কে করেছেন অনিবার্য।

যেমন ওরেলের সেই কুৎসিত ব্যাটিং তৃতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে—যখন তিনি নির্বোধ অনড়তায় উইকেটে পড়ে থেকেছিলেন। প্রাণবন্ত খেলার মেসায়া ওরেলের কাজে ও কথায় এত পার্থক্য কেন? কারণ—ওরেল নিজ দলের রাবারকে সুনিশ্চিত করতে চাইছিলেন, কিছু নিন্দার বিনিময়েও তা করতে প্রস্তুত ছিলেন। ভারতীয় দলের অন্তর্নিহিত শক্তি সম্বন্ধে ওরেল সচেতন ছিলেন বলেই তাদের বিশ্বাস করেন নি। শুধু রান বাড়ানো নয়, কালহরণও তাঁর প্রয়োজন ছিল—কালহরণ করে এবং যত ধীরেই হোক রান বাড়িয়ে নিজ দলের ঐ জয়কে পাওয়া চাই। ওরেল জানতেন, ভারতীয় খেলোয়াড়রা হলের বিরুদ্ধে ঠেকিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারবে না, তারা মেরে যাবেই; অল্প রানের ব্যবধানে খেলাকে জীবন্ত রাখলে নিজেদের হারবার সম্ভাবনা থেকে যায়, সুতরাং রানের ভার চাপিয়ে সময়ের সীমাকে

সংকীর্ণ করলে ভারতীয় দল হারবে, হেরেও ছিল, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ওরেলের চেষ্টার জোরেই প্রথম ইনিংসে ৪০০ রান করল এবং তার ফল—ভারতের ইনিংসে পরাজয়।

তৃতীয় টেস্টে ভারতকে হারাবার ব্যবস্থা করে ওরেল যেমন রাবার নিরাপদ করেছিলেন, তেমনি এই ওরেলই পঞ্চম টেস্টে ভারতকে পরাভূত করার ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা নিলেন ব্যাটিংয়ে, যার ফলে পর পর পাঁচটি টেস্ট জেতার অভূতপূর্ব গৌরব তাঁর করায়ত্ত হল। পঞ্চম টেস্ট সব সময়ই খোলা ছিল দুই পক্ষে,—ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংসে ওরেলের ৯৮ নট আউট ভিন্ন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জিততে তো পারতই না, বরং হারের দিকে নিশ্চয়তা। বিপদের মুখে ওরেলের সেনাপতির তরবারি পথ কেটে পরিষ্কার করে দিল।

আর হল! ওয়েসলে হল ভবিষ্যতে 'সফরকারী ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের পুরস্কারস্বরূপ কার্ল নুয়েন্স ট্রফি লাভ' করবেন। হল অবশ্যই পুরস্কারের যোগ্য—তিনি ঐ টেস্ট-পর্যায়ে ২৭টি উইকেট পেয়েছেন ৪২৫ রানে (অ্যাভারেজ মোটামুটি ১৫ রানে এক উইকেট)। টেস্টে সত্যই বিস্ময়কর বোলিং। কিন্তু আমি একথা বলতে বাধ্য, ভারতীয় খেলোয়াড়রা যদি তাঁদের স্মরণশক্তি একেবারে হারিয়ে না ফেলেন তাহলে তাঁরা ঐ ট্রফির দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেবেন। ফাস্ট বোলিংয়ের সামান্য নমুনা—

দ্বিতীয় টেস্ট, প্রথম ইনিংস। "নাদকার্নি ফাস্ট বোলারদের হাতে কতকগুলো কদর্য আঘাত পেলেন দেহে, কিন্তু তিনি বীরের মত সহ্য করলেন। হল বুনো ও বর্বরভাবে বল করছিলেন।"

"কণ্ট্রাকটার ও জয়সীমা হল ও স্টেয়ার্সের বিরুদ্ধে ইনিংস আরম্ভ করলেন। হলের একটি দ্রুত লাফানো বল মাথার চুল ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। তার পরের বলটিকে জয়সীমা সুন্দরভাবে গ্লাইড করে বাউণ্ডারী করলেন।...হল দ্বিতীয় ওভারটি নষ্ট করলেন মাথার উপরে এবং উইকেটের বাইরে বাম্পার ছুঁড়ে।...

"স্মৃতি হলের বলে ডুব দিতে গিয়ে বুকে জঘন্য মার খেলেন।"

ঐ টেস্টে ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস। "হল বুদ্ধিমানের মত বল করেছেন। তিনি ভালোর সঙ্গে মন্দ মিশিয়েছেন। একদম সোজা শরীর লক্ষ্য করে ছোঁড়া বল এবং মাথার দিকে লাফিয়ে ওঠা বল—এই দু-ধরনের বলের চমৎকার মিশ্রণ দেখা গিয়েছে। এই ব্যাপারটা সকল ব্যাটসম্যানকে ওলট-পালট করে দিয়েছে।

তৃতীয় টেস্টে কণ্ট্রাকটারের মুমূর্ষু শরীরের দিকে তাকিয়ে হল কোনো বাম্পার বা বীমার দেন নি, সেটাও একটি বড় সংবাদ হয়েছে। ভারতের প্রথম ইনিংস: "ব্যাটসম্যানেরা একজন মনমরা হলকে দেখলেন যিনি শরীর আক্রমণ করতে অস্বীকৃত এবং মাত্র উইকেট আক্রমণে নিরত।" দ্বিতীয় ইনিংস: "এই ইনিংসেও হল ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের মনোবল নাশের মত কিছুই করেন নি।"

কিন্তু চতুর্থ টেস্ট, কিংবা পঞ্চম টেস্ট? বলাবাহুল্য হল তাঁর 'মনমরা' ভাব কাটিয়ে উঠেছিলেন। পৌনঃপুনিক ইতিহাসের উদ্ঘাটনে কি প্রয়োজন আর?

দেখা যাচ্ছে হলের সামুদ্রিক ঝটিকায় হতাহতের ও ক্ষতির পরিমাণ কল্পনাতীত। তবু ক্ষতিপূরণের জন্য ক্ষতির হিসাব চাইই। লণ্ড-ভণ্ড ব্যাটিংয়ের কিছু পরিসংখ্যান—

প্রথম টেস্টে	প্রথম ইনিংসে ৯ জন খেলোয়াড়ের রান—	৬৩
	দ্বিতীয় ইনিংসে ৯ জন খেলোয়াড়ের রান—	৪৪
দ্বিতীয় টেস্টে	দ্বিতীয় ইনিংসে ৬ জন খেলোয়াড়ের রান—	৪০
তৃতীয় টেস্টে	প্রথম ইনিংসে ৬ জন খেলোয়াড়ের রান—	৪৭
	দ্বিতীয় ইনিংসে ৮ জন খেলোয়াড়ের রান—	২৫
চতুর্থ টেস্টে	প্রথম ইনিংসে ৮ জন খেলোয়াড়ের রান—	৪৫
	দ্বিতীয় ইনিংসে ৭ জন খেলোয়াড়ের রান—	৪৮
পঞ্চম টেস্টে	প্রথম ইনিংসে ৮ জন খেলোয়াড়ের রান—	৩০
	দ্বিতীয় ইনিংসে ৫ জন খেলোয়াড়ের রান—	১১

শ্রীযুক্ত হীরালাল বাজনাথ সুন্দরভাবে হিসাবটি তুলে ধরেছেন—

"পাঁচটি টেস্ট ম্যাচে ভারতের প্রথম ইনিংসে ৩৩ উইকেটে হয়েছে ২২২ রান, এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৫ উইকেটে হয়েছে ১৯৭ রান। সবশুদ্ধ ৬৮ উইকেটের বিনিময়ে ৪১৯ রান।"

এই সকল উইকেটের গড় রান প্রায় ৭।

এঁদের মধ্যে ব্যর্থতার গৌরবে অগ্রণী ছিলেন জয়সীমা, ওয়েস্ট ইণ্ডিজে যাঁর শুভ গমন ফাস্ট বোলিং রুখতে; তার পরেই মঞ্জরেকের, ফাস্ট বোলিংয়ের তাপে যিনি পরিপক্ক। জয়সীমা ৮ ইনিংসে করলেন ১১৭ রান, গড় ১৪'৫ এবং মঞ্জরেকর ১০ ইনিংসে ১৬৪ রান, গড় ১৬'৪ রান। অথচ এঁদের কাঁধেই ভারতমাতার পালকি চড়ানো।

জয়সীমা ও মঞ্জরেকরের খেলা দেখে উত্ত্যক্ত সমালোচকের মন্তব্য কালব্যবধানে কৌতুকরসের উপাদান জোগাবে বলেই আমার বিশ্বাস। সুতরাং পাঠকদের আনন্দবিধানের জন্য তার কিছু অংশ হাজির করছি।

দ্বিতীয় টেস্ট, দ্বিতীয় ইনিংস। "জয়সীমা শিশুর মত ব্যাট করতে লাগলেন। প্রতি বলে তিনি সরে যেতে লাগলেন, ফলে মিডল ও লেগস্টাম্প উন্মুক্ত রইল। একথা স্পষ্ট হয়ে উঠল ভারত একজনকে বাদ দিয়েই খেলছে। হলের বলে পালাবার কালে যখন জয়সীমার লেগস্টাম্প উপড়ে গেল তখন বিস্ময়ের কিছু ঘটল না।"

তৃতীয় টেস্টে প্রথম ইনিংসে জয়সীমা ৪১ রান করেছেন। "আমি আবার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলছি, জয়সীমার আজকের ইনিংস সত্ত্বেও, জয়সীমা ওপেনিং ব্যাটসম্যান নন। তিনি নিছক ভাগ্যবলে শেষের ৩৭ রান করতে পেরেছেন।"

দ্বিতীয় ইনিংস। "জয়সীমাও আজ ব্যাট করেছিলেন। তিনটে বল পর্যন্ত খেলতে পেরে তিনি নির্বাচকদের জানিয়ে দিলেন—তিনি মোটেই ওপেনিং ব্যাটসম্যান নন।"

চতুর্থ টেস্ট, প্রথম ইনিংস। "জয়সীমা নিজের পুরনো রীতি মক্‌সো করে আউট-সুইঙ্গারের পিছনে ধাওয়া করলেন। শীঘ্রই তিনি এ ব্যাপারে তাঁর সহযোগী খেলোয়াড় মঞ্জরেকরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।"

দ্বিতীয় ইনিংস। "আমি আর একজন ব্যাটসম্যানকে দেখবার অপেক্ষায় আছি, অবশ্য জয়সীমাকে বাদ দিয়ে, যে ব্যক্তি জয়সীমার মত মাঠ থেকে তিন ফুট বাইরে সরে যাবে মাটি থেকে ৬ ইঞ্চি উঁচু বল মারতে এবং সেই বলে কাস্তে চালাবে ক্ষেপে গিয়ে। জয়সীমা ভালই সুরু করেছিলেন কিন্তু দশ মিনিট পরে হঠাৎ আউট-সুইঙ্গারের পিছনে ছুটে ব্যাটের পাখা চালাতে লাগলেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে, উইকেটের বাইরে হোক ভিতরে হোক জয়সীমাকে তাড়ু চালিয়ে যেতেই হবে, তার পরিণতি যাই হোক না কেন, যে অবস্থাতেই থাক না ভারত,—আরও সংক্ষেপে—জয়সীমার মনোগত বাসনা ছাপমারা দর্শক-ব্যাটসম্যান হওয়া।"

পঞ্চম টেস্ট, প্রথম ইনিংস। "জয়সীমা ৬ মিনিট টিকেছিলেন।"

দ্বিতীয় ইনিংস। "ভারতের ইনিংসসূচনা হোল জয়সীমা ও মেহরাকে দিয়ে। পনেরো মিনিট পরে প্রথম বিপত্তি ঘটল যখন জয়সীমা কিং-এর একটি বলের পিছনে উইকেট ছেড়ে ছুটলেন, যে বলটি কিন্তু সারাক্ষণ নীচু হয়ে তাঁর দিকে এসেছে। এর আগে জয়সীমা সৌভাগ্যবশত হলের বলের স্পর্শদোষ এড়িয়েছেন, যদিও আউট-সুইঙ্গারে ব্যাট বুলানোর চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না।"

এই জয়সীমা। এই জয়সীমার ভাই মঞ্জরেকর। জয়সীমা ও মঞ্জরেকরকে রাখতেই হবে কোনো সুদিনের প্রত্যাশায় কিংবা গোলমাল এড়াবার সুবিধাবাদে—তরুণ অধিনায়ক পাতৌদির এই ছিল মনোভাব। তৃতীয় টেস্টে ভারত যখন ইনিংসে হারল, জয়সীমা দ্বিতীয় ইনিংসে গোল্লা করলেন (সে পর্যন্ত তাঁর ব্যাটিয়ের হিসাব : ২৮—১১, ৪১—০), খেলার শেষে পাতৌদিকে জিজ্ঞাসা করা হল,

'তুমি কি এখনো জয়সীমাকে ওপেনিং ব্যাটসম্যান রাখতে চাও?' পাতৌদি উত্তর দিলেন,—'নিশ্চয়, সেই সুরু করবে, তার কীর্তিতে আমি বিশেষ সুখী।'

কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। তা সত্ত্বেও পঞ্চম টেস্টের পরে শ্রীযুক্ত বাজনাথ লিখলেন,—

"এই ভারতীয় দল যুদ্ধোত্তর কালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরকারী দলসমূহের মধ্যে, আয়ান জনসনের অস্ট্রেলিয়ান দলকে বাদ দিলে, নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম।...এই দলে ১৪ জন উল্লেখযোগ্য ব্যাটসম্যান এবং ৯ জন গণ্য বোলার ছিল।"

ভদ্রলোক কি রসিকতা করেছেন আমাদের দেশপ্রীতিতে সুড়সুড়ি দিয়ে? না, তা যে নয়, তার প্রমাণরূপে ভারতীয়দের বোলিং-সাফল্যের রূপ তুলে ধরেছি আগে। তারপর দিয়েছি ব্যাটিং-ব্যর্থতার কারণ ও ইতিহাস। ব্যাটিং-সাফল্যের চেহারা এবার দেখানো উচিত। তার আগে অপ্রত্যাশিত আঘাতের উল্লেখ করা দরকার। অভাবিত স্থান থেকে তা এসেছিল। আহত দলটির ক্ষতস্থানে স্বয়ং আম্পায়ার ন্যায়বিচারের লবণ-সঞ্চার করেছিলেন।

আম্পায়ারের সাধুতায় সন্দেহ করছি না, করবার কোনো কারণ নেই, দুঃখ করছি বিচারের নিম্নমানের জন্য, যার ফলে, আকস্মিক ভাবেই নিশ্চয়, ভারতকে নিম্নমুখী হতে হয়েছে বেশীবার। ওয়েস্ট ইণ্ডিজকেও ক্ষতিস্বীকার করতে হয়নি তা নয় কিন্তু ভারতের দুর্ভোগ পরিমাণে বেশী, যে-ভারত তুলনায় দুর্বল এবং প্রাণপণে দু-'র্বলতা' ব্যাধি থেকে নিরাময় হতে চাইছে।

প্রথম টেস্টে ফেরা যাক। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতের রান সর্বসমেত ৯৮। এমন একটা বিপর্যয়ের মূলে—হলের প্রচণ্ড বোলিং, ভারতের জঘন্য ব্যাটিং এবং আম্পায়ারের অনিচ্ছার ভ্রান্তি। তরুণ সরদেশাই তখন চমৎকার ফর্মে। প্রথম ইনিংসে অল্প রানে আউট, মনোগত বাসনা, ক্ষতিপূরণ করবেন দ্বিতীয় ইনিংসে। হায়, সরদেশাই

হলের বলে স্মিথের হাতে মাত্র ২ রানে কট। কিন্তু সত্যই যদি কট হতেন! হলের লেগের দিকের উঠতি বলে সরদেশাই গ্লাইড করার চেষ্টা করেও বলে ব্যাট লাগাতে পারেন নি, বল চলে গেল স্মিথের গ্লাভসে, ফিল্ডার ও দর্শক বিটকেল চেঁচাল সমস্বরে—সরদেশাই নন, আম্পায়ার কট হলেন তাতে। আম্পায়ারের বিভ্রান্তির ফলভোগ করতে হল ভারতকে।

দ্বিতীয় টেস্টকে সহজেই আম্পায়ারের টেস্ট বলা চলে। প্রথম টেস্টের পরাভূত ভারত দ্বিতীয় টেস্টে হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারে বদ্ধপরিকর। সূচনাও প্রত্যাশামত, সমাপ্তিও হতাশাজনক নয়—প্রথম ইনিংসে ভারতের ৩৯৫। এই রানসংখ্যায় বোরদের ৯৩, নাদকার্নির ৭৮ নট আউট, ইঞ্জিনীয়ারের ৫৩ উল্লেখযোগ্য। এর সঙ্গে যোগ করতে হবে উমরিগরের ৫০। এসব সত্ত্বেও এই টেস্টে ভারত ইনিংসে হেরেছে—নিশ্চয় এভাবে হারত না যদি প্রথম ইনিংসে তাদের কয়েকজনকে বিনা দোষে প্যাভিলিয়ানের পথ দেখিয়ে দেওয়া না হোত! দুজনের নাম করা যাক, উমরিগর ও ডুরানী। উমরিগর এই মাঠে গত সফরে ১১৭ রান করেছিলেন, তারই স্মৃতি তাঁর চওড়া ব্যাট রোমন্থন করে চলল পঞ্চাশ পর্যন্ত—এখানেই থামার লক্ষণ নেই—তিনি পরমানন্দে খেলছেন—হঠাৎ দর্শকেরা চমকে দেখল আম্পায়ারের হাত উঠে গেছে সোবার্সের আবেদনে। দর্শকেরা চীৎকার করে বলল—না না, উমরিগর আউট হতেই পারেন না, সোবার্সের বল ব্যাটেই ঠেকেনি, কিন্তু আম্পায়ার মহানুভব।

আম্পায়ার কোলে প্যাভিলিয়ানে গিয়ে বললেন, কে বললে উমরিগর কট-বিহাইণ্ড হয়েছে—আমি তাকে লেগ-বিফোর দিয়েছি। আম্পায়ার মাঠে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ চিন্তা করেছিলেন তিনি কি আউট দিয়েছেন।

ডুরানী চমৎকার খেলছেন, ১৭ রান করেছেন সাবলীলভাবে, হলের বল, হল আবেদন জানালেন এল বি'র। আম্পায়ার ডেভিস

উত্তরে পকেটে হাত পুরে নির্বিকার দাঁড়িয়ে রইলেন—কে বললে আউট ? কিন্তু আবার ভাবলেন—না, বোধহয় আউট, নিশ্চয় আউট—আউট দেওয়াই ভাল—পকেট থেকে বের করে হাত আকাশে তুললেন। ডুরানী গোটা নাটকটি দেখে ট্রাজিক রসে আপ্লুত হয়ে গ্রীনরুমে ঢুকে পড়লেন।

এই টেস্টের তৃতীয় দিনে আম্পায়ার শ্রীযুক্ত কোলেকে পুলিশ-পাহারায় মাঠ ত্যাগ করতে হল। এবার তাঁর উর্ধ্ববাহু খোঁচা দিয়েছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে। জ্যামাইকার ভদ্র দর্শক ভারতের ক্ষতিতে পূর্বে সরবে প্রতিবাদ করেছে, এবার নিজেদের ক্ষতির কালে চেঁচানির সঙ্গে ঠেঙানি মেশাতে চাইল। ঘটনা ?—

সোবার্স ও সলোমন খেলছিলেন, বেশ খেলছিলেন, ৩২০ রানের মাথায় সলোমন খুচরো রান নিতে চাইলেও সোবার্স তাঁকে ফিরিয়ে দিলেন। ইঞ্জিনীয়ার ইতিমধ্যে উইকেট ভেঙে দিয়েছেন, কিন্তু হায়, শুধু হাতে। তবু সেই শূন্য হস্তের পুণ্য কর্মে বিমোহিত আম্পায়ার কোলে সানন্দে হস্তোৎক্ষেপ করলেন এবং তা দেখে ততোধিক মোহিত দর্শকেরা হস্তোৎক্ষেপে শূন্য বোতলে মাঠ পূর্ণ করতে লাগল, এবং তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে শ্রীকোলের অঙ্গমর্দনের জন্য খেলা-শেষে ধাওয়া করল তাঁর পিছনে।

সলোমনকে অকারণে আউট দেবার জন্য আম্পায়ার কোলে নিশ্চয় সারারাত বিবেকদংশন অনুভব করেছেন। তাই পরদিন ক্ষতিপূরণ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে তিনি লাঞ্চের আগে সোবার্সের বিরুদ্ধে নাদকার্নির আবেদনে সাড়া দিলেন না, যে আবেদনে ধরা দিতেন অন্য যেকোনো আম্পায়ার, এবং স্বয়ং আম্পায়ার কোলে অন্য যেকোনো সময়ে।

না, এখনো হয়নি, 'সামান্য ক্ষতি' এত সহজে পূরণ হয় না। ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসে সোবার্সের লেগব্রেক মঞ্জরেকরের লেগ-স্টাম্পের বাইরে পড়ে তাঁর পায়ে লাগল। আম্পায়ার কোলে মশাই

মনে মনে অর্ডিন্যান্স জারী করে এম সি সি'র নিয়মের সংশোধন করলেন, তারপরে মঞ্জরেকরকে আউট দিলেন—এল বি ডবলিউ।

সে কাহিনীটি কিন্তু এখনো ভাল করে বলা হয়নি, যদিও উল্লেখ করেছি ইতস্তত, এবং বিক্ষিপ্তভাবে তা আমার অনেক পাঠকেরই জানা আছে। কণ্ট্রাকটার এক টুকরো কালো কাপড় ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন ভারতীয়দের চোখের সামনে। খেলায় আহত হওয়াটা আশ্চর্য নয়, দাবা খেলতে খেলতেও অ্যাকসিডেন্ট হতে পারে, কিন্তু তবু—

ওপেনিং ব্যাটসম্যান ও অধিনায়ক কণ্ট্রাকটার মাথার উপর থেকে সরে গিয়ে সত্যই দলকে ছিন্নশির করে গেছেন।

ভয়াবহ কয়েকটি দিন—শুধু স্মরণেই শীতল স্রোত বয়ে যায় শিরদাঁড়ায়।

বার্বাডোজের সঙ্গে খেলায় গ্রিফিথ বল ছুঁড়ছিলেন; বলের জোরের সঙ্গে ছোঁড়ার জোর—বিকট কাণ্ড। গ্রিফিথ যে বল ছোঁড়েন সকলে জানে, বিশেষত ইংরেজ কাগজওয়ালারা। তাদের হৈ চৈ-এ গ্রিফিথ ইংলণ্ডে আগের সফরে শেষের টেস্টগুলিতে খেলতে পান নি। কিন্তু তার দ্বারা বার্বাডোজে গ্রিফিথের স্থানাভাব হয়নি, অথবা তাঁর বল-ছোঁড়া নিজের অধিনায়ক বা আম্পায়ারের মনে বিকার ঘটায়নি।

কণ্ট্রাকটারের সঙ্গে সূর্তি খেলছিলেন। বলের ধরন দেখে অধিনায়কের দিকে এগিয়ে এলেন। বললেন, এ কি, আপনি প্রতিবাদ করছেন না? কণ্ট্রাকটার বললেন, করব, ওভারটা শেষ হোক। ওভার শেষ হবার আগেই কণ্ট্রাকটারের ক্রিকেট-ওভার শেষ হয়ে গেল।

কণ্ট্রাকটার স্বয়ং বিবরণ দিয়েছেন—

"প্রথম বল আমার কানের পাশ দিয়ে ছুটে গেল। দ্বিতীয়

বল কাঁধের উপর দিয়ে। [redacted]য় বল এগিয়ে আটকালাম। চতুর্থ বলটি বাম্পার, গ্লাভ[redacted] মিড অনে চলে গেল। পঞ্চম বলটি দেখতেই পেলাম ন[redacted]খেছিলাম যে, গ্রিফিথ ছুটে আসছে কিন্তু সে হাঁটু দুটো এমনভাবে বাকিয়ে এগিয়ে আসে যে, বল দেখা শক্ত। এ ক্ষেত্রে আদপে দেখতেই পাইনি, শুধু বুঝতে পারলাম একটা প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে, নাক ও কান দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।"

বলটি বেলের সমান উঁচু ছিল? একদম বাজে কথা, কণ্ট্রাকটার বললেন।

ক্রিকেট-ইতিহাসের রক্তাক্ত একটি পৃষ্ঠা উল্টে দেখার সময়ে আজ আমি ভাববার চেষ্টা করছি—সেদিন ঘটনাটি ভারতীয় খেলোয়াড়দের মনে কি ধরনের প্রভাব বিস্তার করেছিল,—সবটা আমার পক্ষে ধারণায় আনা সম্ভব নয়,—যেটুকু আসছে তাতেই শিউরে উঠছি আতঙ্কে।

শনিবার কণ্ট্রাকটারের ডান কানের পিছন দিকে গ্রিফিথের বল ঘা দিল। নাক ও কান দিয়ে রক্তপাত হলেও সেটা কতটা মারাত্মক অবিলম্বে বোঝা যায়নি। কিন্তু অবস্থা ক্রমেই বেড়ে চলল। ভাল করে পরীক্ষার পরে দেখা গেল অবস্থা বিপজ্জনক, মাথায় খুলির হাড়ে ফাটল, ভিতরে রক্তপিণ্ড, জমাট রক্ত দেহযন্ত্রকে বিকল করার পথে। পরিত্রাণের উপায় মস্তিষ্কে অপারেশন, যার পরিণতি অনিশ্চিত।

কণ্ট্রাকটারকে জানানো হল তা। এও জানানো হল—বিঘ্নসঙ্কুল অপারেশন ছাড়া পথ নেই। কণ্ট্রাকটার শান্তভাবে শুনলেন, রাজী হলেন, দায়িত্বপত্রে সই দিয়ে টেবিলে শুলেন, ডাক্তার লোকেরা দু'ঘণ্টা ধরে অস্ত্রচালনা করে রক্তপিণ্ডটিকে উঠিয়ে নিলেন।

অপারেশনের সাত ঘণ্টা পরেও ডাক্তার বললেন, ৪৮ ঘণ্টা না কাটলে সঠিক কিছু বলা যায় না, যদিও নাড়ীর গতি স্বাভাবিক, গাত্রতাপও তাই।

ঐ ৪৮ ঘণ্টা কথাটা যে ডাক্তারীর বাঁধা বুলি ছিল না অচিরে তা

প্রমাণিত হল। কণ্ট্রাকটারের ভালো অবস্থা ক্রমেই মন্দের দিকে চলতে লাগল। তার ফলে ত্রিনিদাদের বিশেষজ্ঞ অস্ত্রোপচারক ডাঃ ঘোরলালের ঘরে নিশীথরাত্রে টেলিফোন বাজল—ডাঃ ঘোরলাল মানবতার ডাকে সাড়া দিয়ে সকাল সাড়ে নটার মধ্যে উড়ে এলেন, পরীক্ষা করে দেখলেন আবার রক্ত জমাট বাঁধতে সুরু করেছে, কোমর থেকে নিম্নাঙ্গে তার ফলে দেখা দিয়েছে পক্ষাঘাতের লক্ষণ—দুপুর দেড়টার সময়ে ডাঃ ঘোরলাল অপারেশনের ছুরি তুলে নিলেন।

দু'ঘণ্টা পরে যখন অপারেশন টেবিল থেকে সার্জন হাত তুলে নিলেন, তখনো কণ্ট্রাকটারের জীবন অন্ধকারের মধ্যে, তখনো দাঁড়িয়ে আছে তাঁর খেলোয়াড় ভাইয়েরা তাঁর চারপাশে ঘিরে। তারা তাদের প্রিয় অধিনায়ককে আনুগত্য দিয়েছে, ভালবাসা দিয়েছে, শঙ্কাতুর হৃদয়ের আশ্রয়ে তাঁকে জড়িয়ে রাখতে চেয়েছে এবং সর্বশেষে অধিনায়কের নিভে-আসা জীবনদীপে দিয়েছে রক্তের স্নেহরস। রক্ত দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে সকলেই এগিয়ে এসেছিল। দিনে তারা ক্রিকেট খেলেছে,—কণ্ট্রাকটার আহত হবার পরেও গ্রিফিথ বাম্পার থামায় নি, তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে—বেদনায় আশঙ্কায় কাটিয়েছে নিদ্রাহীন নিশা—তারপর মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থেকেছে অধিনায়কের জীবনযুদ্ধের সামনে।

তার মধ্যে সবচেয়ে অতন্দ্র ছিল একটি স্নেহবিহ্বল পিতৃনয়ন শয্যাশিরে। কণ্ট্রাকটারের আঘাতের পরে ৩০ ঘণ্টা কেটে গেলেও ম্যানেজার গোলাম আমেদের চোখে ছিল না ছিটামাত্র নিদ্রা, মুখে ওঠেনি সামান্যতম খাদ্য। সেই শ্রেষ্ঠ নেতা যে ভালবাসায় গোলাম।

কিন্তু একজনের কথা আমরা ভুলে গেছি, কণ্ট্রাকটারের জীবনের সঙ্গে যাঁর জীবন ঘনিষ্ঠতম বন্ধনে বাঁধা—শ্রীমতী কণ্ট্রাকটার। তাঁর উদ্বেগ, তাঁর ব্যথিত ব্যাকুলতার পরিমাপ করবে কে? সামান্য একটি সংবাদ বেরিয়েছিল কাগজে—নরী কণ্ট্রাকটার গ্রিফিথের বলে আহত, —সামান্য সংবাদ, এমন কিছু মনযোগযোগ্য নয়। তার পরদিন হঠাৎ

কাগজ শিউরে উঠল অজস্র সংবাদে—'কন্ট্রাকটারের অবস্থার উন্নতি,' 'জটিল অস্ত্রোপচারের পরে শান্তিতে রাত্রিযাপন', 'প্রাণহানির আশঙ্কা হ্রাস'—প্রথমের টুকরো খবর আর পরবর্তী বৃহৎ খবরের মধ্যে যে সুবৃহৎ ইতিহাসটি চাপা ছিল তা কিভাবে আঘাত করেছিল দূরবর্তী জীবনসঙ্গিনীকে!

শ্রীমতী ডলি কন্ট্রাকটার উড়ে চললেন বার্বাডোজের পথে। কে না জানে তাঁর ব্যাকুলতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উড়তে পারেনি অতি দ্রুতগতি বিমানও। লণ্ডনের বিমানঘাঁটিতে খবরের কাগজ দেখানো হল তাঁকে, তাতে লেখা আছে, নরীর অবস্থা ভালোর দিকে। ডলি বললেন আবেগকম্পিত কণ্ঠে—এতক্ষণে সংবাদ পেলাম—কী অপূর্ব সংবাদ! করুণ কণ্ঠে ডলি আবার বললেন—বার্বাডোজ থেকে বোম্বাইয়ে সংবাদ আসতে যেন যুগযুগান্তর লাগে।

ডলি কন্ট্রাকটারের মনের চেহারা, যাতনার প্রকৃতি বুঝতে পারব আর একটি অনুরূপ আকার থেকে। প্রায় একই কালের কথা।

লুসি অজ্ঞান হয়ে পড়ল টেলিভিসন দেখতে দেখতে। তেইশ বছরে লুসি হাসপাতালে পাগলের মত চীৎকার করে কেঁদে উঠল, আবার মূর্চ্ছিত হল, গলায় ঝোলানো সোনার ক্রুশটিকে মুচড়ে ধরে হাহাকার করে কাঁদল- আমার পুরুষ, আমার মানুষ নেই, আমি সঙ্গে যাব, আমাকে ছেড়ে দাও···দাও বলছি······।

কন্ট্রাকটারের আঘাতের ঠিক সাতদিন পরে আর এক শনিবারে, ১৯৬২ সালের মার্চ মাসের ২৪ তারিখে কিউবার মুষ্টিযোদ্ধা কিড-প্যারেট বিশ্ব ওয়েল্টার চ্যাম্পিয়ানশিপের খেলায় দ্বাদশ রাউণ্ডে ভারজিন দ্বীপের এমিল গ্রিফিথের মুহুর্মুহু ঘুষিতে অচৈতন্য হয়ে পড়েন। আঘাতকারী এখানেও জনৈক গ্রিফিথ!

বক্সিং রিং-এ সহস্র সহস্র হিংসালোলুপ দর্শকের সামনে হারানো চৈতন্য হাসপাতালের সেবাশুভ্র শয্যার আশ্রয়েও ফিরে এল না। এগারো দিন আগে সে নিজের পঁচিশতম জন্মোৎসব পালন করেছে,

তার স্ত্রীর গর্ভে রয়েছে তার দ্বিতীয় সন্তান—সেই কিড প্যারেটের মাথায় দীর্ঘস্থায়ী অপারেশন করা হল। কিন্তু লুসি প্যারেট ডলি কন্ট্রাকটারের মত সৌভাগ্যবতী নন।

"দশদিনব্যাপী অচৈতন্য অবস্থার পর প্যারেট মারা গিয়াছে। টেলিফটোতে আর হতভাগ্য মুষ্টিযোদ্ধার ফোলা চোখ, মুখে অক্সিজেন পাইপসহ অসহায় অবস্থায় শায়িত চিত্র দেখিতে হইবে না। দিনের পর দিন তাঁহার স্ত্রী সন্তানসহ হাসপাতালে প্যারেটের শয্যাপার্শ্বে থাকিয়া যে নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিল, তার অবসান হইল।…

"তাহারা রক্ত দেখিতে চাহিয়াছিল, তাহারা মৃতদেহ পাইল।"

কঠিন কথা। ক্রিকেট এখনো মুষ্টিযুদ্ধের রক্তপিপাসায় ওঠেনি, —এও জানি পুরুষের যে কোনো ক্রীড়াকর্মের মধ্যে ঝুঁকি নামক ব্যাপারটা থাকবেই,—ওয়াশব্রুক বা গডার্ডের অভিমত আমরাও স্বীকার করি—বাম্পার একেবারে নিষিদ্ধ করে দেওয়া উচিত নয়— কিন্তু যখন সত্যই 'খুলিকে উইকেট' করা হয় কিংবা খেলাকে করা হয় যুদ্ধ?

খেলার মাঠ থেকে কন্ট্রাকটারের মত খেলোয়াড়ের বিদায় যেন যে কোনো মূল্যে জিগীষাকে মূল্যবান করবার প্রবৃত্তি থেকে আমাদের দূরে রাখে।

কন্ট্রাকটারের আঘাতের ছবি তুলে আনলাম এই জন্য যে, তার দ্বারা 'ব্যর্থ ভারতীয় ব্যাটিংয়ের' মধ্যে সামর্থ্য-চিহ্নগুলি অধিকতর বর্ণবহুল হয়ে উঠবে। তারা সকলেই কোনো না কোনো সময়ে জেগে উঠেছিল, তেমন কতকগুলি নাম—ডুরানী, নাদকার্নি, সরদেশাই, মেহেরা, পাতৌদি, বোরদে, সূর্তি, ইঞ্জিনীয়ার। এঁরা সকলেই অংশত ভাল, সর্বাংশে ভাল একজন, যিনি দলে প্রবীণতম,—তাঁর নাম উমরিগর।

দ্বিতীয় টেস্টে প্রথম ইনিংসে বোরদে একবার ৯৩ রানের একটি সুন্দর ইনিংস খেলেছিলেন, এবং তৃতীয় টেস্টে দ্বিতীয় ইনিংসে

সরদেশাই। সরদেশাই এবার ওরেলের সঙ্গে ওরেলের ভাষায় কথা কইলেন। ঐ টেস্টে প্রথম ইনিংসে ওরেলের পূর্বকথিত 'ধৈর্য্য ধর' ব্যাটিং দেখবার পরে তার সবটা তরুণ শিক্ষার্থী সরদেশাই শিখে নিয়ে ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসে পাঠাভ্যাস স্নুরু করলেন !—

"ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক ওরেল আজ শয়ন করেছেন বিমর্ষ, বিভ্রান্ত, উদ্বিগ্ন ও আশঙ্কিত চিত্তে।

"ওরেল ক্রিকেট বইয়ে লেখা সকল কৌশল প্রয়োগ করেছেন ; আটটি বোলারকে পর্যন্ত নামিয়েছেন কিন্তু সরদেশাইকে টলাতে পারেন নি। বোলাররা এঁকিয়েছেন, বেঁকিয়েছেন, সব কিছু করেছেন কিন্তু বৃথা।...

"ধন্য সরদেশাই ! বাস্তবিক কে ভাবতে পেরেছিল এই বাইশ বছরের ছোকরা এমন বিপত্তারণ খেলা খেলবে! মিনিটের পর মিনিট, ঘণ্টার পর ঘণ্টা অলস গমনে চলে গেল, সে গ্রাহ্যই করল না, তার কি দরকার সময়ের হিসেবে, সে থাকতে এসেছিল, থাকতে পেরেছিল। তার ইনিংস একটা রত্ন।

"এই ধরনের একটিমাত্র ইনিংসই দেখা গেছে, এই একই মাঠে, হানিফ মহম্মদের।

"ওরেল গতকাল এবং আজ পথ দেখিয়ে গেছেন। তিনি ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের শিখিয়েছেন—উদ্দেশ্যস্থির ব্যাটিং কাকে বলে। ভারতীয় ব্যাটসম্যানেরা তাঁকে বিমুখ করেন নি ...

"কিন্তু ওরেলের ধীর ব্যাটিং ও সরদেশাইয়ের ধীর ব্যাটিংয়ের মধ্যে আকাশপাতাল তফাৎ। যেখানে ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান খেলোয়াড়টি রান জমিয়ে জয়স্তম্ভ গড়ছিলেন সেখানে ভারতীয়টি বাঁচাচ্ছিলেন তাঁর দেশকে।"

অথচ এই সরদেশাই-প্রতিরোধ কিন্তু ভারতীয় ব্যাটিংয়ের সাধারণ প্রকৃতি ছিল না। বরং বিপরীত। বহুসময় হয়েছে, এই পর্যুদস্ত দলটি ওয়েস্ট ইণ্ডিজের চেয়ে দ্রুত গতিতে রান তুলেছে। ব্যাটস-

ম্যানদের মধ্যে বিপদের মুখে আশ্রয় রূপে বিশেষ খ্যাতি পেয়েছেন নাদকার্নি, যিনি স্টক বোলাররূপে দলের ভরসা, এবং দলের শ্রেষ্ঠ অলরাউণ্ডার ডুরানী—তাঁর ব্যাটিং অনেক লজ্জা বাঁচিয়েছে। চতুর্থ টেস্টে তিনি সেঞ্চুরীও করেছিলেন। আমি এখানে কয়েকটি প্রাণবন্ত জুটি-খেলার বিবরণ দিচ্ছি।

তার মধ্যে প্রথমেই আসবে প্রথম টেস্টে প্রথম ইনিংসে ডুরানী ও স্থূর্তির জুটি-খেলা। ডুরানী ৫৭, স্থূর্তি ৫৬।

দ্বিতীয় টেস্টে প্রথম ইনিংসে নাদকার্নি-ইঞ্জিনীয়ার ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে অষ্টম উইকেটে ভারতীয় রেকর্ড করলেন। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে মাদ্রাজে ১০১ রানের রেকর্ডও তাঁদেরই। এই জুটি ৩৫ মিনিটে ৫০ রান করেছে। ইঞ্জিনীয়ার ৫৩, নাদকার্নি ৭৮ নট আউট।

তৃতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে ডুরানী-নাদকার্নি নবম উইকেটে ৪০ করে মুখ বাঁচালেন কিছুটা। ডুরানী ৪৮ নট আউট। গোড়ার দিকে পাতৌদির চমৎকার ৪৮ রান।

দ্বিতীয় ইনিংসে সরদেশাইয়ের পার্বত্য-প্রতিরোধের কথা আগেই বলেছি। তাঁর মোট রান ছিল—৬০।

চতুর্থ টেস্টের প্রথম ইনিংসে ভারত বেশী রান করতে পারেনি কিন্তু করেছিল অনবদ্যভাবে, অন্তত সূচনায়। লাঞ্চের আগে ছু' ঘণ্টায় তাদের চারটি উইকেট গিয়েছিল কিন্তু রান হয়েছিল ১১৮। মিনিটে প্রায় এক রান। পাতৌদি করলেন ত্রুটিশূন্য ৪৭, বোরদে ৪২।

দ্বিতীয় ইনিংসে সেলিম ডুরানী এবং বিজয় মেহরা প্রথম শ্রেণীর ব্যাটিং দেখালেন ১৩৬ মিনিটে ১৪৪ রান করে। মেহরার নিখুঁত খেলা আর ডুরানীর উচ্চ স্পর্ধা। আগেই বলেছি, ডুরানী সেঞ্চুরী করেছিলেন। মেহরা ৬২।

পঞ্চম টেস্টের প্রথম ইনিংসে নাদকার্নি ও স্থূর্তি সপ্তম উইকেটে ভারতের পক্ষে ভাল জুটি বাঁধলেন। নাদকার্নি ৬১, স্থূর্তি ৪১।

পাঠকেরা কি লক্ষ্য করেছেন আমি একজনের নাম এড়িয়ে গেছি সযত্নে যাঁর নাম লেখা আছে প্রশস্ততম অক্ষরে ? সফরের শেষে ব্যাটিং বোলিংয়ের হিসেব বেরুলে দেখা যাবে ভারতীয়দের মধ্যে উভয় ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্থানাধিকারীর নাম পলি উমরিগর। পলির বোলিং না হয় বাদ দেওয়া গেল, পিঠের ব্যথার জন্য তাঁর পক্ষে বেশী বোলিং করা সম্ভব হয়নি, এবং যা থেকে বঞ্চিত হয়ে দলের ক্ষতি হয়েছে প্রভূত, কিন্তু ব্যাটিং ?

যুদ্ধোত্তর ভারতীয় ক্রিকেটের শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান পলি উমরিগরকে আমি নমস্কার জানাচ্ছি। যুদ্ধোত্তর এদেশীয় ক্রিকেটে ব্যাটিংয়ে পলিই নিঃসন্দেহে মুখ্য পুরুষ। আমি হিসেব থেকে বাদ দিচ্ছি হাজারেকে, টেস্টে না হলেও প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে যুদ্ধের বহু পূর্বে যাঁর অবতরণ, ভীনুকে যদি মনে রাখি তবু পলি উমরিগর, এবং মঞ্জরেকরকে মনে রাখলেও। অবশ্য শেষ পর্যন্ত মঞ্জরেকরই পলির প্রতিদ্বন্দ্বী।

ব্যাটসম্যান হিসেবে মঞ্জরেকরের সামর্থ্যের পরিমাণ আমার অজ্ঞাত নয়, তাঁর রীতিনৈপুণ্য এবং তার দ্বারা অর্জিত রানসংখ্যা তাঁকে অনেক উপরে তুলে রেখেছে, এই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে তাঁর ব্যর্থতার দ্বারা আমার বিচারকে আমি কিছুতে অপরিচ্ছন্ন হতে দিতে রাজী নই, তবু মঞ্জরেকরের মধ্যে একটা বস্তুর অভাব আমি কিছুতে ভুলব না— ব্যক্তিত্বের অভাব— যা না থাকলে প্রয়োজনীয় হওয়া যায়, মহনীয় হওয়া যায় না। পলি উমরিগর ভারতীয় ক্রিকেটে ব্যক্তিত্বে মহান।

শেষপর্যন্ত তাই আমার মতে পলির ব্যাটিং থেকে ব্যাটিং-রীতি বড়, যদিও তিনি যথেষ্ট রান করেছেন। নীল হার্ভেকে বাদ দিলে তাঁর সংখ্যায় টেস্ট-ক্রিকেট পৃথিবীতে আর কেউ খেলেন নি ; সে সকলই আছে কিন্তু আরও বড় করে আছে অস্তিত্বের মুদ্রণ—সগর্ব আত্মঘোষণা। পলি উমরিগরকে মাঠে কেউ কোনোদিন অস্বীকার করতে পারে নি। যখন তিনি দলের অধিনায়ক তখন মনে হয়েছে, এই তো যোগ্য নেতা। যখন নন তখন হাজার হাজার মানুষের

সঙ্গে ভেবেছি, অবহেলিত যোগ্যতা। বিদেশী অধিনায়কের পাশে· উমরিরগকে দেখে দীনতাবোধ করিনি কখনো, কখনো হীনতাবোধ করিনি পলি উপস্থিত থাকতে আর কোনো উপস্থিতিতে। গত ভারত-ইংলণ্ড টেস্টের সময়ে কলকাতায় আঘাতের জন্য কণ্ট্রাকটার অবসর নিলে সাময়িক অধিনায়করূপে পলির আবির্ভাবের মহিমাকে বন্দনা করেছিলুম একটি বাক্যে—'জনতার দ্বারা নির্বাচিত অধিনায়ক', —আমার সেই কথাটি আমার সকল ক্রিকেটলেখার মধ্যে সর্বাধিক অভিনন্দিত হয়েছে, এবং তা মাত্র একটি কারণে, আমি ঐ একটি ক্ষেত্রে সকলের প্রাণের কথাকে অনুভব করবার বিরল সৌভাগ্য পেয়েছিলুম।

পলি উমরিগর নাকি টেস্ট-ক্রিকেটে আর ফিরবেন না। ভারতীয় ক্রিকেটের কথা যখন ভাবি তখন তাঁর প্রত্যাবর্তনকে মনেপ্রাণে কামনা করি, যখন পলির দিক থেকে চিন্তা করি তখন চাই না যে, তিনি ফিরে আসুন। উজ্জ্বল সূর্যাস্ত সূর্যজীবনের পরমতম কামনা। অপরাহ্ণে অম্লানদীপ্ত থেকে যিনি স্বেচ্ছাবসর গ্রহণ করেন তাঁর শেষ শিখা-শর আমাদের সত্তাকে আলোকবিদ্ধ করে রাখে। লক্ষ লক্ষ কণ্ঠের 'এসো এসো' সুরের উপরে উমরিগরের অবসরের ছন্দ বাজতে থাকুক।

তবু— ইডেনে টেস্ট ম্যাচ। প্রথম উইকেট গেছে প্রথম ওভারেই। দ্বিতীয় উইকেটও গেল শিশির না শুকোতে—কিন্তু আর ভয় নেই, অভিনন্দনের জন্য প্রস্তুত আমরা—এখনি দেখা যাবে প্যাভিলিয়ন গেটে ভরসার বলিষ্ঠ দীর্ঘ আকার—ঐ তো উমরিগর নামছেন—ডান হাতে ধরা ব্যাট—মাথা একটু বামে হেলানো—বাঁ হাতে টুপিটা ঠিক করে নিচ্ছেন—নেমে পড়লেন মাঠে—

মিথ্যা স্বপ্ন! ভারতের প্রয়োজনে যদি প্রতিজ্ঞা না ভাঙেন উমরিগরকে আর দেখা যাবে না টেস্ট ক্রিকেটে। সেই কথা মনে রেখেই কি উমরিগর ঐভাবে জ্বলে উঠেছিলেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজে?

বলছিলাম সেই কথাই। প্রথম টেস্টে উমরিগর বিশেষ কিছু

করতে পারেন নি—২ ও ২৩। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁর ২৩ রান দলের দ্বিতীয় সর্বাধিক। ৪ রান বেশী করেছিলেন বোরদে। উমরিগরের ব্যাটিংই কিন্তু উল্লেখযোগ্য হয়েছিল—

"উমরিগর চরম সতর্কতার সঙ্গে ব্যাট করেছেন, কোনো বাড়াবাড়ি করেন নি। সর্বসময় তাঁর মুখের উপর যেন ভারতের মানচিত্রটি দৃঢ়ভাবে আটকানো ছিল—এই দায়িত্ব তিনি যথার্থ বীরের মত পালন করেছেন। যতক্ষণ উমরিগর আছেন ততক্ষণ ভারত আছে।"

দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে উমরিগর পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে পঞ্চাশ রান করার পরে কিভাবে সোবার্সের বলে আউট না হয়েও আউট হয়েছিলেন, সে কাহিনী কথিত হয়েছে আগেই। দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁর ৩২ রান সতর্কতায় এবং ক্ষীণরান দলের প্রতি দায়িত্বে পূর্ণ ছিল।

তৃতীয় টেস্ট উমরিগরের পক্ষে পুরোপুরি ব্যর্থ টেস্ট (৮-১০), কারণ চতুর্থ টেস্টে তাঁকে পূর্ণ প্রভায় আত্মপ্রকাশ করতে হবে। চতুর্থ টেস্টের সমুদ্রলঙ্ঘনের ঠিক পূর্বে তৃতীয় টেস্টের আত্মসঙ্কোচন—ক্রিকেট-বিধাতার অদৃশ্য নির্দেশে।

চতুর্থ টেস্ট! পঞ্চম টেস্টই বা কি কম, যে টেস্টে পৃষ্ঠবেদনা নিয়ে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন ফলো-অনের বিরুদ্ধে। পরিস্থিতি? একটা সময় গেছে যখন ভারত প্রথম ইনিংসে ৬ উইকেটে ৫৬। উমরিগর পিঠে ব্যথা হাতে ব্যাট নিয়ে ইনিংসের প্রায় সমাপ্তি পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থেকে ফলো-অন থেকে দলকে বাঁচালেন; নিজের রান ৩২।

পঞ্চম টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংস উমরিগরের ক্রীড়াজীবনের হয়ত একটি চরম ক্ষণ—আমি জানি না সত্যই তাই কি না? পঞ্চম টেস্টের পঞ্চম দিনে লাঞ্চের কিছু পরে উমরিগর সোবার্সকে হুক করে স্কোয়ার লেগ বাউণ্ডারীতে পাঠালেন; তারপরে চেষ্টা করে একটা সর্ট রান নিলেন হলের মুখে নিজে দাঁড়াবেন বলে; হলের পাঁচটা বল খেললেন—শেষ বলে চেষ্টা করলেন আর একটা সিঙ্গলস নেবেন সোবার্সের

মুখোমুখি হবার জন্য—বোল্ড হয়ে গেলেন। ভারত-ওয়েস্ট ইণ্ডিজ টেস্টের উপরে শেষাঙ্ক-শেষের যবনিকা নেমে এল। উমরিগর যাকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন সেই রঞ্জনে এক রান, নট আউট, ঘরে ফিরলেন অটুট—কিন্তু যার জন্য চেয়েছিলেন সেই ভারতের বিধ্বস্ত দেহটিকে নিজের ব্যথার্ত পিঠের উপর তুলে প্যাভিলিয়ানে বহন করে আনতে হল তাঁকেই।

জামাইকার সাবিনা পার্কের যে মুষ্টিমেয় দর্শক শেষ বারের জন্য উমরিগরকে অভিনন্দিত করেছিল, যারা পরাজয়ের সম্ভাবনার মুখে ঐ শেষ দিনেও উমরিগর-স্মুর্তির সহযোগিতায় ৮০ মিনিটে ৮৩ রান দেখেছে, যে উইকেট পঞ্চম দিনে বোলারদের সহায়তা করেছে সেই উইকেটেও রানের আনন্দ ও খেলার আনন্দ দেখে মুগ্ধ হয়েছে, তারা কি উমরিগরের আউট হওয়ার সময়ে একবারও ভেবেছিল—এই যে উমরিগর প্যাভিলিয়ানে ফিরে যাচ্ছেন, সে প্যাভিলিয়ানকে তিনি নামবার আগে পুড়িয়ে এসেছেন!

৩৬ বছরের উমরিগর আর পারছেন না। পিঠের বেদনা নিয়ে তিনি চারটে সিরিজ ক্রিকেট খেলেছেন, বল দেওয়ায় প্রাণান্ত তবু বল দিয়েছেন, ব্যাট করতে শিউরে ওঠেন তবু ব্যাট করেছেন—৬০টি টেস্ট খেলেছেন, নীল হার্ভে ছাড়া যে সংখ্যায় টেস্ট আর কেউ খেলেননি—আর নয়, আরও ক্রিকেট খেলতে হলে বড় ধরনের অপারেশনের দরকার হবে—ক্রিকেট-জীবনের উপান্তে এসে তার কি সত্যই প্রয়োজন আছে,—উমরিগর কি এই সব চিন্তা ও সিদ্ধান্ত সাবিনা পার্কের প্যাভিলিয়ানে প্রত্যাবর্তনের সময়ে সে দিন করেছিলেন?

দ্বিতীয় ইনিংসে উমরিগর ৬০ রানে আউট হলেন। তখন ঐ সিরিজে তাঁর মোট রানসংখ্যা ৪৪৫, গড় ৪৯.৪৪। দলের সর্বোচ্চ।

সাবিনা পার্কের পঞ্চম টেস্টে উমরিগর এক ওভারও বল করতে পারেন নি। বোলিংয়ের শারীরিক সামর্থ্যকে উৎসর্গ করে এসেছিলেন চতুর্থ টেস্টে। ব্যাটিং অবশ্য তাঁকে করতে হয়েছিল শেষ শক্তির

আকর্ষণে—ব্যাটিং করেও ছিলেন প্রথম শ্রেণীর—কিন্তু চতুর্থ টেস্টই উমরিগরের চরম নিবেদন দেশের ও ইতিহাসের কাছে।

পোর্ট অব স্পেনের এই চতুর্থ টেস্টে ভারত হেরেছিল সাত উইকেটে—কিন্তু এই টেস্টকে সহজেই উমরিগরের টেস্ট নামে অভিহিত করা যায়। যুদ্ধোত্তর কালে কয়েকজন ভারতীয়ের নামে কয়েকটি টেস্ট চিহ্নিত হতে পারে। যেমন, ১৯৪৭-৪৮ সালের এডিলেড টেস্ট হাজারের নামে, তিনি মিলার-লিণ্ডওয়ালের বিরুদ্ধে উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী করেছিলেন; ১৯৫৭ সালের লর্ডস টেস্ট মানকদের নামে; ১৯৫৮-৫৯ সালের দিল্লী টেস্ট বোরদের নামে, হল-গিলক্রাইস্টের বিপক্ষে দুই ইনিংসে তাঁর রান ১০৯ ও ৯৭; ১৯৫৯-৬০ সালের কানপুর টেস্ট জেস্যু প্যাটেলের নামে, ১৪টি উইকেট নিয়ে তিনি অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছিলেন, এবং এই ১৯৫২ সালের পোর্ট অব স্পেনের চতুর্থ টেস্ট উমরিগরের নামে।

১৯৫২ সালের লর্ডস টেস্ট সত্যই ভীনু মানকদের নামাঙ্কিত হয়েছে, বাকিগুলি হয়নি, তার কারণ, এখনো ক্রিকেটের ইতিহাসে স্বাক্ষর রাখতে হলে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে কিছু করা দরকার, নিদেন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। বিলিতি সাংবাদিকতার মান খুব উঁচুতে।

আমার ব্যক্তিগত ধারণা, কোনো একটি খেলায় সর্বাত্মক কীর্তির দিক থেকে ভারতীয়দের মধ্যে উমরিগরের স্থান দ্বিতীয়। প্রথম অবশ্যই ১৯৫২ সালে লর্ডসের ভীনু, তারপরেই সাবিনা পার্কের উমরিগর। ভীনুকে প্রথমে স্থাপন করছি অন্য কারণ বাদ দিয়ে একটি কারণে,—তাঁর সহসা-উদয়ের ঔজ্জ্বল্যের জন্য। শনিবারের বিকেলে রাস্তার ধারে ক্রিকেটের ধূলোখেলা করছিলেন ভীনু, তাঁকে বলা হল, —চল, লর্ডসের দরবারে। ঠিক আছে, বলে ভীনু এলেন, এবং শুধু এলেন না, রাজাসনটি দখল করে নিলেন স্বচ্ছন্দে।

বহুদর্শী আম্পায়ারশ্রী ফ্রাঙ্ক চেস্টার বলেছেন, ঐ খেলায় ব্যাটিংয়ে-বোলিংয়ে ভীনুর সর্বাত্মক কৃতিত্বের তুল্য আর কিছু তিনি কখনো

দেখেন নি। ভীনু প্রথম ইনিংসে ৭২ রান করলেন এবং তারপরে ৭৩ ওভার বল করে ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংসে উইকেট নিলেন ১৯৬ রানে পাঁচটি। দ্বিতীয় ইনিংসে ভীনু করলেন ১৮৪ এবং ইংলণ্ডের দ্বিতীয় ওভার থেকে আরম্ভ করে বল দিয়ে গেলেন শেষ পর্যন্ত, যতক্ষণ না ইংলণ্ড অবশিষ্ট ৭৩ রান করতে পারল।

ফ্রেডি ট্রুম্যান সেই সিরিজে নিকেশ করে দিয়েছিলেন ভারতকে। লীডসে প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে শূন্য রানে ভারতের চারটে উইকেট পড়ে যাওয়া শূন্যের রেকর্ডবিশেষ। ট্রুম্যানের বোলিংয়ের কিছু হিসেব—৩-৮৯ ও ৪-২৭, ৪-৭২ ও ৪-১১০, ৮-৩১, ৫-৪৮।

ট্রুম্যানের বল দেখে প্রাণভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল নাকি কেউ কেউ। শোনা যায়, উমরিগরও ছিলেন ফেরারী ফৌজের একজন। উমরিগরের বয়স তখন ২৬।

দশ বছর পরে, উমরিগরের বয়স যখন ৩৬, ভারতীয় দলকে সুনির্দিষ্টভাবে যখন সংহার করছে ট্রুম্যানের চেয়েও বড় শক্তি ওয়েসলি হল, তখন পোর্ট অব স্পেনের চতুর্থ টেস্টে উমরিগর প্রথম ইনিংসে করলেন ৫৬ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ১৭২ নট আউট।

শুধু তাই নয়, প্রথম ইনিংসে পিঠে টান সত্ত্বেও বোলিং করে গেলেন ৫৯ ওভার, তাতে ২৪ মেডেন, ১০৭ রান, ৫ উইকেট।

এতেই শেষ হয়নি, দ্বিতীয় ইনিংসেও বল দিলেন, কোনো উইকেট পাননি, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ তিন উইকেটে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে দিল, কিন্তু তাঁর ১৬ ওভার বলের মধ্যে ৮ ওভার মেডেন, রান দিয়েছিলেন মাত্র ১৭।

উমরিগর কি ভীনুর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে খেলছিলেন? পাঠক, ভীনুর কীর্তির সঙ্গে হিসেব মিলিয়ে নেবেন, আমি পাশাপাশি তুলে ধরলাম।

কিন্তু শুধু কি হিসাব যথেষ্ট? রানের সংখ্যা, উইকেটের সংখ্যা দিয়ে কি সব কিছুর বিচার হতে পারে ক্রিকেটের মত স্বভাবকুলীন

খেলায়? না, মোটেই নয়, এখানে নিশ্চয় জানানো উচিত যে, প্রথম ইনিংসে উমরিগরের পাঁচজন শিকারের মধ্যে কানহাই হান্টের মত ব্যাটসম্যানও ছিলেন। আর ব্যাটিং?

সে ব্যাটিং সমগ্রে রত্নহার, অংশে রত্ন।

হীরালাল বাজনাথ আমাদের জন্য, ইতিহাসের জন্য, সে ব্যাটিংয়ের বর্ণনা করেছেন—

আজ ওভাল কুইনস পার্কে দীর্ঘাকার ভারতীয় ব্যাটসম্যান পলি উমরিগর মহাক্ষত্রকীর্তি দেখিয়েছেন। এর সমতুল কিছু হয়েছে কি না সন্দেহ, হলেও অল্পই হয়েছে।

যখন ভারতের স্কোর চার উইকেটে ১৯২, ইনিংসে পরাজয় এড়াতে যখন আরও ৫৫ রান দরকার তখন তিনি এসেছিলেন, তারপর ৪২২ রানের ইনিংসের শেষ পর্যন্ত খাড়া ছিলেন অপরাজেয় বীর্যে।

আর কখনো এমন প্রয়োজনীয় ইনিংস খেলা হয়নি, এমন অর্থপূর্ণ ইনিংস—সম্পদহারা দলের পক্ষে।

উমরিগরের চতুর্দিকে একের এক উইকেট লুটিয়ে পড়ল, তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন সমুন্নত। হল বীভৎস বাম্পারগুলো ছুঁড়তে লাগলেন চারিদিকে, দৃঢ়মতি উমরিগর সেগুলোকে ধ্বংস করে বাউণ্ডারীতে পাঠিয়ে চললেন। অবিচলিত থেকে তিনি তাঁর দলকে টেনে তুললেন অপমানশয্যা থেকে। উমরিগর তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ ইনিংস খেললেন।

আর তার বিপরীত ছবি অন্যত্র। নিছক নির্বুদ্ধিতা, বিশুদ্ধ অবিবেচনা, শোচনীয় শৈথিল্য, ন্যস্ত দায়িত্ব সম্বন্ধে জঘন্য বিশ্বাস-হীনতা দেখা গেল মঞ্জরেকর, পাতৌদি, সুর্তি, বোরদে ও সরদেশাইয়ের আচরণে—যেভাবে তাঁরা উইকেট ছুঁড়ে দিলেন।

যখন খেলা সুরু হল, তখন ভারতের ৬১ রান দরকার

ইনিংসে হার এড়াতে, হাতে আছে ৮ উইকেট,—আরম্ভের দশ মিনিট পর থেকেই পতন সুরু হয়ে গেল। মঞ্জরেকর উদরস্থ, এখনো ৫৭ রান বাকি; পাতৌদির আত্মহত্যা—৫৫ রান বাকি; ডুরানীর উচ্ছৃঙ্খলতায় আত্মক্ষয়—বাকি আছে ২৬ রান; সূর্তি ছত্রভঙ্গ—বাকি ১১ রান; অতঃপর বোরদে ও উমরিগর কর্তৃক ঘূর্ণী থেকে উদ্ধারের চেষ্টা। যখন বোরদে গেলেন তখন ভারত ৩২ রানে এগিয়ে।……

আজ পলি উমরিগরের দিন, আজ ক্রিকেটের মহাদিন, আজ ভারত সকল ত্রিনিদাদবাসীর হৃদয় লুঠে নিয়েছে।……

যখন উইকেট পড়ে যাচ্ছে, উমরিগর এককভাবে স্কোর-বোর্ডের গতি বজায় রেখে চললেন। নাদকার্নি লাঞ্চের দশ মিনিট আগে এলেন, লাঞ্চ পর্যন্ত আউট হলেন না, তখন স্কোর-বোর্ডে লেখা, ভারত ৮ উইকেটে ২৮৫, উমরিগর নট আউট ৬৩।

বিরতির পরে উমরিগর, শুধু উমরিগর। ক্রিকেট-গ্রন্থের কোনো মার বাদ রইল না। নাদকার্নি একবার বেঁচে যাওয়ার পরে নিরেট আত্মরক্ষায় ব্যাপৃত আছেন, অন্যদিকে পাঁচটি বাউণ্ডারী করে উমরিগর নব্বুইয়ের কোঠায় দৌড়ে উঠলেন।

স্কোর যখন ৩৩৮, উমরিগরের ৯৭, তখন হলের হাতে নতুন বল তুলে দেওয়া হল। সেঞ্চুরীর মুখে দাঁড়িয়ে উমরিগর মার্ মার্ করে উঠলেন। মিড উইকেট বাউণ্ডারীতে হলকে প্রহার করে তিনি সেঞ্চুরীর জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নিলেন এবং তারপর যে প্রলয়কাণ্ড সুরু করলেন তেমনটি এই ওভালে কদাচিৎ দেখা গেছে। নতুন বল ও বোলারের প্রতি তাঁর ঘৃণা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে লাগল।

স্কোর যখন ৩৭১, উমরিগর ফাইন লেগে একটা বল ছুঁয়ে সরিয়ে দিলে নাদকার্নি আধখানা এগিয়ে এলেন কিন্তু উমরিগর তাঁকে ফেরৎ পাঠালেন। ব্যাট বাড়িয়ে নাদকার্নি সাষ্টাঙ্গে

ঝাঁপিয়ে পড়েছেন উইকেটের উপরে—তখনি উইকেট ভেঙে দেওয়া হল। আম্পায়ার জ্যাসিলনের মতে অবশ্য নাদকার্নি পরে ঝাঁপিয়েছিলেন—হতাশ হয়ে নাদকার্নি ফিরে গেলেন। এই জুটিতে ৮৭ মিনিটে ৯৩ রান হয়েছিল। ভারত ১২৪ রানে এখন এগিয়ে।

কুন্দরাম যোগ দিলেন। উমরিগর এখন ভয়াল রূপ ধারণ করেছেন—বুকের উপরের বলে হুক, মুখের উপরের বলে হুক—যথেচ্ছ ড্রাইভ— রানের দৌড়ে পৌঁছে গেলেন ১৫০-এ,—সময় ২০৩ মিনিট,—তাঁর শেষ ৫০ রান হয়েছে ৪৭ মিনিটে।

উমরিগরের এখন দ্বৈত ভূমিকা—রান করতে হবে, আবার হলের হাত থেকে বাঁচাতে হবে কুন্দরামকে। দুই কাজই অপূর্ব-ভাবে সমাধা করতে লাগলেন। হল এবং স্টেয়ার্স দুজনকেই বাধ্য হয়ে সরিয়ে নেওয়া হল। নতুন বল ৬০ মিনিটে ৬০ রান দিয়েছে।

৪১০ মিনিটে ৪০০ রান হল। উমরিগর এতই ক্লান্ত যে, হেঁটে খুচরো রান করতে লাগলেন।

করুণ মহান এক দৃশ্য— ক্লান্তিতে গতশ্বাস উমরিগর প্রতি ওভারের শেষে ব্যাটের দণ্ডে ভর করে কিংবা ঝুঁকে পড়ে শ্বাস নিচ্ছেন, বারবার জল চেয়ে পাঠাচ্ছেন তৃষ্ণা নিবারণের জন্য।......

স্থানীয় নিয়মে আছে, শেষ জুটি খেললে নির্দিষ্ট সময়ে বিরতির সুযোগ পাওয়া যাবে না, সুতরাং উমরিগরকে চা-এর সময় হয়ে গেলেও বাড়তি আরও আধ ঘণ্টা খেলবার জন্য মাঠে থাকতে হল।......

বর্ধিত চা-বিরতির ঠিক দশ মিনিট আগে কুন্দরাম কভারে সোজা রড্রিগসের হাতে বল তুলে দিলেন। ভারতের ইনিংস সমাপ্ত হল ৪২৩ রানে—উমরিগর ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে তাঁর সর্বোচ্চ ১৭২ নট আউট নিয়ে প্যাভিলিয়ানে ফিরে গেলেন।

বলতে লজ্জা নেই, উমরিগরের এই কাহিনী আমাকে ভাবাবেগে একেবারে অভিভূত করে ফেলেছিল, যেমন করেছিল ১৯৫২ সালে

লর্ডসে ভীনু মানকদের মহাবিকাশ। ছবিটা চোখের সামনে ভেসে এসেছিল তার সমস্ত রঙের রসের আবেদন নিয়ে। ইনিংসের শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে ছিলেন উমরিগর, তাঁর মুঠিতে ধরা ছিল ১৭২ রানের অপরাজেয় সৃষ্টি, প্রবীণ উমরিগরের পক্ষে কঠিন যে সিদ্ধি,—হল-স্টেয়ার্সের বিষোদ্গার, শরীরের উপর উড়ে-আসা রক্তবিভীষিকা, সোবার্স-গিবসের কুটিল চাতুরী, আঁকাবাঁকা বলের রহস্যময় চক্রান্ত—তাদের সঙ্গে লড়তে লড়তে দারুণ ক্লান্তিতে ঝুঁকে-পড়া শরীর, ব্যাটের দণ্ডে ভর করে প্রবীণ যোদ্ধার বিশ্রাম, কিন্তু সে কতক্ষণ—তারপরেই তিনি খাড়া হয়ে উঠলেন—তখনি সোজা হয়ে উঠল ভারতের মেরুদণ্ড—আর আমার মনে জাগল একটি সুমহান ছবি—

ঝড়ের সমুদ্রের ছবি। সর্বনাশের রাত্রে বয়ে গেল সাইক্লোন, নৈশ তরঙ্গের সংঘাতে বিধ্বস্ত জাহাজ গেল ডুবে, তারপরে ঝড় থামল, প্রভাত হল এক সময়ে—দেখা গেল ডুবে-যাওয়া জাহাজের মাস্তুলটা তখনো জেগে আছে, আর তাতে দুলছে ছিন্ন পতাকা নতুন সূর্যের আলোয় সগৌরবে।

দেখলাম, উমরিগরের হাতে ধরা সেই পতাকা।

ভারতীয় দল চলে যাবে। লজ্জিত আর বিধ্বস্ত একটি দল। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিজয়ী অধিনায়ক ওরেল এসেছেন বিদায় দিতে। ওরেলের চোখে জল। ওরেল কাঁদছেন। ভারতের গলায় ওরেল 'হার' পরিয়েছেন, ওরেলের চোখের জলে তা মুক্তাহার হয়ে গেল।

এই মানুষ ওরেল, এই মানুষ ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানরা। বেগবান তাদের জীবন। তাদের অনুভূতিতে বন্যাতরঙ্গ সর্বদা। রোষে ও রসে তারা সমান অভিভূত। তাদের ফাস্ট বোলাররা বাম্পার দেয়, আবার তাদের দেশের মানুষেরা আহত বিদেশীর জন্য ব্যাকুল হয়ে চোখের জলের সঙ্গে প্রার্থনা করে ঘরে ঘরে—গির্জায়, মন্দিরে, মসজিদে। সে বড় বিচিত্র দেশ।

আমরা সেই দেশের মধ্যে একবার প্রবেশ করব।

ক্রিকেটের ত্রয়ী

আমি একটি নাম-না-জানা মাঠে খেলা দেখবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সমুদ্রতটের সেই মাঠটি—সেখানে খেলা হয় সোনালি বালি-মাটির পিচে, সেখানে নারকেল পাতা কাঁপে অপূর্ব হুতাশে, এলোমেলো রেখায় মৃদু গর্জনে ঢেউগুলো তটের বুকে পড়ে ফেনার ছাব এঁকে চলে যায়, সেখানে জলে আধ-ডোবা একটা কালো পাথর থেকে লাফিয়ে পড়া যায় খেলার মাঠে, সমারসেট মমের গল্পের পাতা থেকেও বটে।

সেই মাঠে খেলেছেন কনস্টানটাইন, ওরেল, উইকস। বল দিয়েছেন রামাধীন।

নাচ গান হল্লা, হাসি রাশি রাশি—খেলার মাঠে, প্যাভিলিয়ানে, ড্রেসিংরুমে, সর্বত্র। এত আনন্দ কোথা থেকে পায় এরা? সবাই অবাক হয়ে চেয়ে থাকে ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান খেলোয়াড়দের দিকে। এরা কি টেস্ট খেলতে এসেছে, আধুনিক টেস্ট, যেখানে জাতির সম্মানের প্রশ্ন আছে?

বিরাট একটা হাসির তরঙ্গে সব ডুবে গেল। খেলাটা যুদ্ধ নয়, খেলাটা খেলাই। মহাযুদ্ধের ঘা না শুকোতে খেলার মাঠে নতুন বিশ্বযুদ্ধ স্থরু করতে ইচ্ছে নেই। ১৯৫০ সালে এই কথাটা ক্যালিপসো গানের সুরে ছড়িয়ে পড়েছিল যুদ্ধশীর্ণ ইংলণ্ডের নগরে-প্রান্তরে।

লর্ডসে ভেঙে পড়ল রাশিকৃত ঘন কালো মানুষ। ১৯৫০ সালের ২৯শে জুনের অপরাহ্ন। তারা নাচতে লাগল—চেঁচাল লাফাল গড়াগড়ি খেল মাঠের উপরে। তারা জিতেছে। লর্ডসে হারিয়েছে ইংলণ্ডকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ। হেড কোয়ার্টারে জয়! রাজপ্রাসাদে ঢুকে হতচকিত রাজার সামনে একলা নায়কের বীরত্ব ও মহত্ত্ব প্রদর্শনের

মতই রোমান্টিক কাণ্ড। সুন্দর ক্রিকেট। চমৎকার ক্রিকেট !! অপরূপ ক্রিকেট !!! কালবৃদ্ধ লর্ডসের প্রাচীন তৃণরাজিতে যৌবনের উত্তেজনা এবং অপরিমিত অসংবৃত সুখের হিল্লোল তুলে যারা ছুটতে লাগল তারা নিতান্তই সাধারণ মানুষ, দূর ওয়েস্ট ইণ্ডিজ থেকে ইংলণ্ডে এসেছে অন্নভাগ্যের অন্বেষণে, তারা ক্রিকেটের কর্মকর্তা নয়। ইংরেজ সাহিত্যিক তৃপ্তির সঙ্গে বলেছেন, এই ভালো, এই ভালো, ইংলণ্ডে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম জয় যে, কর্মকর্তাদের সাজানো উৎসবের মাধ্যমে পালিত হবার পরিবর্তে অজানা অচেনা সাধারণ মানুষের দ্বারা পালিত হল—এই ভালো! এরা খেলা দেখবার জন্য পয়সা দিয়েছে এবং খেলা দেখে আনন্দ পেয়েছে, যে আনন্দ বহু পরিপক্ক সমালোচক বা নাগরিক দর্শকের আনন্দের চেয়ে অনেক গুণে বৃহত্তর ও মহত্তর।

নদী তুমি কোথা হইতে আসিতেছ ?

আনন্দ-ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে আমাদের যাত্রা সুরু হোক।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের একটি গ্রাম। হতে পারে ত্রিনিদাদ, বার্বাডোজ, কিংবা জামাইকা। ধরা যাক ত্রিনিদাদের। লিয়ারী কনস্টানটাইনের দেশ।

দুপুর প্রায় একটা। রবিবার। গ্রামের মাঠে ভেঙে পড়েছে মেয়ে পুরুষ। মাঠ খুব বড় নয়, মাঝখানে পাথরের মত শক্ত পিচ, আশপাশ এবড়ো খেবড়ো। ছেলে থেকে বুড়ো পর্যন্ত সকলে চীৎকার করছে। দর্শকের মধ্যে মেয়ের সংখ্যা অল্প নয়। সব বয়সের মেয়েরা এসেছে রঙ-বাহার পোষাক পরে। তাদের চীৎকার আরো বেশী।

পাশাপাশি দুটি গ্রামের ম্যাচ। প্রতি রবিবার এই রকম ম্যাচ লেগে থাকে। আট দশ মাইলের মধ্যে যারা থাকে, তারা অধিকাংশই এসে জোটে।

মাঠের মাঝখানে আধখানা ম্যাট পাতা আছে। বাকি অর্ধেক ম্যাট আনবে বিপক্ষ দল। তারা এসে পড়ল বলে।

হু হু করে একটা বাস এসে থামল। ঝুপঝাপ করে লাফিয়ে পড়ল বাসের সর্বাঙ্গ থেকে অজস্র লোক। একটা বাসে এত লোক ধরে! টেনে নামালো ক্রিকেটের সরঞ্জাম। তাড়াতাড়ি নিজেদের ম্যাট মাঠে বিছাল। দুটো ম্যাট জোড়া হয়ে গোটা ম্যাট হল। ম্যাটে কতক-গুলো গর্ত, খানিকটা ছেঁড়া, উঁচু-নীচু রয়ে গেল, ভাল করে পাতা হল না, নাই হোক!

আরো কয়েকটি ভর্তি বাস এসে গেল। বেলা এতক্ষণে আড়াইটা। খেলা সুরু হবে। আশপাশের বাড়ীর ছাত এবং গাছের ডালপালা ভরে গেছে উৎসাহী দর্শকে বিশেষত কালো কালো বাচ্চা ছেলেয়। গাছই তাদের স্টেডিয়াম।

এই ছেলেগুলোর উৎসাহ সবচেয়ে বেশী। সারাদিনই তারা ক্রিকেট খেলে। আসল ব্যাটবল জোটে না, নারকেল ডাঁটা ছুলে ব্যাট তৈরী করে; বল হয় পুরোনো টেনিস বল, তাও না জুটলে কাঁচা লেবু, বা মার্বেল, বা শক্ত করে দড়ি পাকিয়ে তৈরী করা বল। স্কোর টোকার হাঙ্গামা নেই। একটি তেঁতুল গাছের ডাল ভেঙে নিলেই হল; একটা রান হলে একটা পাতা ছিঁড়ে টুপির মধ্যে ফেলা,—এমনি করে টুপির স্কোরবাক্সে পাতার রান জোগাড় হয়। অন্য দল খেলতে নেমে রান সুরু করলে টুপি থেকে রান-পিছু একটি পাতা বাদ যাবে। টুপি শূন্য হলে হবে ড্র, আরো রান হলে নতুন পাতায় বোঝাই হবে টুপি। ছেলেরা কেবল নিজেরাই খেলে না, তাদের মা বোন ভাইঝি ভাগনী-দেরও খেলতে নামায়। সারাদিনের পর কর্তা বাড়ী ফিরে দেখেন, তাঁর ছেলে মেয়ে বউ ক্রিকেট খেলছে উঠোনে বা পাশের মাঠে।

খেলা সুরু হল। অধিকাংশ খেলোয়াড়ই নিগ্রো, কয়েকজন ভারতীয়ও আছে। একজন হয়ত চীনে। সে একটা দলের ক্যাপ্টেন। তার বাবা ব্যাটবল সরবরাহ করেছে।

আকাশে সূর্য যেমন উত্তপ্ত, তেমনি মাঠের খেলোয়াড়, তেমনি দর্শক। রেখে ঢেকে বল দেওয়া নেই, দেখে শুনে ব্যাটিং করা নেই। দু দলেই

আছে দৈত্যবৎ বোলার এবং ভীমসেনের মত ব্যাটসম্যান। বল ছুটতে লাগল এমন বেগে যে, কামানের গোলাও তার কাছে শিশু, ব্যাটসম্যান ব্যাট ঘোরাতে লাগল এমনভাবে যে, এরোপ্লেনের প্রপেলারও লজ্জা পায়। নাক থেঁতলে গেল, বুকে এসে বাজল, আঙুল ছিঁচে গেল, খোঁড়াল, রক্ত পড়ল—কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নেই; কম আলো, মাঠ খারাপ, বডিলাইন—কোনো আপত্তির কথা জানেও না কেউ। ব্যাটিং চলল নির্ভয়ে। প্রথম বল গিয়ে পড়ল রেল লাইনের পারে, পরেরটি গেল নদীর উপর, তার পরেরটি হুম্ করে পড়ল টিনের ছাতে। ছেলে-ভর্তি গাছের ডাল ভেঙে পড়ল, ছাত থেকে গড়িয়ে পড়ল দর্শক, দর্শকের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল ফিল্ডার। খেলা চলল উর্ধ্বশ্বাসে।

একটা বল হঠাৎ বনের মধ্যে হারিয়ে গেল। খোঁজ খোঁজ, খেলোয়াড়, আম্পায়ার, দর্শক, সকলে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও যখন পেল না, নতুন বল নিয়ে খেলা সুরু করতে যাচ্ছে, এমন সময়—'এই যে—', বিটকেল চেঁচাল একটা ফচকে কালো ছোকরা। বলটা সে বার করে দিল। তার সাফল্যে সমাদরের বদলে কড়া হাতের দু'চারটে চাঁটি পড়ল তার মাথায়,—ছোঁড়াটাই বল লুকিয়ে রেখেছিল।

খেলার বিরতি। বিরতিতে অল্পস্বল্প খাওয়া নয়, পেটপুরে ভোজন এবং গলা পর্যন্ত.ঝাঁঝালো মদ। আবার খেলা সুরু হয়। আম্পায়ার একটি দলের হয়ে একটু টানতে লাগল। মুণ্ডপাত করতে লাগল দর্শকে। ছাল ছাড়িয়ে নেব, পুঁতে ফেলব, কোর্মা বানাব, নানা মধুর সম্ভাষণ। খেলা চলতে লাগল। বুড়োরা পুরোনো খেলার কথা বলতে সুরু করল, বুড়ীরা বুড়োদের খেলার কথা স্মরণ করল; চেঁচিয়ে হাততালি দিয়ে নিজ নিজ বীরকে উৎসাহিত করল যুবতীরা, যুবকেরা বাজাল ব্যাণ্ড কিংবা দিতে লাগল শিস্, বাচ্ছারা ক্যানেস্তারা পিটিয়ে হুইস্‌ল বাজিয়ে আনন্দের 'মেছোহাটা' সৃষ্টি করল যথাসম্ভব।

সারাক্ষণ বিদ্যুৎগতিতে খেলা চলে এক সময় শেষ হল। তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। খেলোয়াড়েরা মাঠের উপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল

হাত পা ছড়িয়ে। পরক্ষণেই আবার লাফিয়ে উঠে একটা গোটা বোতল গলায় ঢেলে দিল ঢক্ ঢক্ করে। ততক্ষণে সকলে ঘিরে এসেছে। নারকেল গাছের তলায়, তেঁতুল গাছের অন্ধকারে জ্বলে উঠেছে একে একে মশাল। খানাপিনা স্থুরু হয়। প্রচুর প্রচুর খায়, পানও করে তেমনি। পানে-ভোজনে-স্ফূর্তিতে মাতাল সবাই। মশাল-গুলো নিভে আসে, কিন্তু আকাশে ওঠে চাঁদ। তার আলো দুধের মত গড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে। দূর থেকে ভেসে আসে সমুদ্রের গর্জন। হু হু করে বাতাস বয়ে যায়। শিউরে ওঠে নারকেল বন। বাজনা বেজে ওঠে, বেজে ওঠে এক স্থুরে শত শত কণ্ঠ। সেই চন্দ্রধৌত রাত্রে সমুদ্রতটে, সরল উছল মানবের প্রাণতটে, আছড়ে পড়তে লাগল স্থুরের পূর্ণ তরঙ্গ। স্থুরু হল নৃত্য।

তার পর ?

তারপর রূপকথা।

রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্র আর কোটালপুত্র, তিনজনে চলেছে। যাচ্ছে তো যাচ্ছে। অনেক পথঘাট পেরিয়ে, তেপান্তরের মাঠ এড়িয়ে, সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারে তারা গিয়ে পৌঁছল এক নতুন দেশে। সে দেশের নাম কি জানো ?

কি ? কি ?

অসীম আগ্রহে ককিয়ে উঠল ঠোঁট পুরু, কোঁকড়ানো চুল, মিশ-কালো যত সব ওয়েস্ট ইণ্ডিজের রূপকথা-পিপাসু বাচ্ছারা।

সে দেশের নাম—ইংলণ্ড।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের তিন 'পুত্রের' পরিচয় পাঠকরা জানেন। রাজপুত্র নিশ্চয়ই ওরেল, মন্ত্রীপুত্র বলা চলবে উইকসকে, কোটালপুত্র বললে অবশ্যই রাগ কর'বন না ওয়ালকট। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের স্থবিখ্যাত ত্রিমূর্তি। ইংলণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, ভারত, নিউজিল্যাণ্ড যাঁদের অভিযানক্ষেত্র।

ওরেলকে প্রথম দেখে আমার কিন্তু মনে হয়েছিল মুর ওথেলো

বলে। দেখে চমকে গিয়েছিলুম, নিশ্চয় ওথেলো। পদার্পণ করা মাত্র সারা মাঠ এমন করে জয় করে নিতে দেখিনি কাউকে। চলা ফেরার ছন্দ কি! বল কুড়ানো থেকে বল দেওয়া এবং ব্যাট করা সমস্তই অদ্ভুত মহিমার তারে বাঁধা। ওরেলের সর্বাঙ্গে লেখা 'মহান' কথাটা কাউকে পড়ে বুঝিয়ে দিতে হয় না। এমন করে আধিপত্য বিস্তার করা যায় ব্যক্তিত্বের বিচ্ছুরণে, একথা বিশ্বাস করা সম্ভব ছিল না ক্রিকেট-খেলোয়াড়ের কল্পনায়।

ক্রিকেটে ব্যক্তিত্বের কত কথা শুনেছি। ডাঃ গ্রেসের বিশাল ব্যাপকতা, ব্রাডম্যানের অগ্নিগর্ভতা, হ্যামণ্ডের রাজকীয় মহনীয়তা কিংবা ম্যাকলারেনের সুষম প্রখরতা। নিজের চোখে দেখেছি সি কে নাইডুর একনায়কের প্রবলতা। কিন্তু এমন মধুর ছন্দোময় বিষাদস্নিগ্ধ উপস্থিতি দেখার সৌভাগ্য আমার জন্যই ছিল। আমি চোখ ভরে দেখলুম ওরেলের রোমান্টিক বিষাদ, স্থির শান্ত চক্ষু, দেহদণ্ডের নিয়মিত বিন্যাস, —সমস্ত মিলিয়ে মাঠের প্রিন্স অব ডেনমার্ক বা সেনাপতি ওথেলো।

ওরেলের তুলনায় যথেষ্ট স্থূল আর যথেষ্ট স্পষ্ট উইকস বা ওয়ালকট। মন্ত্রীপুত্র কোটালপুত্রেরা যেমন হয়ে থাকে। রাজকুমারের স্বপ্নের চারি-পাশে তাদের আনুগত্যের ও সেবার সাধনা। প্রয়োজনীয়তায় উইকসের তুলনা নেই, প্রাত্যহিকতায় ওয়ালকটের। উইকস বা ওয়ালকটের রান কত সময় ছাপিয়ে গেছে ওরেলকে। ব্যাকফুটের সেই সমস্ত চওড়া ইনিংসের মাঝখানে ওরেল অনেক সময়ই স্বপ্নে শীর্ণ আর কল্পনায় আত্মক্ষয়ী। অনেক সময়ই বিশাল পুষ্পগুচ্ছের মাঝখানে ওরেল তাঁর শ্বেতকৃশ রজনীগন্ধাটি শুধু যোগ করে দিয়েছেন। কিন্তু এমন একটি সময় আসে যখন প্রতিভার তরবারিতে ভর করে অগ্রসর হতে হয় একলা; তখন মন্ত্রীপুত্র, কোটালপুত্রকে ফেলে রেখে এগিয়ে যান রাজকুমার। ক্রিকেট-কন্যার প্রতীক্ষা সেদিন সার্থক হয়।

ওরেল, কেন বলতে পারি না, ইডেন গার্ডেনে বড় বেশী নম্র আর নীরব ছিলেন। দুবার খেলেছেন। ৫০-এর উপর উঠেছেন বোধহয়

একবার। এন চৌধুরী তাঁকে অস্বস্তি দিয়েছেন ছ'বারই। ওরেল বোধ কম হয় অবকাশ-যাপনের জন্য এসেছিলেন কলকাতায়। বোধ হয় এখানকার নীল আকাশ, নারকেল পাতায় রোদের ঝিমিমিকি, ঘন সবুজ ঘাস আর, আকাশ-ভরা আলো তাঁর মনে 'ছেড়ে-আসা গ্রামের' স্মৃতি জাগিয়ে তুলেছিল। মুগ্ধ সঞ্চরণের মাঝখানে নিশ্চয়ই ভালো লাগছিল না চৌধুরীর নিপুণ প্রখর আক্রমণ, বোলিংয়ের মুহুর্মুহু শরাঘাত। অস্বস্তিবোধ করে ওরেল সরে যেতে চেয়েছিলেন। প্যাভি‌লিয়নে ফিরে গিয়ে ছুচোখ ভরে হলুদ-সবুজের রসপান করতে তৃষিত হয়েছিল তাঁর মন।

ওরেল ঘুমুতে চেয়েছিলেন। তিনি বড় ঘুম ভালবাসেন। যখনি সময় বা সুযোগ, তখনি ঘুম। প্যাড পরে বেঞ্চ খুঁজে নিয়ে শুয়ে পড়েন তিনি। টেস্ট ম্যাচের মধ্যেও ওরেলকে ঘুম থেকে জাগিয়ে ব্যাট করতে পাঠাতে হয়েছে।

ইডেন গার্ডেনে বোধ হয় তিনি একটি মধুর স্বপ্নকে লালন করতে চেয়েছিলেন নিদ্রাবেশে।

যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর সর্বোত্তম ছুটি ক্রিকেট-প্রতিভার একটি হল ফ্রাঙ্কি ওরেল, দ্বিতীয়ের নাম কিথ মিলার। সর্বাপেক্ষা বর্ণরঞ্জিত, অভাবনীয়ের অনুরাগে দীপ্ত ছুই চরিত্র। জিনিয়াস কথাটা এই ছুটি নাম ছাড়া কোথাও যুক্ত করা চলে না সাম্প্রতিক ক্রিকেটে। কম্পটনের আবির্ভাব হয়েছিল যুদ্ধের পূর্বেই।

ওরেল কিন্তু হাসছেন সর্বক্ষণ। তাঁর ঘুমের মতোই তাঁর হাসি বিখ্যাত। ওরেলের স্নিগ্ধ বিষাদের উপর এই অফুরন্ত হাসি শরতের শিশির ঝলমলে আলোর মতই মধুর। এই হাসিই তাঁকে সকলের অন্তরঙ্গ করে দেয়। ভয়াবহ বাম্পার ছুঁড়ে মিলার খেলার মাঠে ওরেলের উইকেট চেয়েছেন, খেলার শেষে চেয়েছেন তাঁর সঙ্গ। ছুজনকে এক সঙ্গে দেখা যাবেই, প্যাভিলিয়ানে, পানশালায়, সর্বত্র। নীলধারা ও শ্বেতধারার প্রীতিসঙ্গম।

প্রতিভার অবহেলা ও ঔদার্যে ওরেল অদ্বিতীয়। বোধহয় স্বাভাবিক প্রতিভার চরিত্রই তাই। বার্বাডোজের নারকেল বনে সূর্য-চন্দ্রের নীচে যিনি বেড়ে উঠেছেন, তিনি গড়ে উঠলেন না কিছুতে আধুনিক মতে। কোচিং তিনি বরদাস্ত করবেন না, বেশী প্র্যাকটিশে ঝোঁক নেই, আগ্রহ নেই ক্রিকেট-গ্রন্থে। খবরের কাগজ পড়ায় আগ্রহ নেই এমন মানুষ ভাবতে পারেন বিংশ শতাব্দীতে—খবরের কাগজে হেডলাইন পাচ্ছেন, তা সত্ত্বেও? প্রশংসা-নিন্দা-উপদেশ ওরেলের ঔদাসীন্যের তন্দ্রা ঠেলে প্রবেশ করতে পারে না, এ যদি লেখকেরা জানতেন, তাহলে হয়ত নিজেদের লেখায় ওরেলকে অব্যাহতি দিতেন। যেদিন শুনেছিলুম, ওরেল ব্যাট করতে নামার সময় ফিরতি ব্যাটসম্যানকে বোলার বা মাঠ সম্বন্ধে কোনো কথাই জিজ্ঞাসা করেন না, সেদিন যেন চিনতে পারলুম তাঁকে। ব্যাটসম্যানরূপে তাঁর ওঠাপড়ার রহস্য স্পষ্ট হয়ে গেল অনেকটা। ওরেলের ধারণা, সবকিছু নিজে দেখে বিচার করাই ভাল; যে সংবাদ নেবেন তা ভুল হতে তো পারে। ওরেল ক্রীজে দাঁড়িয়ে ঠিক করবেন ইতিকর্তব্য? ভয়াবহ রকম স্বাবলম্বন! আমরা সকলে জেনেছি, সফরের আগে ইংলণ্ড থেকে অস্ট্রেলিয়ায় এবং অস্ট্রেলিয়া থেকে ইংলণ্ডে খবর যায় ফিরতি ব্যবসায়ী, সরকারী কর্মচারী কিংবা অন্যান্য হিতৈষীদের মারফৎ: সেখানে কে কি রকম খেলছে, নতুন উঠল কে, মাঠের পিচ কিভাবে তৈরী করা হচ্ছে, স্থানীয় খেলায় কার রেকর্ড কি ধরনের? সেই সমস্ত খবর নিয়ে দু'দেশের ক্রিকেট-মস্তিষ্কেরা বসে যান টেবিলে। পরবর্তী ব্যাপার আপনারা নিজের চোখে দেখেছেন সিনেমায় যুদ্ধের ছবিতে—পরামর্শকক্ষে জেনারেল-সমাবেশে কর্ম-পদ্ধতি। সেখানে ওরেল নিজের চোখে সব কিছু দেখে জেনে নেবেন—বটে বটে!

ব্যাটিং সেরে ওরেল ফিরছেন, ডবল সেঞ্চুরী করেছেন। ভারতীয় সাংবাদিক ওরেলকে চেনেন ভাল করে। সুস্মিত কৌতুকে জিজ্ঞাসা করলেন, কত রান হল ফ্রাঙ্ক?

হঠাৎ প্রশ্নে ব্যস্ত হয়ে ওরেল বললেন, এই একশো-দেড়শোর মত হবে আর কি।

খেলতে নামার সময় ওরেল যেমন ফিরতি খেলোয়াড়কে কিছু জিজ্ঞাসা করেন না মাঠ বা বোলার সম্বন্ধে, তেমনি মাঠের মধ্যে নিজেকেও জিজ্ঞাসা করেন না কিছু। কি হবে স্কোরবুকের মহাজন হয়ে? সুখের সঙ্গে মানুষের মত বেঁচে থাক, তোমার কথা লিখে ইতিহাস মানুষের ইতিহাস হয়ে উঠুক।

শ্রীযুক্ত বেরী সর্বাধিকারীকে ওরেল বলেছিলেন, দেখুন, আমি বেশী রান করতে চাই না, সুন্দরভাবে করা গোটা পঞ্চাশ-ষাট রান হলেই খুসী।

অধিনায়ক গডার্ড ১৯৫১-৫২-তে অস্ট্রেলিয়া গিয়ে জানালেন,— আমাদের ওরেল হচ্ছে জিনিয়াস, উইকস মেশিন। একশো রান করেই ওরেল আউট হবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। অনেকটা তোমাদের ট্রাম্পারের মত।

সেকি কথা? ওরেলের লম্বা-চওড়া দুশো তিনশো রানগুলো?

এর উত্তর সহজ। একেবারে প্রথম যৌবনে রান না করে পারেননি ওরেল। যৌবনের ধর্মই এই। তার ভাল লাগার মেয়াদ অনেক ক্ষণের। কিন্তু ধরা যাক ১৯৫০ সালের ইংলণ্ড ট্যুরের কথা। কাউন্টি ম্যাচে রানসংখ্যায় ওরেলকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন উইকস। ডবল সেঞ্চুরীর অতিবর্ষণ হয়েছিল সেবার ইংলণ্ডের স্যাঁতসেঁতে গ্রীষ্মে। কিন্তু টেস্ট ম্যাচে ওরেল রইলেন শিখরাসীন। যেখানে উইকসের অ্যাভারেজ ৫৬·৩৩ সেখানে ওরেলের ৮৯·৮৩।

দলের প্রয়োজনে টেস্ট ম্যাচে ওরেল আয়েসের সঙ্গে আয়াসকে মিশিয়েছিলেন। বেশী রানের দরকার ছিল তখন।

ব্রাডম্যানের কথা মনে পড়বে বিপরীত দৃষ্টান্তরূপে। ১৯৩৫-৩৬ সালের কথা। এডিলেডে সাউথ অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে খেলছেন ব্রাডম্যান, টাসমানিয়ার একটি দলের বিরুদ্ধে।

টাসমানিয়ার অধিনায়ক ডনকে অনুরোধ জানালেন, সেঞ্চুরীতে পৌঁছে ডন যেন উইকেট ছুঁড়ে ফেলে না দেন। ব্রাডম্যান উইকেটে না থাকলে অস্ট্রেলিয়ার দর্শক গেটে টিকেট কেটে ঢুকবে না।

ডন সহাস্যে বললেন, মা ভৈঃ, তেমন করার কোনো ইচ্ছে আমার নেই। এই মরশুমে হাজার রান করতে আমার এখনো ১৮২ রান বাকি আছে।

ব্রাডম্যান করেছিলেন, ৩৬৯।

গডার্ড জানালেন, আমাদের উইকসের অপরিসীম রানের ক্ষুধা, তোমাদের ব্রাডম্যানের মত। আর খেয়ালী ট্রাম্পার হল ওরেল।

তাই ওরেল ভাল করে ব্যাট করতে না পারলে করেন না। রুচির আভিজাত্য তাঁর সহজাত। কোনো এক দুর্জ্ঞেয় পিচে, পিচের গুণে দুর্বোধ্য বলের সামনে ব্যাটের হাঁটু গেড়ে বসে থাকতে পারেন না তিনি। মর্যাদার সঙ্গে দাঁড়িয়ে তিনি মর্যাদার সঙ্গে খেলেন। ব্যাট নামানোর আগে ব্যাট তুলে নিয়ে চলে যান প্যাভিলিয়ানে। তাতে হয়ত দলের ক্ষতি হয়, সমষ্টির কাছে ব্যক্তির স্বাধীনতার আপেক্ষিক মূল্যের বিচার আসে, তবু শেষ পর্যন্ত আত্মবিক্রয় করা ওরেলের পক্ষে সম্ভব হয়নি, বোধ হয় দলের প্রয়োজনের মুখেও কারণ ওরেল ক্রিকেটকে খেলা বলে জেনেছেন শৈশব থেকে, ভুলে যাননি যৌবনে।

যৌবনের জয়ধ্বনি! বারবার উনিশশো পঞ্চাশের ইংলণ্ড ফিরে আসে। নটিংহ্যাম টেস্টে এরিক হোলিজের বল ব্যাকফুটে ওভার বাউণ্ডারীতে পাঠালেন ওরেল। প্রেসবক্সের পাশে স্কোরবোর্ডের উপর দিয়ে উড়ে গেল বল। দু'চোখ বিস্ফারিত করে আম্পায়ার চেস্টারের দিকে ফিরে হোলিজ বললেন, আমি বিশ্বাস করি না।

আমি কিন্তু ৬ রান ঠিকই দিচ্ছি এরিক,—চেস্টার বললেন।

পরের বলটিও সেইভাবেই ভেসে গেল মাঠের উপর দিয়ে। আবার ব্যাকফুটের ওভার বাউণ্ডারী!

হেলিজের এবার বাক্যস্ফূর্তির ক্ষমতাও রইল না।

লিস্টারশায়ার কাউন্টির বিরুদ্ধে প্রথম দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ করল দু উইকেটে ৬৫১। মার্শাল ১৮৮ এবং ওরেল ২৪১ নট আউট। লিস্টারের খেলোয়াড়েরা বলল,—তারা এ জিনিস আগে কখনো দেখেনি। আম্পায়ার চেস্টার বললেন, এখনো অর্ধেকও দেখনি। উইকস বাকি আছে।

উইকস হতাশ করলেন না। নিজস্ব 'প্রথম' সেঞ্চুরী করলেন ৬৫ মিনিটে। তিন ঘণ্টার কম সময়ে ওরেল-উইকস সহযোগিতায় রান হল ৩৪০.

এই স্ট্যাণ্ডের শেষের দিকে বিধ্বস্ত লিস্টারশায়ারদের বললেন চেস্টার—শেষ হয়নি, এখনো বাকি ওয়ালকট।

লিস্টারশায়ার সভয়ে আর্তনাদ করে উঠল,—রক্ষে কর, যথেষ্ট হয়েছে!

গডার্ডের দয়া হল, ডিক্লেয়ার করলেন, ২—৬৮২ রানে।

উইকসের পরিমাণে না হলেও অজস্র রান করেছেন ওরেল। কিন্তু যতক্ষণ ভালো লেগেছে। সর্ব অবস্থায় ভালো-লাগানোর পাঠশালার বাধ্য পড়ুয়া হলে রেকর্ডে আরও উন্নতি অবধারিত ছিল।

এমন খেলোয়াড়ে ভাগ্য অভিমানী হয়, কারণ ভাগ্যের নাম ভাগ্য-দেবী। তিনি সযত্ন তোষণের আয়োজনে বাস করতে ভালবাসেন। অন্যদিকে ওরেলও হলেন অভিমানী প্রণয়ী, অন্যের প্রেমাভিমানকে প্রেমশূন্যতা ধরে নিয়ে ক্ষতবিক্ষত চিত্তে ফিরে আসেন। ওরেলের অস্ট্রেলিয়ান সুহৃদ উপদেশ দিয়েছেন,—ভাগ্যবঞ্চনার প্রহরে এ ধরনের খেলোয়াড়ের উচিত কোনো উপযুক্ত কোচের শরণাপন্ন হওয়া। তিনিই বলে দেবেন ভাগ্যদেবীর প্রসাদলাভের উপযোগী ক্রিয়াকলা।

১৯৫১-৫২-তে অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে ওরেল বুঝতে পারেননি নিজের দোষ কোথায়, কেন বারংবার ব্যর্থতা? কোনো মিথ্যা কৈফিয়তের আবরণ নিতে ওরেলের মর্যাদায় বেধেছিল। বলেছিলেন, খেলতে যে পারিনি, সে আমারই দোষ।

তখনো ওরেল হেসেছিলেন। সেই অতুলনীয় হাসিটি সাহিত্যের সম্পদ হতে পারে। ক্ষুর ঝুলিয়ে রাখার ঘটনা।

১৯৫১-৫২-তে অস্ট্রেলিয়ায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের সফরের নামকরণ করা হয়েছিল "বিশ্ব-আধিপত্যের বেসরকারী অভিযান।" তখন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পূর্ণ গৌরবের পূর্ণিমা। সর্বোত্তম ও 'স্বাভাবিক' প্রতিভায় পূর্ণ সেই দলে আছেন ওরেল-উইকস-ওয়ালকট-ক্রিশ্চিয়ানীর মত ব্যাটসম্যান, স্টলমায়ার, অ্যালেন রে, ও মার্শালের মত ওপেনিং খেলোয়াড়, রামাধীন-ভ্যালেণ্টাইনের মত স্পিনার এবং গোমেজের মত অলরাউণ্ডার। তাছাড়া দলের 'দেবতা' গডার্ড। ক্রিকেট-পৃথিবী রোমাঞ্চিত ও সঙ্গীতময় সে দলের আবির্ভাবে।

অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছেও সুরভঙ্গ হল না। গডার্ড মন খুলে কথা বললেন। দেখা গেল, এই প্রথম সাদা-কালোর ভেদরেখা প্রায় লুপ্ত। গডার্ড জানালেন, তিনি শ্বেতকায়, কিন্তু কৃষ্ণকায়ও হতে পারতেন। তাঁর দলের সবাই ভদ্রলোক। সকলে দেখল, গডার্ড তাঁর খেলোয়াড়দের পূজো করেন, খেলোয়াড়রাও পূজো করেন গডার্ডকে।

অস্ট্রেলিয়ান আগ্রহীরা খুশী হল নেট-প্র্যাকেটিসে ও প্রারম্ভিক পর্যায়ের খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে দেখে। যা শুনেছি তা তাহলে মিথ্যে নয়। আর্থার মেইলী চেষ্টা করেও রামাধীনের গ্রিপ থেকে লেগব্রেক অফব্রেকের পার্থক্য করতে পারলেন না। ওরিলি ওরেলের বিরুদ্ধে কয়েক ওভার বল করে বিপর্যস্ত হয়ে সখেদে জানালেন, এরা টেস্টে লাখো রান করবে। ফার্গুসন-টেস্টিমোনিয়াল ম্যাচে ওরেল যখন পনের মিনিটের মধ্যে তিন ওভারে ৪৬ রান করলেন, তখন বুড়ো দর্শকদের মনে ট্রাম্পারের স্মৃতি ভেসে এল, যদিও তারা ট্রাম্পারের সঙ্গে কারো তুলনা করা নিতান্তই অপছন্দ করে। ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানদের খেলা নয়তো খেলার গান। তার সঙ্গে মাঠের বাইরে ছিল তাদের গানের খেলা—ক্যালিপ্‌শো উছলে তুলল সকলকে। ড্রেসিংরুমে ঢুকে সম্পূর্ণ অপরিচিত হওয়া সত্ত্বেও গডার্ডের দিকে হাত বাড়িয়ে উদার

গলায় মিলার ডাকলেন,—হ্যালো জন, আছ কেমন? এবং গডার্ড উচ্ছ্বাসভরে জানালেন, দেখে নিও, আমাদের ওরেল হাটনের চেয়ে বড় স্ট্রোক প্লেয়ার।

আনন্দময় ছন্দোময় সবকিছু,—ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান খেলোয়াড়দের বর্ণোচ্ছল প্রতিবাদটি পর্যন্ত। ব্রিসবেন মাঠে ছবি-আঁকা, ফুলপাতাকাটা কাঁধখোলা জামা পরে ঢুকল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল—তার মধ্যে একটি নীরব প্রতিবাদ ছিল। সপ্তাহ খানেক আগে একটি মেয়েকে বার করে দেওয়া হয়েছিল সদস্যদের আসন থেকে। মেয়েটির দোষের মধ্যে সে জামা পরেছিল খুবই রঙচঙে ও ঝলমলে কিন্তু কাঁধ ছিল খোলা। ব্রিসবেনের ক্রিকেট-কর্তৃপক্ষের চোখ ঝলসে গিয়েছিল খোলা কাঁধের সাদা আগুনে। সাংবাদিক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছেন, দর্শকরা বঞ্চিত হল একটি সুন্দর গ্রীবা এবং দুইটি মনোরম কাঁধের মনোহরণ দর্শন থেকে। ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানরা সেই বেরসিকতার প্রতিবাদ জানাতে এমন জামা পরে মাঠে ঢুকল যাতে আছে রঙের বাহুল্য এবং সাদা-কালো কাঁধগুলিকে ঢাকবার নিতান্ত অনিচ্ছা।

কি হাসিই না হাসতে পারত তারা! গানে হাসি, নাচে হাসি, কথায় হাসি, কাজে হাসি। পরের খরচে হাসি, নিজের খরচে হাসি। হাসির আনন্দবাজার। পরস্পরকে নাকাল করে এরা কত না সুখ পেত! ইংলণ্ডে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলার আগে দর্শকেরা গেটে কিউ দিয়ে আছে, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল যাচ্ছে পাশ দিয়ে গাড়ী করে, দলের ম্যানেজার জানালা দিয়ে হুমড়ি খেয়ে দেখতে লাগল দর্শকের সারি, প্রলুব্ধ চোখে। মনে মনে হিসেব চলতে লাগল দর্শক-সংখ্যার। উইকস পিছন থেকে ধারালো গলায় বললেন, 'স্টেডি, মিঃ জ্যাক, সব কজনকে গুণে ফেলা কি এখনি সম্ভব?' দলের ফাস্ট বোলারেরা নতুন বলে সুইঙ্গ করাতে পারছে না, এক ছোকরা খেলোয়াড় ফোড়ন দিল, আহা যেন রবিন হুডের দল। অর্থ? রবিনের তীরন্দাজ অনুচরেরা সোজা ছাড়া বাঁকা তীর ছোঁড়ে না। খেলার মাঠে এরা

নিজেদের দোষ ত্রুটি নিয়ে বাড়াবাড়ি করে না, মাঠের বাইরে তো নয়ই। তাদের মতে, কেউ ইচ্ছে করে ক্যাচ ফসকায় না, বা গোল্লা করে না। খাটো চেহারার বাচ্ছা ছোকরা ভ্যালেণ্টাইন, যার ডাক নাম ভ্যাল, সব সময়ে, কারণে অকারণে হেসেই অস্থির। দৈত্যাকার উইকেটকীপার ওয়ালকটও তাই। ক্যাচ ধরলেও হাসি, ফসকালেও। উইকস যতখানি খোঁচাতে পটু, হাসিতে ততখানি নয়। কিন্তু একবার অন্তত প্রাণভরে হেসেছিলেন, ওয়ালকট যখন ভুল ডাক দিয়ে রান আউট করে দিলেন এক টেস্টে। কিংবা আরও বেশ কয়েক বছর পরের একটি ঘটনা। ১৯৫৭ সালে ইংলণ্ডে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ টেস্টে হেরেছিল বিপুলভাবে। চতুর্থ টেস্টে তাদের ইনিংসে পরাজয়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংসের একেবারে শেষের দিকে, যখন আলেকজাণ্ডার ও রামাধীন খেলছেন, আলেকজাণ্ডারের ব্যাটে বল লাগা মাত্র রামাধীন দৌড়ুতে লাগলেন—ফরোয়ার্ড সর্ট লেগে রেভারেণ্ড ডেভিড শেফার্ড দাঁড়িয়ে, বল তাঁর দিকে যাচ্ছে দেখেও রামাধীন 'রান-চুরিতে' ক্ষান্ত ছিলেন না। রেভারেণ্ড শেফার্ড তা দেখে কঠিন মনে তৎক্ষণাৎ বল ছুঁড়ে রামাধীনকে আউট করে দিলেন।

বেচারা রামাধীন প্যাভিলিয়ানে ফিরছেন, বন্ধু ভ্যালেণ্টাইন মৃদু ধমক দিয়ে বললেন,—ছিঃ ভাই রাম, ওকি, তুমি রেভারেণ্ডের সামনে রান চুরি করছিলে? ভাই, তুমি কি জাননা টেন কম্যাণ্ডমেণ্টের মধ্যে আছে—'কদাপি চুরি করিবে না।'

কাহিনীটা রেভারেণ্ড শেফার্ডের কানে গেল। পরদিন তিনি তাঁর ধর্মযাজকের ভাষণে নীরস গলায় বললেন—আমি অতীব পরিতুষ্ট যে, ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান খেলোয়াড়দের মধ্যে অন্তত একজনও 'টেন কম্যাণ্ডমেণ্টের' সঙ্গে পরিচিত।' সেই কথা শুনে ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানদের হাসির কি ঘটা!

এই হাসির বাউলদের মধ্যে সেরা হাসি আলো করেছিল ওরেলের সুন্দর মুখ। সে হাসির সবটাই যে স্ফূর্তির, তা নাও হতে পারে।

কখনো হয়ত বিষাদের ; যেমন, যখন তিনি হেসে জানালেন ভারতীয় লেখককে,—এস ডি মেলোকে কথা দিয়েছিলেন বলেই কমনওয়েলথ দলের সঙ্গে আসতে হল ভারতে, নবপরিণীতা স্ত্রী পড়ে আছে নিউইয়র্কে। সে হাসি কখনো ধিক্কারের ; যথা, বাঙ্গালোরে ছোট ছেলেদের অটোগ্রাফের দাবি মেটানোর পর এক বুড়ো খোকা বায়না ধরল হস্তাক্ষরের। হোটেলে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করার আগে ওরেল হেসে বললেন, আপনার যে বয়সে তাতে অটোগ্রাফের বদলে মেয়ে-বন্ধুর পিছনে ছোটা উচিত। সুতীক্ষ্ণ বিদ্রূপ-হাসির আরও দৃষ্টান্ত বেরী সর্বাধিকারীই দিয়েছেন। মাদ্রাজে এক নাছোড়-বান্দা ভদ্রলোক ওরেলকে প্রশ্নে প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন—

মিঃ ওরেল, আপনি কি করেন ?

ক্রিকেট খেলি।

মিঃ ওরেল, বাকি সময় কি করেন ?

ক্রিকেট খেলি।

মিঃ ওরেল, বাড়তি সময়ে কি করেন ?

আরও ক্রিকেট খেলি।

মাদ্রাজী ভদ্রলোক এতেও দমলেন না। ঘটা করে নিজের সম্বন্ধে জানাতে সুরু করলেন, তিনি স্বয়ং কি করেন বা না করেন। বিশেষ গৌরবের সঙ্গে জানালেন, তিনি লণ্ডনে ছিলেন বেশ কয়েক বছর এবং তাঁদের ছয় বছরের দাম্পত্যজীবনে সন্তানাদি চারটি। ওরেল শুধু একটি প্রশ্ন করলেন,—চোখের ও ঠোঁটের কোণে বিদ্যুৎ অথচ কণ্ঠ নিরীহ,—মিঃ লণ্ডনার, আপনি 'বা-ড়-তি' সময়ে কি করেন ?

সকলে হেসে গড়িয়ে পড়ল।

ছ বছরে চারটি সন্তানের জনকের উদ্বৃত্ত সময়ের কর্ম সম্বন্ধে ওরেলের প্রশ্ন কতখানি সুনীতি-সঙ্গত হয়েছে তার বিচার আপনারা করবেন, আমি ব্যস্ত ওরেলের হাসির হিসাবে। পরিতৃপ্তির বড় সুন্দর হাসি দেখতে পাচ্ছি ওরেলের মুখে—তিনি ইচ্ছে করে লেগে দুটি

ফুলটস বল দিয়েছেন। ছোকরা খেলোয়াড়টি প্রথম সেঞ্চুরী করতে যাচ্ছে, তাকে সুযোগ না দেওয়া খুবই অন্যায়। এবং পুরোনো বিখ্যাত খেলোয়াড়টিও ফর্ম হারিয়েছেন শোচনীয়ভাবে, তাঁকে সাহায্য করা কার না উচিত? দুজনকে দুটি ফুলটস দিয়ে ওরেল তৃপ্তিভরে হাসতে থাকেন।

অথবা সেই ধূর্ত হাসিটি।

নেট প্র্যাকটিস হচ্ছে। প্রায়ার জোনস পর পর তিনটি বাম্পার ছুঁড়লেন। মাথা নামিয়ে মাথা বাঁচালেন ওরেল। সুরচিত গোঁফের ফাঁকে হাসলেন মধুর ভাবে। একজন দর্শক তামাশা করে বলল, তোমাকে হাওয়া করছে বল দিয়ে। স্বভাবসিদ্ধ অলসভঙ্গিতে জোন্স বললেন, ফ্রাঙ্ক, বলগুলো একটু উঠে পড়েছে। সহাস্যে তা মেনে নিয়ে ক্যালিপশোর সুর শিস্ দিতে দিতে ওরেল পরবর্তী বাম্পারের জন্য প্রস্তুত হলেন। অবিলম্বে তা এসে গেল। এবং মনোরম খুশীতে কোমর-উঁচু বলটিকে পাঠিয়ে দিলেন লেগে। ঠোঁটের শিস্ আরো মোলায়েম হয়ে উঠল।

এখনো ওরেলের ক্লাসিক্যাল রসিকতার কথাটুকু বলা হয়নি। ১৯৫১-৫২-তে অস্ট্রেলিয়ায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কি একটা হয়ে গেল শেষ পর্যন্ত। ক্রিকেট যে অনিশ্চয়ের অরণ্য একথা প্রমাণ করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে উঠল সমস্ত দল। সুন্দর সূচনার এমন পরিণতি মেলোড্রামাতেও মেলে না। গোলমাল বাধল সর্বদিকে। ছেলেখেলা জাতীয় খেলার পর একেবারে টেস্ট খেলতে নামল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, অস্ট্রেলিয়ান টেস্ট খেলোয়াড়দের সম্বন্ধে কোনো অভিজ্ঞতা সঞ্চয় না করেই। এমনই ছিল ভ্রমণ-সূচীর ধরন। ইংলণ্ডের ভিজে মাঠে যারা ছিল রানের রাজা, শুকনো মাঠে তারা শুকিয়ে গেল একেবারে। সুবিখ্যাত ত্রয়ীর ব্যাটে রান এল না কোনো মতে। রামাধীন ও ভ্যালেণ্টাইন দলের ভরসা-বোলার। বিশেষত রামাধীন। কিন্তু রামাধীনের বল বেশী ঘুরল না অস্ট্রেলিয়ার কড়া জমিতে, যদি বা

ঘোরাবার চেষ্টা করতে লাগলেন, বাঁকের মুখে ব্যাটের লগুড় হাতে দাঁড়িয়ে রইলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ্যাসেট। অন্যদিকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল সর্বপ্রথম যুদ্ধোত্তর কালের শ্রেষ্ঠ আক্রমণের সম্মুখীন হল,—মিলার ও লিণ্ডওয়াল অকৃপণ হাতে ছড়াতে লাগলেন মাপকরা বাম্পার। সুরু হল আঘাতপর্ব। ওয়ালকটের টান ধরল পিঠে, কোমরের পিছনে হাড় গেল সরে, এবং বল লেগে ভেঙ্গে গেল নাক। উইকসের পায়ে ধরল টান। ওরেলের হাত গেল থেঁতলে। এর সঙ্গে যুক্ত হোল ফিল্ডিং ব্যর্থতা, স্নায়ুপীড়াযুক্ত টেস্ট ক্রিকেটে অনভিজ্ঞতা, গডার্ডের অধিনায়কত্বে কখনো কখনো মারাত্মক ত্রুটি এবং দুঃসময় কাটিয়ে ওঠার মরিয়া চেষ্টায় আত্মঘাতী ব্যাটিং। এমনি এক সময়, ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানদের অদম্য হাসিও থেমে গেছে, ব্যর্থতার নৈরাশ্যে নীরব ড্রেসিংরুম, মাথা নামিয়ে মাঠ থেকে এসে একে একে ঢুকছে খেলোয়াড় —একমাত্র ওরেলই হেসে উঠলেন। একটা ক্ষুর নিয়ে ঝুলিয়ে দিলেন ড্রেসিংরুমের দরজায়। ক্ষুরের পাশে ক্ষুরের মতই একটু হাসি ঝুলতে লাগল—ত্রুটি থাকে কেন, যেটুকু বাকি আছে, এখানে সেরে যাও।

অস্ট্রেলিয়ায় ওরেলের ব্যর্থতার কারণ কি? চতুর্থ টেস্টের আগে তিনি আহত হননি। আঘাতের কৈফিয়তে গা বাঁচাতেও চাননি। এ বিষয়ে ওরেলের একমাত্র উত্তর,—ব্যর্থতা হচ্ছে ব্যর্থতা। অর্থাৎ ব্যর্থতা। হৃদয়বান সমালোচকদের মতে, ওরেলের নিজেকে না জানার ব্যর্থতা।

ওরেলের অসাফল্যের অনেক কারণ হতে পারে। তার একটি হল, অবিরাম ক্রিকেট। ১৯৫০-এর পূর্ব থেকেই একটানা খেলছেন তিনি, ১৯৫২ পর্যন্ত। যখন ইংলণ্ডে নয়, তখন ভারতে। ভারত থেকে অস্ট্রেলিয়ায়। ছেদহীন ক্রীড়াদাসত্ব। খেলতে ভাল লাগে বলে যে খেলে, তার কাছে এর থেকে বীভৎস কিছু হয় না। অথচ খেলতেই হবে, টাকার জন্য, দেশের জন্য। প্রফেশন্যাল টেস্ট ক্রিকেটার তিনি। অসহ্য শারীরিক এবং মানসিক ক্লান্তি ওরেলের খেলার রীতি

বদলে দিল ধীরে ধীরে। সোজা ব্যাটের তিনি শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যময় খেলোয়াড়, বলা হয়েছে 'হাটনের চেয়েও ক্লাসিক্যালি স্ট্রেট'। ব্যাটিংয়ের সময় ওরেল মোটেই এলোমেলো উচ্ছৃঙ্খল নন। দ্রুত রান তোলেন বটে, কিন্তু অদ্ভুত শান্তির ছন্দ থাকে তাতে। ওরেলের খেলায় একদিকে ছিল গতির কাব্য অন্যদিকে নীতির মহিমা। ১৯৫০ সালে ইংলণ্ডকে জয় করে নিয়েছিলেন এই মহান গরিমায়। অস্ট্রেলিয়ায় যখন খেলতে গেলেন, তখন ওরেলের সোজা ব্যাট বেঁকে গিয়েছে। সোজা রাখতে যতখানি শরীরের জোর আর মনের উৎসাহ থাকা দরকার তা হারিয়ে ফেলেছিলেন ওরেল। তিনি পালিয়ে যেতে চাইছিলেন খেলা থেকে। যতখানি সচেতনভাবে, অচেতনভাবে ততোধিক। অব্যাহতি কামনায় বলগুলোকে ব্যাটের চওড়া বুকে না নিয়ে আশেপাশে ঠেলে সরিয়ে দিতে ব্যাকুল হতে লাগলেন তিনি। বলের লাইন থেকে সরে যেতে লাগলেন, প্রায়ই অফের দিকে, এবং বাঁকানো ব্যাটে বল ঠেলতে লাগলেন বেগে। উইকেটের সামনে ব্যাকফুটের যে সমস্ত ড্রাইভের জন্য ওরেলের নাম লেখা হয়েছে সোনালি অক্ষরে, তার বদলে বলকে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত করার চাতুর্য দেখাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তিনি। এর সুযোগ নিলেন পূর্ণ মাত্রায় লিণ্ডওয়াল-মিলার ইনসুইঙ্গ-ইয়র্কার দিয়ে; সিলি মিড অনে অনবরত ধরা পড়তে লাগলেন ওরেল। বাইরের বল নিজের উইকেটের উপর টেনে আনার মত দুর্ঘটনাও কম ঘটালেন না।

একবারের জন্য ওরেলের এই দোষ দূর হয়েছিল অস্ট্রেলিয়ায়। চতুর্থ টেস্টের সময়ে ডান হাতে ভয়ানক আঘাত পাওয়ায় শুধু প্রায় বাঁ হাতে ব্যাট ধরেই খেলতে হয়েছিল তাঁকে। বাঁ হাতে খেলছেন, সোজা ব্যাটে খেলা ছাড়া উপায় ছিল না। সুতরাং সেঞ্চুরী না করেও বোধহয় উপায় ছিল না তাঁর। এর নাম আক্ষরিকভাবে, মন্দের ভালো।

ওরেল পরে অনেকটা আত্মশোধন করেছেন, কয়েকটি শ্রেষ্ঠ

ইনিংস সমৃদ্ধ করেছে ক্রিকেট-গ্রন্থকে। একটি খেলার কথা ধরা যাক। ১৯৫৭ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দুর্বিপাকের সম্মুখীন হল ইংলণ্ডে গিয়ে। পাঁচ টেস্টের তিন টেস্টে ইনিংসে হার, বাকি দু টেস্টে ড্র। তৃতীয় টেস্ট ড্র হয়েছিল দু'জনের কৃতিত্বে, প্রথম ইনিংসে ওরেলের, দ্বিতীয় ইনিংসে কোলি স্মিথের। ওরেল প্রথম ইনিংসে করেছিলেন ১৯১ নট আউট। নিজের সর্বাঙ্গীণ প্রতিভা প্রমাণ করবার জন্য তিনি নেমে-ছিলেন সর্বপ্রথম, দাঁড়িয়ে ছিলেন ৩৭২ রানের ইনিংসের শেষপর্যন্ত নট আউট। ঐ ইনিংসে ওরেলের ১৯১ রানের পরবর্তী সর্বোচ্চ রান সোবার্সের—৪৭, অর্ধশতও পূর্ণ হয়নি। ওরেলের সেই নাতিদ্রুত খেলা ওয়ালকটের মতে 'মাস্টারপিস', এ জিনিস তিনি দেখেন নি। সেই অপূর্ব ধৈর্য ও দায়িত্ববোধ, অনুচ্ছ্বসিত অব্যাহত রানধারা, একের পর এক খেলোয়াড়ের প্রস্থানের মধ্যেও অবিচল সংস্থিতি—'এই মাঠেই ১৯৫০ সালে ফ্রাঙ্ক তীব্রগতি যে ২৬১ রান করেছিলেন, তার থেকেও অনেক মূল্যবান এই ইনিংস'—আবেগভরে বলেছেন তাঁর বন্ধু-ক্রিকেটার। ওরেলই প্রথম ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান যিনি ইনিংসের আদ্যন্ত ব্যাট করেছেন। এই শেষ নয়, ৩৭২ করে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ যখন ফলো-অন করল (ইংলণ্ড ৬ উইকেটে ৬১৯) তখন ওরেল আবার গায়ের ঘাম না শুকিয়ে মাঠে নামলেন ব্যাট হাতে—দলের খেলা আরম্ভ করতে।

বিস্ময়কর প্রতিভা। মানুষটি পারেন না কি? প্রথম ব্যাট করতে, সর্বস্থানে ব্যাট করতে, প্রথম বল করতে, যেকোনো ধরনের বল করতে, যত্র তত্র ক্যাচ ধরতে এবং ইচ্ছামত বল থামাতে। ওরেল সম্বন্ধে কোনো কথাই শেষ কথা নয়। ১৯৫৭ সালে ইংলণ্ডে যখন খেলছেন, তখন তাঁর আসল কাজ কিন্তু পড়াশোনা করা। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনিভার্সিটির অর্থনীতির ছাত্র তিনি তখন। প্রথম টেস্টের আগে ওরেল দিনে খেলেছেন ক্রিকেট, রাত্রে তৈরী হয়েছেন পরীক্ষার জন্য, এবং সেটা যে, কি করে সম্ভব হয়েছে তা তাঁর অঘটনবিলাসী বন্ধু খেলোয়াড়দের কাছেও বিচিত্রতম ব্যাপার।

ওরেল আরও এগিয়েছেন, দলের অধিনায়ক হয়েছেন, কিংবা ঠিক ভাবে বলতে গেলে—ক্রিকেটের শ্রেষ্ঠতম অধিনায়কদের একজন হয়েছেন। ১৯৫০-৫১ সালে অস্ট্রেলিয়ায় 'সর্বশ্রেষ্ঠ টেস্ট ম্যাচ' ও সর্বশ্রেষ্ঠ টেস্ট সিরিজের অধিনায়করূপে তাঁর মহিমার কথা অন্যত্র বলেছি, * ভারতের বিরুদ্ধে অধিনায়করূপে তাঁর প্রতিভা ও শক্তির কথা এই গ্রন্থের অন্যত্র আলোচিত হয়েছে। আধুনিক পৃথিবীর এক নম্বর ক্রিকেটারের নাম ফ্রাঙ্কি ওরেল, কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এই পরিণত প্রতিভাকে ছেড়ে দিয়ে আমার মন বারবার ফিরে যাচ্ছে সেই তরুণ উৎসের কাছে—নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে যে উৎসারিত হয়েছিল আরুণ প্রেরণায়,—যে না জেনেই দিত সুখ, না ভেবেই করত সৃষ্টি। আমি ফিরে যেতে চাই ১৯৫০-৫১-৫২ সালের ওরেলের কাছে, কিংবা তারো পূর্বে। ১৯৪৬ সালে ওয়ালকটের সঙ্গে ওরেল চতুর্থ উইকেটে ৫৫৫ রানের রেকর্ড করলেন (ওরেল ২৫৫ নট আউট ওয়ালকট ৩১৪ নট আউট),—সেই পৌনে ছ' ঘণ্টার খেলার সময়ে ওরেল শুধু গান গেয়েছিলেন আর মধুর সুরে শিস্ নিয়েছিলেন। তাঁর গানের ও রানের সঙ্গী ওয়ালকট তার সাক্ষ্য দিয়েছেন। পরবর্তীকালে মধ্যদিনের কোলাহলে প্রভাতী সে সুর হয়ত আহত হবে, কিন্তু মানুষটা সমস্ত ঝঞ্ঝার মধ্যেও নিজের ভিতরে বহন করবেন কস্তূরীসৌরভ, যা সৃষ্টির ব্যক্তিগত সুখাবিষ্টতা থেকে তাঁকে বঞ্চিত করবে না কখনো। ওরেলের প্রেমে পড়েনি এমন ক্রিকেটার যদি থাকে সে নীরসতায় অভিশপ্ত। সকলেই ভালবেসেছেন তাঁকে, সবচেয়ে বেশী ভালবেসেছেন পৃথিবীর অন্য দেশের ওরেলরা। পরম ভালবাসায় আপ্লুত মুস্তাক আলী বললেন, —ওরেল? ওরেল 'আ-মা-র' ক্রিকেটার। সত্যই ওরেল ক্রিকেটারের ক্রিকেটার। ওরেল সুন্দরের সুন্দর। ওরেলের দিকে ফিরে তাকিয়ে

---

* মৎকৃত 'রমণীয় ক্রিকেট' গ্রন্থ।

রোমান্টিক অ্যাডভেঞ্চারার মুস্তাক আলী বলেছেন,—'যেদিন তাঁকে আমি প্রথম দেখেছিলুম, সেইদিনই তাঁর শরীরের সৌন্দর্য, পুরু ঠোঁটের আত্মনির্ভরতা আমাকে মোহাবিষ্ট করে তুলেছিল। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বলিষ্ঠ জৈব সত্তার প্রতীক এক সুন্দর পুরুষ ড্রেসিংরুম থেকে বেরিয়ে উইকেটের সামনে এসে দাঁড়ালেন, এবং উইকেটের খেয়ালীপনাকে প্রশ্রয় না দিয়ে অনতিবিলম্বে সম্রাটের মত মহীয়ান হয়ে নিজের জ্যোতি বিকিরণ করতে লাগলেন।' (শ্রীমুকুল দত্তের অনুবাদ)।

মুস্তাক ওরেলের খেলা দেখতে লাগলেন; দর্শকেরা মুস্তাকের আগ্নেয় আঘাতগুলি সম্বন্ধে 'ধাবিত ধূমকেতুর' যে উপমা ব্যবহার করতে অভ্যস্ত, সেই উপমাকেই মুস্তাক উৎসর্গ করলেন ওরেলের নামে,—'সবল এবং নিখুঁত সোজা ড্রাইভের সাহায্যে তিনি যখন বাউণ্ডারীর সীমানায় বল পাঠাতেন তখন মনে হত, একটা দগ্ধাবশিষ্ট ধূমকেতু প্রচণ্ড গতিতে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে।'

ওরেল শুধু ব্যাটসম্যান? না, মুস্তাকের কাছে তিনি সার্থকতম অলরাউণ্ডার। 'ওপেনিং ব্যাটসম্যান হিসাবে বিপক্ষের আক্রমণ ব্যর্থ করতে পটু, বোলার হিসাবে বিপক্ষকে ব্যস্ত করতে সদা ব্যগ্র, ফিল্ডসম্যান হিসাবে শিকারী বিড়াল; বলের পালিশ টুটে গেলে সে বলে সাপ খেলা দেখান।' ওরেল তিনবার মুস্তাককে আউট করেছেন, তবু মুস্তাক পতঙ্গের অগ্নিপ্রীতিতে বলেছেন,—'আমি ওরেলের ভক্তের ভক্ত।'

ওরেলের ভক্ত হতেই হবে মুস্তাককে, কেননা মুস্তাকই যে ভিন্ন নামে, সংশোধিত রূপে ওরেল। তাই রোদ-ঝিলমিল ক্যারিবিয়ানের হেডলি, কনস্টানটাইন, উইকস, ওয়ালকট, সোবার্স, কানহাই প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক থাকতেও ওরেল অতুলনীয় মুস্তাকের কাছে—এক অননুকরণীয় যাদুকর—যাঁর খেলার যাদু দেখতে মুস্তাক একশো মাইল পথ হাঁটতে (অভিসার?) রাজী। ক্যালিপশোর সুরে বাঁধা ওরেলের সৃষ্টির জন্য মুস্তাক পাগল।

মুস্তাক স্বয়ং বোহেমিয়ান শিল্পী। নিজেকে পুড়িয়ে তিনি প্রদীপ জ্বালান, নিজের দেহতন্ত্রা ছিঁড়ে নিয়ে বীণাতন্ত্রে যোজনা করেন। তিনি ওরেলকে আলোর আলো, সুরের সুর বলেছেন—সে ওরেলের খেলার লীলাসৌন্দর্যের ইয়ত্তা করবে কে? খেলার মাঠে যে মুস্তাক আমাদের প্রাণের রাজা ছিলেন—সে কি এই রূপসিদ্ধির জন্যই নয়? ওরেলের বন্দনার মধ্য দিয়ে আমরা শ্রেষ্ঠতর একজন মুস্তাককে কি অভিবাদন জানাই নি?

ফ্রাঙ্কি ওরেলের জন্য আমরা তাই প্রতীক্ষা করি—প্রতীক্ষা করে থাকব চিরদিন। ওরেলরা আমাদের বর্ণহীন পৃথিবীতে সু-বর্ণময়। রুশো বলেছিলেন, ফিরে যাও। প্রকৃতির কাছে থাকলে তোমরা আরও বেশী 'মানুষ' থাকবে। জীবনের হারানো আনন্দকে খুঁজে পাবে দুয়োরানীর কুটীরে। কাউন্টি খেলার ব্যবসায়িকতা যখন ক্রিকেটকে বণিকবৃত্তিতে পর্যবসিত করেছে, কিংবা শেফিল্ড শীল্ডের দুঃসাহসী ছোকরারা যখন ক্রিকেটে এনেছে ধারাবাহিক ভীতি-শিহরণ, তখন ওরেলেরা ক্রিকেটের মুক্তিদূত। বাল্যের সহজ সুস্থ পবিত্র আনন্দকে যেন খুঁজে পাই এঁদের মধ্যে,—ক্রিকেট খুঁজে পায় তার নির্মলতাকে। এখনো আমার চোখের সামনে ভাসছে ইডেন গার্ডেনে ওরেলের খেলা। শীতের দুপুরে একটি মিঠে প্রেমকাহিনীর মত অলস আনন্দের ক্রীড়াবিস্তার। আক্রমণ নেই, আঘাত নেই, শুধু ব্যাট বলের মধুস্পর্শ। সুখের খুশীর বিহ্বল বিলাস। তাঁর আঘাতকেও আঘাত বলে মনে হয়নি, এমনই আঘাতের ছন্দ। অতি বড় কঠিন কথাকেও সেদিন ওরেল বলেছিলেন কবির মতই অবহেলার লাবণ্য ভঙ্গিমায়।

ক্রিকেটের একজন কবির নাম ফ্রাঙ্কি ওরেল।

উইকসকেও দেখেছি কলকাতার মাঠে। সেই নির্মম সংহারমূর্তি দেখে মন গেয়ে উঠেছে, 'এই করেছ ভাল নিঠুর'। নিজের দলের

ক্ষতির খরচেও উইকসকে বারবার হাততালি দিয়েছি। উইকস তা আদায় করে নিয়েছেন। ক্রিকেটে দেশপূজা, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'ভূগোল পূজা' নাকি বয়ঃসন্ধিকালের দুর্বলতা। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রিকেট-রসিক মহামানবের সাগরতীরে পৌঁছে যায়, সেখানে ক্রীড়ারসের পূর্ণ ঘট যে-ই আনবে তারই মাহাত্ম্য, সে যে-দেশ থেকেই আসুক না কেন। আমি স্বীকার করছি ক্রিকেট-বিষয়ে আমার দেশপ্রীতির দুর্বলতা আছে। দুর্বলতা আমার ভালো লাগে। আর একথাও জানি, সকলে স্বদেশেই মহামানবের সাগরতীর খোঁজেন, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত। কেননা তাঁর কবিতায় আছে, এই 'ভারতের' মহামানবের সাগরতীরে।

'ভারত' কথাটা সেদিন কিন্তু ভুলে গিয়েছিলুম। 'ত্রিনিদাদ উপকূলের টর্নেডোকে' যখন উইকস কলকাতার মাঠে মুক্ত করে দিয়ে আমাদের সোচ্ছ্বাস 'সোচ্চার' হাততালি পাচ্ছিলেন, তখন কিন্তু একবারের জন্যও মনে হয়নি সদ্য টেস্টে চান্স-পাওয়া ছোট বাঁড়ুজ্জের বিদায় অভিনন্দন আমাদের করতলে বাজছে। ছোট এস ব্যানার্জি এরপর আর টেস্টে চান্স পাননি। আমরা ভুলে গিয়েছিলুম যে, সকল আঘাতে নিরুদ্বেগ ভীনু মানকদও মানুষ, বাইরে বোঝা না গেলেও আঘাতগুলো বুকে ঠিকই লাগে। আমাদের মনে ছিল না যে, উইকসের সেঞ্চুরী মানে কলকাতার মাঠে ভারতের জেতার আশা শূন্যের দিকে সরে যাওয়া, কিংবা পরপর ইনিংসে টেস্ট সেঞ্চুরী উইকসের গৌরব যত বাড়াচ্ছে, ভারতের গৌরব ঠিক সেই পরিমাণে কমাচ্ছে—অবিশ্বাস্য বিশ্বরেকর্ডটি করা হচ্ছে ভারতের বোলিং ও ফিল্ডিংকে ধূলায় মিশিয়ে। কোনো কথাই তখন আমাদের মনে হয়নি, কেবল দেখলুম, ব্যাটের তলোয়ার, বলের মৃত্যু, ফিল্ডারের বেড়ার দিকে পলায়ন। উইকস আমাদের সম্মোহিত করে, আমাদের সকল আঞ্চলিক দেশগত ও ব্যক্তিগত স্বার্থপরতাকে জয় করে একটি সুদীর্ঘ বাহবা আদায় করে নিলেন, যে বাহবা গল্পের সুপরিচিত আত্মঘাতী বাহবার তুল্য;

তরবারির অপূর্ব কৌশলে নিজ পুত্রকে বিভক্ত অথচ অবিচ্ছিন্ন দেখে দেশের প্রবীণ শস্ত্রবীর যেমন তারিফ করেছিল নবাগত চ্যাম্পিয়ানকে।

কলকাতার মাঠে আমার স্মৃতিতে সেইটেই সবচেয়ে দুর্ধর্ষ আক্রমণের ব্যাটিং। উইকস ব্যাট ধরবার পরে কোনো সময় মনে হয়নি তিনি আউট হতে পারেন। চান্স দেবার পর বুঝলুম চান্স দিলেন। ওটা একটা নিতান্ত স্বাভাবিক বস্তু যেন, শক্ত স্বাস্থ্যের হঠাৎ সর্দি, এল আর চলে গেল। তারপর আবার যথারীতি পুরনো কর্মোদ্যম। কখন 'বেজার' চল্লিশ পেরিয়ে অর্ধশত করলেন, কখন 'নড়চড়ে' নব্বুই কাটিয়ে সেঞ্চুরী পুরোল, কখন হল গৌরবময় দেড়শো, কিছুই যেন ভাল করে মনে নেই। রান করতে চেষ্টা করতে হয় না সেই প্রথম দেখলুম। ভালো ছেলের অঙ্ক কষার মত, হুড় হুড় করে তিন ঘণ্টার পেপার শেষ হয়ে গেল দু'ঘণ্টায়। ভাবনা নয়, চিন্তা নয়, রাফ নয়, কাটাকুটি নয়; ডিফেন্স নয়, স্ট্যান্সের বহর নয়, বল বুঝে খেলা নয়, সময় বুঝে মারা নয়; পাহাড়ে নদীর মত রানের স্রোত নেমে আসা হুদ্দাড় করে। তারপরে এক সময় আচমকা দেখলুম, উইকস আউট। বেশ স্বাভাবিক শেষ। একজন সফল মানুষ ৬৫ বছর বয়সে নিজের আফিসে বসে বিনা অসুখে হার্টফেল করে মারা গেলে যেমন আমাদের মনে হয়। বেশ খেলেছে, বেশ গেছে। এই রকমই ছিল সেদিন উইকসের ব্যাটিং। আমি এ জিনিস দেখিনি।

বলা বাহুল্য আমার ক্রিকেট-অভিজ্ঞতা বহু দেশব্যাপ্ত নয়। যাঁরা দু'চোখ ভরে বছরের পর বছর পৃথিবীতে নানাস্থানে শ্রেষ্ঠ খেলা দেখেছেন, তাঁরা কত সহজে উইকসের এই ইনিংসটিকে অবহেলা করতে পারেন, কি জানি! তবু সব দেখাই শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত দেখা। ব্র্যাডম্যানের যে ইনিংসটি একজনের কাছে ধারাবাহিক কসাইবৃত্তি, তার মধ্যেই হয়ত অন্য একজন রনজিরও অসাধ্য লাবণ্য খুঁজে পেলেন। কোনটি যে শেষ ভালো তা বলবার অধিকারী পুরুষ কে আছেন জানি না। ক্রিকেট তো খেলা, অনিত্যের মধুপান,—যেখানে নিত্য বৃন্দাবন,

সেখানেও রাসকেন্দ্রে কখনো কৃষ্ণ কখনো রাম কখনো বুদ্ধ কখনো যীশু।

ইডেনে ভালো ব্যাটিংয়ের স্মৃতি মনে আনবার চেষ্টা করছি। আমার খেলার গুরু পি. চৌধুরীকে বললে তিনি স্বপ্নমাখানো কয়েকটি, সায়েবী ইনিংস এনে হাজির করবেন। মিত্তিরদাকে বললে তিনি সি কে, উজীর আলীর মধ্যজীবনের কোনো কীর্তিকে স্মরণ করতে উৎসাহী হবেন। আমারও মনে পড়ছে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য খেলা। অস্ট্রেলিয়ান সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে মার্চেন্টের দেড়শো, কিংবা কমনওয়েলথের বিরুদ্ধে বিজয় হাজারের ১৭৫। তৃতীয় কমনওয়েলথ দলের বিরুদ্ধে উমরিগরের ও রামচাঁদের সেঞ্চুরী। দীপক সোধন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কলকাতার মাঠে দেখিয়েছিলেন টেস্টে প্রথম অবতরণ কতখানি মূল্যবান হতে পারে। ১৯৫৯-৬০ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে জয়সীমার ব্যাটিংও দেখলাম। বেশ কয়েকবার দেখেছি বোরদের শিল্প। ১৯৪৮-৪৯-এ ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে মুস্তাকের 'সংযত' সেঞ্চুরী মনে পড়ে, নিতান্ত প্রয়োজনের ক্ষণে ফাদকারকে সেঞ্চুরী করতে দেখেছি। লিভিংস্টোনের বাঁ হাতের মার মনে আছে, মনে আছে ব্রুস ডুলাণ্ডের ভারতের আশা-ডোবানো ব্যাটিং। এর সঙ্গে সগৌরবে যুক্ত হবে ও'নীল ও নীল হার্ভের দীপ্তি। ১৯৫৭ সালে বৃষ্টিভেজা মাঠে নীল হার্ভের 'চকিত চমকে চরণ বিচরণের' কবিতা মনে এখনো গুঞ্জন তোলে, জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে চোখের সামনে ১৯৫৯-৬০-এর ও'নীলের স্থির দ্যুতি। আর কানহাই—১৯৫৮-৫৯ সালে তাঁর ডবল সেঞ্চুরীর তুল্য পরম সুন্দরের নিঃশব্দ রচনা অল্পই সম্ভব। সর্বশেষ ডেক্সটার—শালীন সৃষ্টিতে গরীয়ান প্রতিভা। এবং আরও ইনিংস, আমার বিস্মৃতিকে ক্ষমা করে আপনারা তালিকাপূরণ করে নেবেন। কিন্তু এরা কেউই দাঁড়ায় না উইকসের ইনিংসের কাছে। কেবল একটি ইনিংস নিয়ে দ্বিধায় আছি, অমরনাথের ইনিংস—১৯৪৬-৪৭ সালে ইংলণ্ড-প্রত্যাগত দলের পক্ষে অবশিষ্ট ভারতের বিরুদ্ধে তাঁর ২৬২। সে জিনিস

হয়ত উইকসেরও অসাধ্য। অনেক দিনের কথা, সে খেলার খুঁটিনাটি মনে নেই, তবে এইটুকু বলতে পারি—সেই বজ্রবিদ্যুৎ মেশানো সাইক্লোনটি ব্যাটমুক্ত করতে পারেন অমরনাথ, একমাত্র অমরনাথই।

উইকসের ইনিংসের মূল্য অন্য দিক থেকে। অমরনাথের মাতামাতি মিলারও দেখিয়ে গেছেন ১৯৪৫ সালে। অনুরূপ স্বচ্ছন্দ মহিমায় না হলেও উড়নচণ্ডী রূপ দেখেছি সি এস নাইডুর হাতে কয়েকবার। ব্যাটিংয়ের দুরন্ত অসভ্যতা কম দেখাননি রামচাঁদ। কিংবা মুস্তাক (আহা, বাঙালীর মুস্তাক!) কিভাবে না ফণাধরা সাপের মত উইকেটের উপর হেলেছেন দুলেছেন। এর কোনো দিক দিয়ে গ্রহণ করছি না উইকসের খেলাকে, আমার কেবল মনে পড়ছে তার স্বাভাবিকতা; তার অনায়াস প্রত্যয়; তার নিখুঁত সংহার; তার অচঞ্চল সমাপ্তি। দুঃসাহসের অতিবিস্তার কিংবা লীলার পেখমবিলাসের বদলে উইকস যা দিয়েছিলেন তাকে এক কথায় বলতে পারি, সহজ পৌরুষের স্বাভাবিক বীরকর্ম। ক্রিকেটের জনৈক বোদ্ধা বলেছেন, উইকসের শক্তির মূলে আছে একদিকে তাঁর প্রস্তরতুল্য আত্মরক্ষা-শক্তি, অন্যদিকে যে-কোনো শিথিলকে প্রতিঘাত করবার মতো নির্ভুল নির্মমতা। হয়তো।

আমি জানি না ইডেন গার্ডেনে তৃতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে উইকস যে সেঞ্চুরী করেছিলেন, সচরাচর তিনি ঠিক সেইভাবেই খেলেছেন কি না? অন্তত অন্য একটি ক্ষেত্রে যে খেলতে পারেননি, তা আমি নিজের চোখে দেখেছি। ভীরুতায়, অস্বস্তিতে, ভুল মারে কলঙ্কিত আরো একটি টেস্ট সেঞ্চুরী একই খেলায় উইকস করেছিলেন দ্বিতীয় ইনিংসে। রেকর্ডবুক উইকসের নামের পাশে জ্বলজ্বলে অক্ষরে সেই সেঞ্চুরীটাও লিখে রেখেছে। আমি জানি, না লিখলেই ঠিক কথা লেখা হোত।

উইকস ওরেলের মত নন, তিনি রান করতে ভালবাসেন। ওরেলকে শিল্পী বলতে কারো এক মুহূর্ত দ্বিধা হয় না। কিন্তু উইকস?

শিল্প জিনিসটা আসলে কি? ওরেল নিশ্চয়ই শিল্পী। উইকস কি তবে কারিগর? বলতে বড় লোভ হচ্ছে, ছেঁদো কথার মধ্যে সহজে জড়িয়ে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু আমি কি সঠিক জানি ও দু'টোর মধ্যে ভেদরেখা কোথায়? আপনারা আমাকে সাহায্য করার চেষ্টা করতে পারেন, বোঝাতে পারেন যে, যেখান সৃষ্টির মধ্যে সৃষ্টি-যন্ত্র লুপ্ত হয়ে থাকে, সেখানে শিল্পের আবির্ভাব। দেখুন, ওসব কথাগুলো আলঙ্কারিক তত্ত্বরূপে আমিও জানি, অন্যকে হয়ত বলেছিও, কিন্তু ঠিক বিশ্বাস করে ওঠবার মত মনের জোর জোগাড় করে উঠতে পারিনি। উইকসকে না-শিল্পী বলবার শক্তি আমার কোথায়?

আপনারা উইকসকে দেখেছেন, আপনারা নিজের মত করে একটা সিদ্ধান্ত করে নেবেন, আপনাদের সুবিধার জন্য বিখ্যাত জন আর্লটের লেখার কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি। ১৯৫০-এ ট্রেন্ট ব্রিজের তৃতীয় টেস্ট ওরেল-উইকস জুটির যুগ্ম তেজে দীপ্ত। এই খেলায় ওরেল অনেক বড় হয়ে ধরা পড়েছিলেন। স্যার পেলহ্যাম ওয়ার্নার তাঁর দীর্ঘ জীবনে ওরেলের এই খেলার চেয়ে বড় ইনিংস দেখেননি। ক্রিকেটের বাৎসরিক বাইবেল উইসডেনে ওরেলের এই খেলা দেখে লেখা হয়েছিল, 'মারের সৌন্দর্যে ক্রিকেটের ইতিহাসে এ পর্যন্ত ওরেলকে কেউ অতিক্রম করতে পারেন নি।' যে খেলায় ওরেলের মাহাত্ম্য তুলনায় অধিকতর স্পষ্ট, সেই খেলার বর্ণনা গ্রহণ করছি উইকসকেও প্রকাশ করার কাজে।—

"উইকসের প্রথম যে চারিটি মার থেকে রান এল, তার মধ্যে তিনটিই বাউণ্ডারী। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তবু মনে হতে লাগল, তিনি ওরেলের সাহায্যকারী—যে প্রচণ্ডতায় ওরেল কাজ সুরু করলেন।... যখন অ্যালান রে আউট হয়েছিলেন তখন ওরেলের রান ছিল ১১০। এর পর ২৯টি বলে সেই রান পৌঁছল ১৪৫-এ।...

"...উইকসও দ্রুত পদক্ষেপে যাত্রা সুরু করলেন, কিন্তু ওরেল এগিয়ে রইলেন দ্রুততর গতি বজায় রেখে। সেই অপরাহ্নে অন্যমনস্ক

থাকা কোনো দর্শকের পক্ষেই সম্ভব ছিল না। একে বলে ব্যাটিং, মহান ও রাজকীয়, যদিও গতিতে চূড়ান্ত। খেলার প্রত্যেকটি মার পড়তে লাগল, স্বচ্ছন্দ ও সামঞ্জস্যময় মারগুলি, কিন্তু বল ছুটতে লাগল বন্য বেগে। ইংরেজদের ফিল্ডিং অদ্ভুত,—ইয়ার্ডলে, সিম্পসন, ওয়াশব্রুক, ইনসোল, জেঙ্কিনস্, স্যাকলটন, পার্কহাউস—সকলে যেভাবে বল থামাতে লাগল সে অলৌকিকের কাছাকাছি, তবু বহুক্ষেত্রে মাত্র গজ খানেক দূর দিয়ে ছুটে যাওয়া বল তাঁদের পক্ষে স্পর্শ করা সম্ভব হল না।...

"...আজকের ফর্ম অনুযায়ী ওরেল উইকস স্পষ্টত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দু'জন আক্রমণাত্মক ব্যাটসম্যান। এঁদের মধ্যে প্রথম দ্বিতীয় ভেদ করার চেষ্টা করা বোকামি। তবু এই অপরাহ্নে উভয়ে এমনভাবে একসূত্রে গাঁথা হয়ে গেছেন যে, তুলনামূলক বিচার খুবই আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। দুজনেই মারে সেই বাড়তি বেগটুকু যোগ করে দিতে পারেন, যা অন্য সাধারণ ব্যাটসম্যানের কল্পনারও বাইরে। ওরেল তাঁর সহযোগীর চেয়ে দীর্ঘতর, অধিক নমনীয়, তাঁর অধিকাংশ স্ট্রোকের মধ্যে শিথিল সুখের আমেজ আছে, মারগুলো নিজের খুশীতে ছড়িয়ে পড়ুক—তার মধ্যে রয়েছে এই ধরণের আয়েসী উদাসীনতা। ওরেলের কব্জি এমনিতে পেলব, অথচ অদ্ভুত পেশীশক্তিতে সতেজ, ঠিক আঘাতের ক্ষণটিতে এমন তীব্রতাস্পর্শ সঞ্চারিত করে দেয় যে, বল-গুলো ছুটে যায় আশ্চর্য গতিতে। তুলনায় খর্বকায় ও মজবুত চেহারার উইকসের পদসঞ্চারণ এতই ক্ষিপ্র যে, এক মার মারতে গিয়েও মত পরিবর্তন করে দ্বিতীয় মার মারবার মত সময় তিনি করে নিতে পারেন বল পৌঁছবার আগেই। যে সুন্দর লেংথের বলকে সাধারণ ব্যাটসম্যান মাত্র ঠেকাতে বা কোনোক্রমে ঠেলে সরিয়ে দিতে পারেন, উইকস তাঁর গেছো বিড়ালের মত শরীর-পটুতার জোরে সেই বলকেই যথেচ্ছ পিটিয়ে যান।...উইকসের মারের মধ্যে থাবা-মারার ভঙ্গি আছে...অনেকটা মুষ্ট্যাঘাতের তুল্য।...

"ব্যাটসম্যান দু'জন যখন চা-পানের জন্য গেলেন, তখন তিন উইকেটে ৩৩৯। ওরেল১৭৩, উইকস৩৫। চা-পানেরবিরতি অন্যকোনো পরিবর্তন আনল না, কেবল নিঃশ্বাস ফেলবার সুযোগ দিল দর্শকদের। চা-পানের পর আবার বেডসার, ইয়ার্ডলে, স্যাকলটন, হোলিজের উপর যথারীতি কাজ সুরু করলেন দু'জনে। চা-উত্তর কালে উইকস করলেন ৯৪, ওরেল ৮৮। দু'জন ব্যাটসম্যানের একসঙ্গে অতি দ্রুত রান তোলার এ এক অসম্ভব দৃশ্য! সাধারণত দুজনের একজন তুলনায় শ্লথগতি হয়; এ ক্ষেত্রে কেউ কাউকে একটুও ছাড়িয়ে যেতে পারল না। যদি ওরেলের পরিমার্জন বেশী থাকে, উইকসের আছে চোখের পলকে কার্য-সমাধার অতুলনীয় সাহস। হোলিজকে যেভাবে মারা হচ্ছিল তাতে ব্যাটিং সম্বন্ধে ধারণায় বিপ্লব এসে গেল। এইভাবেই চলল দিনের শেষ পর্যন্ত—অধীর সৌন্দর্যের উচ্ছলতা—যে-জিনিস এ জীবনে হয়ত আর দেখব না।"

শিল্পের পক্ষ থেকে উইকসের বিরুদ্ধে যদি কিছু আপত্তি করার থাকে, সে হল তাঁর মধ্যে যতখানি প্রবলতা, ততখানি নয় প্রশান্তি। গর্জনের অন্তর্লীন মৌনের সঙ্গীতে ওরেলের ব্যাটিং মহিমান্বিত। উইকসের মানসিক গঠন সেই সুস্থিরতা তাঁকে দেয়নি। আরো আরো চাই—এই কামনায় তিনি অধীর। সে একটা দস্যুবৃত্তি, সবল অপহরণ। প্রত্যেকটি বল উইকসের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ, তাকে গ্রহণ করতে তিনি সদাপ্রস্তুত। তাঁর ব্যাটিং ধারাবাহিক রোমাঞ্চ; কিন্তু এত প্রদীপ্ত যে, রহস্যে বঞ্চিত। একটা গোটা অস্ত্রাগার তাঁর আয়ত্তে আছে এবং যে কোনো অস্ত্রপ্রয়োগে তিনি অকুণ্ঠ। কেউ যদি এক ইনিংসে তাঁকে অল্পে আউট করে দেয়, তার বিরুদ্ধে আছে উইকসের সতর্কবাণী, ঠিক আছে, প্রতিফল পাবে। ডবল সেঞ্চুরীর পরে আউট হয়েও উইকস অসুখী, আউট হতে তাঁর ভালো লাগে না। ভালো লাগে খেলতে, যত বেশী পারেন। ১৯৪৮-৪৯ সালে ভারতের সঙ্গে প্রথম টেস্টে যখন তিনটে উইকেট পড়ে গেল ২৭ রানে, মাত্র

২ রান করে সুপ্রসিদ্ধ জর্জ হেডলি ফিরে এলেন,—উইকস বললেন, জর্জ, তোমার রানটাও কি আমাকে করে আসতে হবে? বেশ সুখের সঙ্গেই কথাগুলো বলেছিলেন। কথাও রেখেছিলেন মোটামুটি; অবশ্য একলা নয়। উইকস করলেন ১২৮; ওয়ালকট রান-আউট ১৫২; গোমেজ ১০১, ক্রিশ্চিয়ানী ১০৭। মোট ৬৩১।

ভারতবর্ষ উইকসকে চরমতম গৌরব দিয়েছে। পরপর ইনিংসে পাঁচটি টেস্ট সেঞ্চুরীর চারটি ভারতেই হয়েছে। নিজের দেশে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে করে এসেছিলেন ১৪১। তারপরে ভারতে প্রথম টেস্টে স্বদলের একমাত্র ইনিংসে ১২৮, অনুরূপভাবে দ্বিতীয় টেস্টে ১৯৪, তৃতীয় টেস্টে কলকাতার দু' ইনিংসে ১৬২ ও ১০২। চতুর্থ টেস্টে প্রথম ইনিংসে ৯০ রানে রান-আউট। ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানরা ভারতে নিজেদের খেলা সম্বন্ধে বলত, অরণ্যে প্রত্যাবর্তন। আর উইকসের খেলা? সেই মারধর লুটপাট-করা ব্যাটিং দেখে ক্যারিবিয়ান সাগরে জলদস্যুদের ঐতিহ্যবাহী বলে উইকসকে নির্দেশ করতে বাধ্য হয়েছেন কোনো কোনো ক্রিকেট-লেখক।

শরীরের গঠনবিচারে মনের গঠনের রূপ বলতে পারা যায় কি না সে বিষয়ে মতভেদ আছে। কিন্তু নির্ভয়ে বলা যেতে পারে, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ত্রয়ীর চেহারা তাঁদের ব্যাটিং-চরিত্রের দ্যোতক। দীর্ঘাকার, শান্ত-মূর্তি, স্বপ্নচক্ষু, লাবণ্যস্নিগ্ধ ওরেল। প্রসন্ন গাম্ভীর্যে আয়ত। উইকস দীর্ঘহস্ত, কিছু খর্বকায়, ঝোঁকানো কাধ এবং বলিষ্ঠ গঠন। চোয়ালের হাড় দুটো উঁচু, ক্ষুদ্র তীক্ষ্ণ চোখ এবং হ্রস্ব কপালে অতি গভীর কয়েকটি রেখা। ওয়ালকট দৈত্যাকার, বিশাল চেহারায় সরল শক্তির অবিদগ্ধ প্রকাশ। তিনজনের ব্যাটিংয়ের রূপও তাই—মর্যাদায় লাবণ্যে অনতিক্রান্ত ওরেল, আঘাতে আক্রমণে উন্মত্ত উইকস, ঋজু শক্তির বহির্বিকাশে সুদৃঢ় ওয়ালকট।

ওয়ালকট নিজের মনে হেসে ফেললেন। তাঁর নাকি ডেন্টিস্ট হবার কথা হয়েছিল। বার্বাডোজের মহাভাগ্য, ওয়ালকটের হাতে সাঁড়াশি পড়েনি। পড়লে কি হোত— সে কথা ভেবেই ওয়ালকট হেসে অস্থির।

কেঁদে আকুল ওয়ালকট। ড্রেসিংরুমে শুয়ে পড়ে দুই হাতে মুখ ঢেকে ছটফট করতে করতে বাইশ বছরের বিশাল বালক ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।....আমি পারব না...ওখানে যেতে পারব না...না কিছুতে না...।

কি, না, ওয়ালকট একটি সেঞ্চুরী করেছেন। ১৯৪৮-৪৯ সালে অক্টোবরে ভারতে প্রথম খেলা ওয়েস্ট ইণ্ডিজের, ব্রাবোর্ন স্টেডিয়ামে সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে। রৌদ্রোজ্জ্বল ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সন্তানেরা এসে দেখল, ভারতের ভয়াবহ সূর্য সকল সহ্য-শক্তির বাইরে। ছায়াতেও একশো ডিগ্রি উত্তাপ। তাই অন্য ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান খেলোয়াড়েরা ইচ্ছে করে আউট হয়ে গেল ৩০।৪০-এর মধ্যে। সেইটেই বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু ওয়ালকটের পক্ষে ভাল রানের প্রয়োজন আছে, এখনো টেস্টে স্থান সুনিশ্চিত হয়নি। সুতরাং সেঞ্চুরী করতে হল— সে সেঞ্চুরীর সামান্যতম স্মৃতিও ধোঁয়াটে মন থেকে ওয়ালকট বার করতে পারেন না। বন্ধুদের কাছ থেকে শুনেছিলেন তিনি নাকি ৯৪ রানের মাথায় ওভার বাউণ্ডারী করেছিলেন। চা-পানের সময় ড্রেসিংরুমে ঢুকেই—আর পারলেন না—ভেঙে পড়লেন। ৬ ফুট সাড়ে তিন ইঞ্চি লম্বা এবং সেই অনুপাতে চওড়া একটি পুরুষের পক্ষে প্রকাশ্যে কাঁদার চেয়ে হাস্যকর জিনিস কম আছে, সেটুকু সচেতনতা ছিল, তবু কষ্টের কান্না বাঁধ মানল না...আমি যাব না...ওখানে যাব না...।

তা বাইশ বছর অল্প বয়স ছাড়া আর কি। যৌবনের সূচনা হয়েছে কিন্তু বালকত্ব যায়নি। কান্না হাসি দুইই স্বাভাবিক তখন। যারা টেস্ট খেলতে আসে আমরা ধরে নিই তারা পোড়-খাওয়া পুরুষ।

সব সময় যে তা নয়, একথা স্মরণ করিয়ে দিতে পারি ওয়ালকটের ঘটনা থেকে।

নিজের কাহিনী লিখেছেন খোলাখুলি ভাষায়। প্রথম যৌবনের সাফল্য, পরবর্তী ব্যর্থতা, আবার সাফল্য, আবার ব্যর্থতা। সাদা ভাষায় নিরাবেগ ভঙ্গিতে লেখা। সেই 'দ্বীপপুঞ্জের ক্রিকেটার'-দের বিবরণী থেকে আমরা অনেক কিছু জানতে পেরেছি।

যেমন ভারত সম্বন্ধে। এদেশ বিশেষ খুশী করেনি ওয়ালকটকে। কারণ অনেক,—যথা অসহ্য উত্তাপ কিংবা জঘন্য হোটেল। কম পয়সায় সারতেই ব্যস্ত ছিলেন ভারতীয় কর্তারা। খেলোয়াড়রা এধার ওধার দু'চারটে সুন্দরী মেয়ে দেখেছেন, কিন্তু ভারতের সামাজিক জীবনের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ দেওয়া হয়নি তাঁদের। দিনের পর দিন ক্রিকেটাররা একই মুখ দেখেছেন (নিশ্চয়ই বিশ্রী মুখ!) —ওয়ালকট দুঃখ করে বলেছেন, খেলোয়াড়েরাও মানুষ।

ভারতের ক্রিকেট সম্বন্ধে বেশী কিছু প্রশংসা করার নেই তাঁর, কিন্তু নিন্দে করার আছে আম্পায়ারিং বিষয়ে। আর যাই হোক, অন্ততঃ 'ফার্স্ট ক্লাস' নয় ভারতের আম্পায়ারিং। অনেক সিদ্ধান্তই ওয়ালকটের পছন্দ হয়নি— বিশেষভাবে, উপর্যুপরি ইনিংসে ষষ্ঠ টেস্ট সেঞ্চুরীর মুখে ৯০ রানের মাথায় উইকসকে রান-আউট দেওয়া। তবে এই বিচারবিভ্রাটের কিছু ক্ষতিপূরণ করেছেন 'পিটার' সেন। তিনি উইকসের চারটি টেস্ট সেঞ্চুরীর প্রতি ইনিংসে উইকসের খেলায় বিশেষভাবে মুগ্ধ হয়ে একটি করে ক্যাচ ছেড়েছেন।

প্রচুর রান হওয়া সত্ত্বেও ভারতে খেলা জমেনি। ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে কেউই তাঁকে তৃপ্ত করতে পারেননি। মানকদ অবশ্য বড় খেলোয়াড়, যদিও টেস্টে তাঁর খেলা হতাশাজনক। পৃথিবীতে অল-রাউণ্ডার পর্যায়ে মিলার ও বেইলীর পরেই মানকদকে ফেলা যায়। পরবর্তীকালে প্রখ্যাত পাকিস্তানী বোলার ফজলমামুদ কিন্তু সেইসময় ফাদকার বা ব্যানার্জির চেয়ে বড় বোলার ছিলেন না।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে শ্রেষ্ঠ ইনিংস হল পাতিয়ালায় অমরনাথের ২২৩ নট আউট। বোম্বাইয়ে শেষ টেস্টে পরাজয়ের মুখে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ কর্তৃক অসাধু কালহরণের চেষ্টা বলে যা নিন্দিত হয়েছে, ওয়ালকট বলেছেন, সে সমালোচনা বা ধিক্কারের অনেকখানি অতিরিক্ত দেশপ্রীতি থেকে এসেছে। সেই অপ্রীতিকর টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের আচরণ সম্বন্ধে ওয়ালকটের বক্তব্য,—অনুরূপ অবস্থায় ভারত কি করত?

ভারতেই ওয়ালকট 'প্রাপ্ত বয়স্ক' হলেন; ভারতের খেলা তাঁর উঠতি বয়সের পথহাঁটা। এর পরেই চলে যাবেন ইংলণ্ডে। সেখানে নামের গুণে জুড়ে যাবেন ওরেল-উইকসের সঙ্গে। ইংলণ্ডের সাংবাদিকরা তিন ডব্লিউকে বন্ধনীভুক্ত করতে দেরী করবেন না। তদুপরি আবার বার্বাডোজে তিনজনের জন্ম এবং মাত্র আঠারো মাসের মধ্যে। সাংবাদিকদের সুবিধের শেষ নেই।

ওয়ালকট বলেছেন, শব্দ মোহ। নচেৎ প্রতিভায় নিম্নস্তরের তাঁকে ওরেল-উইকসের সঙ্গে একসূত্রে গাঁথবার কি কারণ থাকতে পারে?

এইখান থেকে ওয়ালকটের উত্থানের সূচনা। সার্থকনামা হতে হবে। ওয়ালকটের সংগ্রাম সুরু হয়।

"থ্রি ডব্লিউ-এর সঙ্গে যুক্ত হওয়া ব্যাপারটা গোড়ার দিকে আমার কাছে বোঝার মত ছিল—রীতিমত অস্বাচ্ছন্দদায়ক। এভার্টন এবং ফ্রাঙ্কের খেলা দেখলে আনন্দ হয়। আমি তাই অনুভব করলাম যে, তাদের সঙ্গে বন্ধনীবদ্ধ হয়েছি, সুতরাং দেখতে হবে তাদের যেন ডুবিয়ে না দিই। তাদের সুউচ্চ স্তরে উঠতে অবশ্য রীতিমত সাধনার প্রয়োজন।"

ভারতে এবং ইংলণ্ডে ওয়ালকট রান করেছেন যথেষ্ট। যে প্রশংসা পেয়েছেন তার ধরন—ওয়ালকট আত্মরক্ষাকারী অথচ জোরালো ব্যাটসমান। সাধারণ খেলায় অদ্ভুত খেলেন। যথেষ্ট

দৈর্ঘ্যের জন্য তাঁর পক্ষে কিছু সর্ট লেংথ বলকে অতি তীব্র জোরের সঙ্গে মারা সম্ভব। উইকেটকীপার রূপে তিনি যথাসম্ভব কম ভুল করেন এবং ক্রমেই উন্নতি করছেন। একজন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় খেলোয়াড় ইত্যাদি।

এরও আগে ক্রীড়াজীবনের সূচনায় দৃষ্টিশক্তি, শরীরের দৈর্ঘ্য ও সামর্থ্যের দ্বারা ওয়েস্ট ইণ্ডিজে রান করেছেন প্রচুর। বাবার কোলে চড়ে স্পোর্টসের দোকানে গিয়ে শিশু ওয়ালকট ব্যাট তুলে নিত—তার পক্ষে স্কুলজীবনে রান তোলা শক্ত হয়নি। স্কুলে থাকতেই তৃতীয় উইকেটে 'বুগলস' উইলিয়ামসের সঙ্গে একত্রে ৩০০ রান করেছিলেন,—যা স্কুল ক্রিকেটের রেকর্ড। এই সময়েই একদিন বন্ধুত্ব হয়ে গেল ওরেলের সঙ্গে।

সে বন্ধুত্ব চিরদিনের। 'প্রথম সাক্ষাতেই আমরা গভীর বন্ধু হব—আমাদের দুজনের ক্রীড়াজীবন এক সাথে মিশে যাবে। বালক ফ্রাঙ্ক যখন স্কুলের এ-টিমে উন্নীত হল, আমারি মত তখন সে নিছক বোলার, তার ব্যাটিংয়ের দাম নেই।...আমাকে ফ্রাঙ্কের কথা অনেক বলতে হবে, কারণ তার কাহিনী আমারও কাহিনী এবং আধুনিক ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেটের কাহিনী।' উইকসের সঙ্গে পরিচয় হল বেশ কিছু বছর পরে, যখন ওরেল উইকস ওয়ালকট তিনজনেই বার্বাডোজের পক্ষে খেলবার জন্যে নির্বাচিত হলেন। উইকসও মূলত বোলাররূপে দলে স্থান পেয়েছিলেন। কি বিচিত্র! যুদ্ধোত্তর ক্রিকেটের দুজন সেরা ব্যাটসম্যান দলে ঢুকলেন বোলাররূপে, এবং ওয়ালকটের প্রবেশ উইকেটকীপার হয়ে! ১৯৪৫ সালেই ত্রিমূর্তি সম্পূর্ণ হল, অবশ্য নামকরণ হবে পাঁচবছর পরে—১৯৫০ সালে ইংলণ্ডে।

১৯৪৬ সালে ক্রিকেট জগতে ওয়ালকটের নাম শোনা গেল প্রথম। ত্রিনিদাদের বিরুদ্ধে ওরেলের সঙ্গে জুটিতে চতুর্থ উইকেটে রান করলেন ৫৭৪। ওয়ালকট ৩১৪ নট-আউট, ওরেল ২২৫ নট-আউট। অনেক রেকর্ড এর দ্বারা ভাঙলেন এবং গড়লেন। চতুর্থ

উইকেটে আগে বিশ্ব-রেকর্ড ছিল ওরেল-গডার্ডের ৫০৪। যে কোনো উইকেটের বিশ্বরেকর্ড ছিল সাটক্লিফ-হোমসের ৫৫৫। দুটি রেকর্ডই ভাঙল। তবে ক্রিকেটের ভঙ্গুর রেকর্ডের রেকর্ড অনুযায়ী এই রেকর্ডও ভাঙবে অবিলম্বে—হাজারে ও গুলমহম্মদ ১৯৪৬-৪৭ সালে করবেন জুটিতে ৫৭৭ রান।

পৌনে ছয় ঘণ্টায় হয়েছিল ৫৭৪। দর্শকদের আমোদের পরিমাণ বুঝতে পারি। তুলনায় কম রান করলেও ওরেল ছিলেন অনবদ্য। ওয়ালকট চান্স দিয়েছিলেন কয়েকবার। বিভ্রান্ত ফিল্ডাররা বোধহয় সুযোগ নেবার অবস্থায় ছিল না।

ওয়ালকট স্পষ্ট কথার মানুষ। কবিতা তাঁর আসে না, নিছক গদ্য,—চড়া ধরনের জোরালো লেখা। গুণ দেখলে বলেন, দোষ দেখলেও, দয়ামায়া না রেখেই। বিনয়ে বা গুপ্ত অহঙ্কারে ভোগেন না। পরিষ্কার করেই বললেন,—মাটি ছোঁয়ার আগে রামাধীনের অফব্রেক থেকে লেগব্রেক তফাৎ করা যায় না?—রাবিশ। একদিন শুধু বিকেলে নেটে তাকে দেখেছিলুম, তারপরে সহজেই বুঝে নিলুম। যদি না বুঝতুম, তাহলে উইকেটকীপিং করতুম কি করে তার বলে? সুভাষ গুপ্তে? হাঁ, ১৯৫২-৫৩ সালে সে খুবই বড় বোলার, ঐ শ্রেণীর লেগস্পিনার ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বহুকাল দেখেনি। সে পৃথিবীর সর্বোচ্চ শ্রেণীতে পড়ে,—ক্লুস ডুল্যাণ্ড, সিসিল পেপার, ডগলাস রাইট তাঁদের শ্রেষ্ঠ রূপেই মাত্র গুপ্তের সমতুল। আর হাঁ, আমাদের দলের মধ্যে শুধু আমি আর এভার্টন তার গুগলিকে নিশ্চিত ভাবে বাছতে পারতুম; সে আমাকে মাত্র একবারই ঐ সিরিজে আউট করতে পেরেছে,—তৃতীয় টেস্টে, ৩০ রান করার পরে স্টাম্পড, এবং সে এভার্টনকে নিয়েছে দু'বার,—এভার্টন ২০৭ ও ১০৯ রানে পৌঁছবার পরে অবশ্য।

ওয়ালকট মোটে পছন্দ করেননি লেন হাটনকে। হাটনকে জাত প্রফেশন্যাল বলেই মনে হয়েছিল তাঁর। হাটন বড় খেলোয়াড়

নিশ্চয়ই, কিন্তু আর কোথাও বড় কি? ১৯৫৩-৫৪ সালে এম সি সি-র কদর্য সফর ওয়ালকট ভুলতে পারেন নি। ঐ সময়ে ট্রুম্যানের গুণ্ডামির চেয়ে জঘন্য লেগেছিল হাটনের ভণ্ডামি। ওয়ালকট অনেক নমুনা দিয়েছেন, মাত্র একটাই আমি তুলে ধরছি :—

"জর্জ হেডলি প্রথম টেস্টে দলে এলেন।...তিনি আগের টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন ২৪ বছর পূর্বে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে। দ্বিতীয় দিনে লাঞ্চের ঠিক আগে হেডলি উইকেটে এলেন। আমি অপরপ্রান্তে ব্যাট করছিলাম। পরের ঘটনা, আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি, একক ঘটনারূপে এই সিরিজে সর্বাধিক ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। হেডলি প্রথম যে বল খেললেন, হাটন সেই বলে তাঁকে একটি সিঙ্গলস নিতে দিলেন। বলটি ছিল ওভারের শেষ বল। হেডলি অপরপ্রান্তে যাওয়া মাত্র লাঞ্চের আগে শেষতম ওভারে হাটন ট্রুম্যানকে ডাক দিলেন হেডলির উপর বল ছুঁড়বার জন্য। ভয়াবহ রকমের বাম্পার মেশানো একটি ওভার উপহার দেওয়া হল তাঁকে। সেটাই স্বাভাবিক, আধুনিক টেস্ট ক্রিকেট অনুযায়ী কিছুমাত্র দোষ নেই তাতে,—নতুন যে নামবে তাকে দলের বৃহত্তম কামানের মুখে ফেলে দাও। কিন্তু তিক্ততা সৃষ্টি হল হাটনের বিবৃতিতে। ঘটনার বেশ কিছুদিন পরে হাটন জানালেন, বুড়ো হেডলিকে খাতির করে তিনি সিঙ্গলস ছেড়ে দিয়েছিলেন, কেননা তিনি সহজেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, বৃদ্ধ মানুষটির এইটেই শেষ টেস্ট।

"হাটনের মনে কি ছিল আমি বলতে পারি না, তাই তাঁর ব্যাখ্যানকে সোজাসুজি মিথ্যা উক্তি বলতে পারছি না। কিন্তু হাটনের মত নির্দয় কঠিন অধিনায়কের পক্ষে কোনো কিছু ছেড়ে দেওয়া—হোক না সিঙ্গলস—কেমন যেন অস্বাভাবিক ঠেকে, সেটা যেন তাঁর চরিত্রের সাধারণ ধর্মের বিরোধী সত্য—বিশেষত খেলাটা যখন টেস্ট খেলা, যে খেলার উপর এম সি সি-র মর্যাদা নির্ভরশীল। হাটন ছাড়া প্রায় সকলের কাছেই মনে হয়েছিল, সিঙ্গলস নিতে

ও জিনিস ঘটেনি, খুবই দুঃখের বিষয়, যার ফলে ত্রয়ীর ত্রয়ী কাণ্ড অসম্পূর্ণ থেকে গেল।

ওয়ালকট ইতিমধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছেন। ত্রয়ীর অন্তর্ভুক্ত হবার যোগ্যতা নিয়ে আর কেউ প্রশ্ন তুলবে না। যথেষ্টই যোগ্য, তবে ত্রয়ীর মধ্যে তৃতীয়। কিন্তু মনে মনে অশান্ত থাকবেন ওয়ালকট। স্বাভাবিক প্রতিভায় যদি না হয়, সৌন্দর্যের হিসাবে যদি হারও মানেন, তবু জিততে হবে একবার সাধন-শক্তিতে। সেদিন সর্বোপরি, ত্রয়ীর প্রথমে ওয়ালকট।

অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন। ওরেলের কাব্য, উইকসের উপন্যাসকে সরিয়ে দিয়ে ওয়ালকটের ইতিহাস এগিয়ে এসেছিল। ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন তিনি। ১৯৫৫ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে পরপর পাঁচটি টেস্টে সেঞ্চুরী করলেন, অতিক্রম করলেন ভারতের বিরুদ্ধে করা উইকসের একটি টেস্ট সিরিজের মোট রানসংখ্যাকে। এই সিরিজে দু'বার উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী করলেন, যা একমাত্র হেডলিই পেরেছেন। অ্যাভারেজ দাঁড়িয়েছিল ৮২·৭০। ভারতের বিরুদ্ধে উইকস করেছিলেন ৭৭৯ রান টেস্টে, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওয়ালকট করলেন ৮২৭। উইকসের পক্ষে যদি বলা যায় তিনি কম ইনিংস খেলবার সুযোগ পেয়েছিলেন, বিপক্ষে বলা যাবে খেলেছিলেন ভারতীয় বোলিংয়ের বিরুদ্ধে। ওয়ালকট রান করেছিলেন অস্ট্রেলিয়ানদের বিপক্ষে।

পৃথিবীর ক্রিকেট-ইতিহাসে স্মরণীয় তিন। এ জিনিস অতীতে দেখা যায়নি। ভবিষ্যতে যেন দেখা যায়, কারণ রেকর্ড-ভাঙা ক্রিকেটের একটা দায়িত্ব। ক্রিকেট, যমজের জন্য বিখ্যাত। ব্যাটিং পক্ষে রণজি-ফ্রাই, হবস-সাটক্লিফ, পন্সফোর্ড-ব্রাডম্যান, কম্পটন-এডরিচ; বোলিংয়ে গ্রেগরী-ম্যাকডোনাল্ড, ওরিলি-গ্রিমেট, মিলার-লিণ্ডওয়াল, রামাধীন-ভ্যালেন্টাইন, লক-লেকার! কিন্তু ত্রয়ী? ইতিহাসে প্রথম।

এঁরা খেলায় অনেক কিছু দিয়েছেন। এঁরা খেলাকে বাঁচিয়েছেন

মৃত্যুর হাত থেকে। দ্রুত রানের বদলে ধীর রানের পৃথিবীব্যাপী প্রতিযোগিতার খাতা এঁরা পুড়িয়ে দিয়েছেন। কয়েদীর মৃত্যুশীতল চাহনি নিয়ে ক্রিকেটাররা যেখানে চেয়ে থাকে—সেখানে এঁরা গেয়েছেন জীবনের গান। এই তিন ক্রিকেট-মাস্কেটিয়ার্স উৎফুল্ল শৌর্যে অনতিক্রান্ত। অপরিসীম অর্থক্ষুধায় ক্রিকেটকে মারছে একদিকে কর্তৃপক্ষ, আনন্দলক্ষ্মী শিউরে উঠছেন লক্ষ্মীছাড়াদের কুবেরসঞ্চয় দেখে। অন্যদিকে পরাজয়ভীতি আচ্ছন্ন করেছে অধিনায়ক ও খেলোয়াড়দের। বক্সিংয়ের প্রদর্শনী-যুদ্ধের মত ড্র করার প্রাণহীন ক্রিকেটযুদ্ধ। হারবো না—আগে বলত বীরপুরুষ। তারা হয় হারত নয় জিতত। হারবো না—বলছে এখনকার সাবধানী ক্রিকেটাররা। ফলে তারা প্রায়ই হারছে কাপুরুষের মত, জিতছে আরো কম, বেশী করছে ড্র। নিশ্চিন্ত নিরাপদ একটা মাঝারিপনা গ্রাস করেছে ক্রিকেটকে। বিলেতি ওল্ড মেডদের রুচিহীন পোষাক আর নিষ্প্রাণ নাচের আড়ম্বরে ধরা পড়েছে ক্রিকেট।

তিন পুরুষের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসার নির্ধারিত গোছালো লাভ, দ্বিতীয় তৃতীয় দশকের বাঙালী কবিদের ছন্দমাপা প্রকৃতিপ্রেম, ভিক্টোরীয় ইংরেজদের নিরাপদ মানবপ্রীতি এবং পঁয়ত্রিশ বছরে বেবি অস্টিন চড়বার মত মাঝারি মোটা চাকরি,—এর সঙ্গে যোগ করে দেওয়া যায় ব্রাডম্যান-উত্তর ক্রিকেট। একমাত্র ব্যতিক্রম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ। এবং তা সম্ভবপর হয়েছে মূলত ত্রয়ীর দানে।

ইতিহাসের সেই 'তিন' এখন 'একে' গিয়ে দাঁড়িয়েছে। দাঁড়িয়ে আছেন এক ও অদ্বিতীয় ওরেল। যুদ্ধোত্তর ক্রিকেট যাঁর একার দানে সর্বাঙ্গিক সমৃদ্ধ—সেই ওরেল। ওরেল যতক্ষণ আছেন—ত্রয়ীর একটি স্টাম্প যতক্ষণ মাঠে খাড়া হয়ে আছে—ততক্ষণ খেলা চলবে। আমরা বিশ্বাস করি, যাওয়ার আগে ওরেল নতুন মাঠে নতুন খেলার উদ্বোধন করে দিয়ে যাবেন, দিয়েছেন, তাঁকে কেন্দ্র করেই কি সোবার্স-কানহাই আবর্তিত হচ্ছেন না,—ওরেলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েই কি বেনোড বেনোড

হননি এবং ওরেল-বেনোডের তীব্র রশ্মির দিকে তাকিয়েই কি ইংলণ্ড ডেক্সটার-জ্যোতিষ্ককে অধিনায়করূপে নির্বাচন করেনি ?

এই গ্রন্থ শেষ করার আগে আমি ওরেলকে আমার শ্রদ্ধা জানিয়ে যাচ্ছি। এইখানে আমার সাধের ও স্বপ্নের শিল্পীও সরে যাচ্ছে-শিল্পীকে ঠেলে এগিয়ে আসছে মানুষ—প্রতিভার ক্ষেত্রে আসছে প্রাণ—মহাপ্রাণ। স্মরণ করছি অবিস্মরণীয়কে।

পুরনো কথা। কন্ট্রাকটার মৃত্যুশয্যায়। জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর ব্যবধান স্পষ্ট করে টানতে পারে একমাত্র ডাক্তারের ছুরি। অপারেশন হবে। মৃতকল্প দেহে সঞ্জীবনী শোণিত চাই। রক্ত দেবার জন্য সবাই প্রস্তুত।

সকলের আগে প্রস্তুত—ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মহান অধিনায়ক ফ্রাঙ্কি ওরেল। এক বড় বেদনার লগ্নে আফ্রিকা ও এশিয়ার রক্ত প্রবাহিত হল একই ধমনীতে।

ওরেল—উইকস—ওয়ালকট—ক্রিকেটের ত্রিবর্ণলাঞ্ছন।

ঝাণ্ডা উঁচু থাক ক্রিকেটের।